উত্তাল আফ্রিকা-দক্ষিণ

জ্যোতি ভট্টাচার্য

এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড
২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

UTTAL AFRIKA-DAXIN

[Turbulent Southern Africa]

By Jyoti Bhattacharya

প্রকাশক
শ্রীনিভা মুখোপাধ্যায়
ম্যানেজিং ডিরেক্টার
এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

সরকার প্রদত্ত কাগজে মুদ্রিত

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর ১৯৬০

প্রচ্ছদ শিল্পী : সুভাষ সিংহ রায়

ব্লক : স্ট্যাণ্ডার্ড ফটো এনগ্রেভিং কোম্পানী

বাঁধাই : ইস্ট এণ্ড ট্রেডার্স

মুদ্রাকর
শ্রীমন্মথ পান
নবীন সরস্বতী প্রেস
১৭, ভীম ঘোষ লেন
কলিকাতা-৬

—যারা এসেছে ইতিহাসের মহাযুগে
আলো নিয়ে, অস্ত্র নিয়ে, মহাবাণী নিয়ে।
তারা বীর, তারা তপস্বী, তারা মৃত্যুঞ্জয়,
তারা আমার অন্তরঙ্গ, আমার স্ববর্ণ, আমার সগোত্র,
তাদের নিত্যশুচিতায় আমি শুচি।

...

হে চিরকালের মানুষ, হে সকল মানুষের মানুষ,
পরিত্রাণ করো—
ভেদচিহ্নের তিলক-পরা—
সংকীর্ণতার ঔদ্ধত্য থেকে।

—রবীন্দ্রনাথ, পত্রপুট ১৪

Thina Sizwe esinsundu

Sikhalel' i Afrika,...

Mayibuye, mayibuye,

Mayibuy' i Afrika !

আমরা কালো মানুষ

ডাক পাড়ি আফ্রিকার জন্য...

ফিরে আসুক আমাদের

ফিরে আসুক আমাদের

ফিরে আসুক আমাদের আফ্রিকা !

দক্ষিণ আফ্রিকার আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসের একটি গানের দুই স্তবক।

সূচীপত্র

আটলান্টিক
মহাসাগর
আঙ্গোলা
জেয়ার
তানজানিয়া
জাম্বিয়া
নামিবিয়া
বৎসোআনা
কালাহারি মরু
রোডেশিয়া
সলসবেরি
প্রিটোরিয়া
জোহানেসবার্গ
কিম্বার্লি
লিবেন্সো মার্কোয়েস
সোআজিল্যাণ্ড
ডারবান
নাটাল
লেসোথো
কেপ প্রদেশ
কেপটাউন
উত্তমাশা অন্তরীপ
মোজাম্বিক প্রণালী
০ ৪০০ ৮০০
কিলোমিটার
আফ্রিকা-দক্ষিণ

নেলসন মাণ্ডেলা

ওআলাটার সিসুলু

আহম্মদ কাথরাডা

গোভান মবেকি

ডেনিস গোল্ডবার্গ

শার্পভিল্ ১৯৬০

বন্দিদশায় অত্যাচারে নিহত

আহম্মদ তিমল

সুলেমান (বাবলা) সালুজী
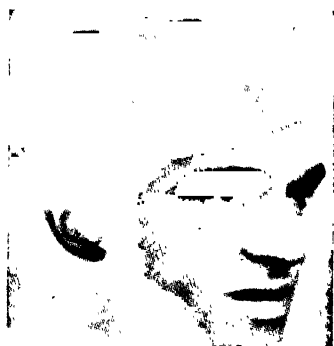
ফাঁসির মঞ্চে জীবনের
জয়গান গেয়ে গেছেন
ভুইসিলে মিনি

আলবার্ট লুটুলি

ব্র্যাম ফিশার

ইউসুফ দাদু

॥ শ্বেতাঙ্গ কৃষিফার্মের আফ্রিকান মেয়ে-শ্রমিক ॥
সারাদিন খাটুনীর পর খোরাকী জুটেছে এই কটা দানা।

॥ শ্বেতাঙ্গ কৃষিফার্মের আফ্রিকান মেয়ে-শ্রমিক ॥

অনাহার-অপুষ্টির ফলে বাচ্চাটার সর্বাঙ্গে ঘা। ক্ষেতমজুরনী মায়ের বুকে বাচ্চা,

মনমোহিনী নাইডু

গান্ধীজীর সহকর্মী থাম্বি নাইডুর পুত্রবধূ। এ পরিবারের ইতিহাসে বহু কারাবরণ, বহু দণ্ডভোগ। এঁর স্বামী নারায়ণস্বামী নাইডু ১৯৫২ সালে দুইবার কারাদণ্ড ভোগ করেন, ইনিও দুইবার ৩০ দিনের কারাদণ্ড ভোগ করেন। পুত্র ইন্দ্রেশ দশ বৎসর কারদণ্ড ভোগের পর ১৯৭৩ সালে মুক্তি পেয়েছেন, কন্যা শান্তি এক বৎসর নির্জন কারাবাসের পর বিদেশে চলে গেছেন।

উইনি মাণ্ডেলা ও নেলসন মাণ্ডেলা
(১৯৬০-এর দশকের ছবি)

অলিভার তাম্বো

বিলি নায়ার

ইন্দ্রেশ নাইডু

রুথ ফার্স্ট

ইসমাইল মীর

পুলিসের ব্যাটন চালনা

প্রথম অধ্যায়

প্রস্তাবনা

। এক ।

দক্ষিণ আফ্রিকা, নামিবিয়া, জিম্বাবোয়ে, বৎসোআনা লেসোথো এবং সোআজিল্যাণ্ড—এই ছয়টি দেশ নিয়ে যে রাজনৈতিক অঞ্চল, তাকে আফ্রিকা-দক্ষিণ বলতে হয়। 'দক্ষিণ আফ্রিকা'ই বলা উচিত, কিন্তু একটি দেশের রাজনৈতিক নাম 'দক্ষিণ আফ্রিকা' হয়ে দাঁড়িয়েছে, অতএব অঞ্চলটার জন্য 'আফ্রিকা-দক্ষিণ' ব্যবহার করতে হচ্ছে। এই অঞ্চল আজ এক বিশাল বিশ্বসংঘাতের আবর্তকেন্দ্র হয়ে উঠেছে। সম্ভবতঃ ভিয়েৎনামের পর বিশ্ব-রাজনীতির বৃহত্তম ঘটনা এখানেই ঘটছে।

এ অঞ্চলের প্রধান রাষ্ট্র দক্ষিণ আফ্রিকা। নামিবিয়া দেশটিকে এ রাষ্ট্র দখল করে রেখেছে আন্তর্জাতিক আইন অগ্রাহ্য করে, বিশ্ব-রাষ্ট্রসংঘের সমস্ত নির্দেশ অমান্য করে। জিম্বাবোয়ে এখনো রোডেশিয়া নামে পরিচিত ; সেখানকার বর্তমান সরকার টিকে আছে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের সাহায্যে ও অভিভাবকত্বে। বৎসোআনা, লেসোথো, সোআজিল্যাণ্ড নামে স্বাধীন হলেও তাদের ভৌগোলিক-রাজনৈতিক অবস্থান এমন যে তাদের গোটা অর্থনীতি দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত ও তার ওপর নির্ভরশীল ; ফলে তাদের স্বাধীনতাও নিস্তেজ নিষ্প্রাণ। দক্ষিণ আফ্রিকা বর্তমানে কার্যতঃ এই গোটা অঞ্চলটার অধিপতি। এ অঞ্চলের ইতিহাস-রাজনীতি-অর্থনীতির আলোচনা প্রধানতঃ দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেত স্বৈরতন্ত্র ও আগ্রাসী ধনতন্ত্রের সম্বন্ধে আলোচনা।

ভৌগোলিক দিক থেকে 'আফ্রিকা-দক্ষিণ' বললে আঙ্গোলা, জাম্বিয়া, মালাউয়ি, মোসাম্বিক, এবং জেয়ার-এর দক্ষিণাংশ, ও তানজানিয়ার দক্ষিণাংশকেও ধরতে হয়। কিন্তু বর্তমান কালের

রাজনৈতিক ইতিহাস সীমারেখা টেনেছে অন্যভাবে। তিনশো বছর ধরে পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, বৃটিশ, জার্মান, আর বেলজিয়ান সাম্রাজ্যবাদ এই ভূখণ্ডে যে ইতিহাস রচনা করেছে তা ভূগোলের যুক্তি মানেনি, ন্যায়নীতি বা সভ্যতা-সংস্কৃতির যুক্তিও মানেনি।

আঙ্গোলা ও মোসাম্বিক ১৯৭৪-৭৫ সাল পর্যন্ত পর্তুগীজ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। তানজানিয়া এককালে জার্মান সাম্রাজ্য ছিল, প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত ছিল বৃটিশ সাম্রাজ্য, ১৯৬১ সালের ডিসেম্বরে স্বাধীন হল। মালাউয়ি ছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত, নাম ছিল নিয়াসাল্যাণ্ড; ১৯৬৪ সালের জুলাই মাসে স্বাধীন হল। জাম্বিয়া ছিল বৃটিশ উত্তর রোডেশিয়া, ১৯৬৪ সালের অক্টোবরে স্বাধীন হয়ে জাম্বিয়া হল। জেয়ার-এর নাম ছিল বেলজিয়ান কঙ্গো, ১৯৬০ সালের জুন মাসে স্বাধীন হয়ে গৃহযুদ্ধ ও নানা সংঘর্ষের রক্তাক্ত ইতিহাসের শেষে নাম নিল 'জেয়ার'। এসব দেশগুলোর ইতিহাস আফ্রিকা-দক্ষিণের ইতিহাসের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পর্কিত হলেও এদের নিজস্ব ঘটনাবলী আছে এবং অধ্যায়-বিন্যাস অন্যরকম। এই সব দেশে এখন কৃষ্ণকায় আফ্রিকান সরকার প্রতিষ্ঠিত, এ সব দেশ শ্বেতশাসনমুক্ত। এদের স্বাধীনতার মধ্যে প্রকারভেদ আছে, প্রত্যক্ষ পরাধীনতার অবসান হলেও সবকটা দেশ সমান আত্মনির্ভর নয়। পরোক্ষ বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদী প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণ, অর্থনৈতিক পরনির্ভরতা কোন কোন দেশে বেশ সুস্পষ্টভাবেই দৃশ্য। সদ্য-স্বাধীন দেশ, কিন্তু সবাই এক প্রক্রিয়ায় স্বাধীনতা অর্জন করেনি, এবং সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধিতা সবার সমান নয়, তেজের তারতম্য আছে। জেয়ার আর জাম্বিয়ার রাজনৈতিক গতির সঙ্গে তানজানিয়া-আঙ্গোলা-মোসাম্বিকের রাজনৈতিক গতির পার্থক্য আছে। তথাপি, এই দেশগুলো আজকের 'আফ্রিকা-দক্ষিণ' থেকে পৃথক।

১৯৬০ পর্যন্ত আফ্রিকা-দক্ষিণে অধিপতি ছিল বৃটিশ সরকার। শ্বেত-শাসিত দক্ষিণ আফ্রিকা 'বৃটিশ ডমিনিয়ন' ছিল, শ্বেত-শাসিত

রোডেশিয়া ছিল বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত স্বায়ত্তশাসিত এলাকা—'সেলফ-গভর্নিং টেরিটরি'। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের এককালে পরিকল্পনা ছিল—রোডেশিয়াকে দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে জুড়ে দক্ষিণ আফ্রিকা, বেচুয়ানাল্যাণ্ড (আজকের বৎসোআনা), রোডেশিয়া, উত্তর রোডেশিয়া, (আজকের জাম্বিয়া), বাসুটোল্যাণ্ড (আজকের লেসোথো), সোআজিল্যাণ্ড, এবং দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা (আজকের নামিবিয়া) একত্রিত করে এক বিশাল 'বৃটিশ দক্ষিণ আফ্রিকা যুক্তরাষ্ট্র' গঠন করা। পরবর্তী কালে আরেক পরিকল্পনা হল, দুই রোডেশিয়া এবং নিয়াসাল্যাণ্ড (আজকের মালাউয়ি) জুড়ে 'বৃটিশ মধ্য আফ্রিকা ফেডারেশন'। ১৯৫৩ সালে 'বৃটিশ মধ্য আফ্রিকা ফেডারেশন' তৈরী করা হয়েছিল আফ্রিকান জনমতকে একপাশে ঠেলে রেখে। ১৯৬০-এর দশকের শুরুতেই বোঝা গেল এ 'ফেডারেশন' টিকবে না, রোডেশিয়ার শ্বেতাঙ্গরাও জাম্বিয়া-মালাউয়ির কৃষ্ণকায় মানুষের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ভীতিগ্রস্ত। ১৯৬৩ সালে 'ফেডারেশন' বাতিল হল। তার পর থেকে রোডেশিয়া দক্ষিণ আফ্রিকারই অনুচর। বিশেষতঃ আঙ্গোলা-মোসাম্বিকে শ্বেতাঙ্গ-রাজ অপসৃত হওয়ার পর এই দুই শ্বেতাঙ্গ-রাষ্ট্রের সংযোগ খুবই নিবিড়। দক্ষিণ আফ্রিকার সাহায্য না পেলে রোডেশিয়ার শ্বেতাঙ্গ-রাজ একদিনও টিকবে না।

দক্ষিণ আফ্রিকা ও রোডেশিয়ার শ্বেত সরকার দুটির ওপর বৃটিশ আধিপত্য ১৯৬০ সালের আগেও কার্যতঃ প্রযুক্ত হতো না। এদের কোন কোন আচরণের ও ক্রিয়াকলাপের সম্বন্ধে বৃটিশ সরকারী মহল মাঝে মাঝে মৃদু আপত্তি জানালেও স্বার্থের কোন সংঘাত ছিল না। যেসব বিষয়ে আপত্তি জানানো হত, সেসব বিষয়েও বৃটিশ সরকারী মহলে প্রচ্ছন্ন সমর্থন থাকত বলেই মনে হয়,—প্রকাশ্য আপত্তি জানানো হত কালো আফ্রিকাকে স্তোকবাক্য দেওয়ার এবং বিশ্ব-জনমতের দরবারে সাধু সাজার জন্য; অন্ততঃ, একাধিক ইংরেজ

লেখক এই রায় দিয়েছেন, এবং আফ্রিকান বামপন্থী রাজনৈতিক মহল এই রকম মনে করেন।

১৯৬১ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার নিজেকে 'প্রজাতন্ত্র' বলে ঘোষণা করে বৃটিশ কমনওয়েলথের সদস্য থাকতে চেয়েছিল। নজীর ছিল,—ভারত ১৯৫১ সালে প্রজাতন্ত্র হয়েও বৃটিশ কমনওয়েলথের সদস্যপদ রক্ষা করেছিল। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার 'প্রজাতন্ত্র' আরেক ব্যাপার—প্রজাদের শতকরা ৮০ জনকে সমস্ত গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত রেখে, ভোটের অধিকার থেকেও বঞ্চিত রেখে, শ্বেতকায়দের 'প্রজাতন্ত্র'। বৃটিশ কমনওয়েলথের প্রধানমন্ত্রী সম্মেলনে বিষয়টি বিবেচনা করার সময় তানজানিয়ার জুলিয়াস নীয়রেরে এক খোলা চিঠি লিখে জানান দক্ষিণ আফ্রিকাকে রাখলে তানজানিয়া থাকবে না। ভারতের নেহরু, ঘানার নক্রুমা—এঁরাও তীব্র আপত্তি জানালেন এবং দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্যভিত্তিক শাসনব্যবস্থার অবসানের দাবী জানালেন। দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার কমনওয়েলথের সদস্য থাকার আবেদন প্রত্যাহার করে নিয়ে কমনওয়েলথ থেকে বেরিয়ে গেল। বৃটিশ সরকারের আনুষ্ঠানিক কর্তৃত্বও অবসান হল।

১৯৬০-এর দশকে বৃটিশ সরকার রোডেশিয়ায় কৃষ্ণকায় অধিবাসীদের সামান্য কিছু অধিকার দিয়ে শান্ত করার উদ্দেশ্যে রোডেশিয়া সরকারের সঙ্গে অনেক আলোচনা করেন। রোডেশিয়া সরকার তাঁদের পরামর্শ শোনেনি। ওদিকে জাম্বিয়া মালাউয়ি স্বাধীন হয়ে গেল, রোডেশিয়া তখনো 'স্বাধীনতা' পেল না। রোডেশিয়া সরকার 'স্বাধীনতা'র জন্য পীড়াপীড়ি করছিল। শেষ পর্যন্ত বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড উইলসন ঘোষণা করলেন—সংখ্যাগরিষ্ঠ শাসন চালু হবার পূর্বে রোডেশিয়াকে 'স্বাধীনতা' দেওয়া হবে না। ১৯৬৫ সালের নভেম্বর মাসে রোডেশিয়া সরকার বৃটিশ সরকারকে অগ্রাহ্য করে নিজে নিজে 'স্বাধীনতা' ঘোষণা করল। 'প্রজাতন্ত্র' শব্দটাকে ১৯৬১ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা লাঞ্ছিত করেছিল, ১৯৬৫ সালে 'স্বাধীনতা'

শব্দটার ওপর রোডেশিয়া বলাৎকার করল। বৃটিশ সরকার এই 'স্বাধীনতা'কে বেআইনী বলে ঘোষণা করেছেন। কিন্তু রোডেশিয়া সরকারকে শাসিত করার জন্য তাঁরা কিছুই করেননি।

বেচুয়ানাল্যাণ্ড ও বাসুটোল্যাণ্ড বৃটেনের কাছ থেকে 'স্বাধীনতা' পেল ১৯৬৬ সালে, 'সোআজিল্যাণ্ড' স্বাধীন হল ১৯৬৮ সালে। ১৯৭০-এর দশক যখন শুরু হল তখন আফ্রিকা-দক্ষিণে কোথাও প্রত্যক্ষ বৃটিশ আধিপত্য আর নেই, বৃটিশ সরকার এ অঞ্চলের জন্য জবাবদিহি করার দায়মুক্ত। পরোক্ষে এবং নেপথ্যে বৃটিশ সরকার ও বৃটিশ ধনতান্ত্রিক মূলধনের ভূমিকা যথেষ্ট। কিন্তু আইনতঃ বৃটিশ সরকারের আর দায়িত্ব নেই।

এখন এ অঞ্চলে অধিপতি দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার। দক্ষিণ আফ্রিকায় মানুষের মুক্তিসংগ্রামের ফলাফলের ওপর গোটা অঞ্চলটার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। দক্ষিণ আফ্রিকার মানুষের মুক্তিসংগ্রামও রোডেশিয়া, নামিবিয়া, বৎসোআনা, লেসোথো ও সোআজিল্যাণ্ডের মানুষের মুক্তিপ্রয়াসের সঙ্গে জড়িত। দক্ষিণ আফ্রিকা শ্বেত সাম্রাজ্যবাদের দুর্গ। কবে সেই দুর্গ ধূলিসাৎ হবে, তার প্রতীক্ষায় দেশে দেশে মুক্তিকামা মানুষ দিন গুণছে, কারাগারে বন্দীর দল দিন গুণছে ; দিন গুণছে শিশু, কবে তার বাবা ঘরে ফিরবে—বন্দীশালা থেকে, অরণ্য-প্রান্তরে মুক্তিযোদ্ধার গোপন আশ্রয় থেকে; স্ত্রী প্রতীক্ষা করছে স্বামীর ; স্বামী প্রতীক্ষা করছে স্ত্রীর ; আর, যারা ফাঁসিকাঠে বন্দুকের সামনে মৃত্যুবরণ করে জীবনের জয়গান গেয়ে গেছে, নিঃশেষে নিজেদের দান করেছে,—যাদের সংখ্যা বাড়ছে প্রতিদিন—তাদের সঙ্গীসাথীরা প্রতীক্ষা করছে—কবে আসবে সেই আশ্চর্য দিন, যেদিন সার্থক হবে গান, 'মেইবুইয়ে ই আফ্‌রিকা', 'আমাদের আফ্রিকা ফিরে আসুক'।

। দুই ।

আফ্রিকা-দক্ষিণের ছয়টি দেশের মোট আয়তন ৩০ লক্ষ ৮৪ হাজার বর্গ-কিলোমিটার। তুলনা করার জন্য উল্লেখ করা উচিত —ভারতের বর্তমান আয়তন ৩২ লক্ষ ৬৮ হাজার বর্গ-কিলোমিটার, ফ্রান্সের আয়তন ৫ লক্ষ ৮৭ হাজার বর্গ-কিলোমিটার। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, উত্তরপ্রদেশ, তামিলনাদ ও মধ্যপ্রদেশ—ভারতের এই ছয়টি রাজ্যের মোট আয়তনের কাছাকাছি দক্ষিণ আফ্রিকার আয়তন। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, উত্তরপ্রদেশ ও পাঞ্জাবের মোট আয়তনের সমতুল্য নামিবিয়ার আয়তন। পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও উড়িষ্যার মোট আয়তনের কাছাকাছি রোডেশিয়ার আয়তন। এ অঞ্চলে জনসংখ্যার ঘনত্ব ভারতের তুলনায় খুবই কম—মরুভূমির দেশ বৎসোআনা ও নামিবিয়া তো ভারতের তুলনায় প্রায় জনশূন্য বলা চলে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তুলনায় দক্ষিণ আফ্রিকা, রোডেশিয়া, লেসোথো ও সোআজিল্যাণ্ডে জনসংখ্যার ঘনত্ব খুব কম নয়। ১৯৭০-৭১ সালে আফ্রিকা-দক্ষিণের ছয়টি দেশের মোট জনসংখ্যা ছিল ২ কোটি ৮০ লক্ষ ৯৭ হাজার।[১]

দেশ	আয়তন বর্গ-কিলোমিটার	জনসংখ্যা হাজার	জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ-কিলোমিটারে
১। দক্ষিণ আফ্রিকা	১২,২১,০৩৭	২,০১,১৩	১৬
২। নামিবিয়া	৮,২৪,২৯২	৬,১৫	১
৩। বৎসোআনা	৬,০০,৩৭২	৬,৪৮	১
৪। জিম্বাবোয়ে	৩,৯০,৫৮১	৫২,৭০	১৩
৫। লেসোথো	৩০,৩৫৫	১০,৪৩	৩৪
৬। সোআজিল্যাণ্ড	১৭,৩৬৩	৪,০৮	২৪

১৯৭০ সালের আগের হিসাব। ভারতে জনসংখ্যার ঘনত্ব ১৬৪, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ২২।[২]

এ অঞ্চলের একদিকে বৎসোআনার কালাহারি মরুভূমি আর নামিবিয়ার নামিব মরুভূমি, সেখানে প্রকৃতির শুষ্ক শীর্ণ রুদ্র মূর্তি এককালে আতঙ্কের বিষয় ছিল। কিন্তু বাকী অঞ্চলটা প্রকৃতির অকৃপণ দাক্ষিণ্যে ভরা। গাছপালা আর বিস্তীর্ণ তৃণ-প্রান্তরের বিশাল ক্রোড়ে এখানে একদিন অজস্র পশুর লীলাভূমি ছিল—সিংহ, গণ্ডার, হাতী, জেব্রা, জিরাফের সর্বদা আনাগোনা ছিল ; আর ছিল শৃঙ্গহীন ঈলাণ্ড হরিণের পাল, আদিম শিকারী ও শিল্পীর আনন্দিত বিমুগ্ধ দৃষ্টি যাদের বিচিত্র ছন্দোময় ছবি রেখে গেছে পাথরের গায়ে ; আর ছিল গরু মহিষ ভেড়া ছাগলের পাল। আজও এ অঞ্চলে গরু মহিষ ও ভেড়ার পাল একটা প্রধান সম্পদ। জমির ওপর ফসল ফলাতে এ অঞ্চলে কোন দিন খুব বেগ পেতে হয়নি—টুকরো টুকরো এলাকায় অনাবৃষ্টি বা স্বল্পবৃষ্টি এবং জলাভাবের সমস্যা থাকলেও গোটা অঞ্চলটার কৃষিসম্পদ প্রচুর, ফলবাগিচাও অনেক।

জমির ওপরে প্রকৃতির দাক্ষিণ্য যেমন প্রসারিত, মাটির গর্ভে তেমনি ঐশ্বর্যের প্রায়-অফুরান ভাণ্ডার। আফ্রিকার সর্বশ্রেষ্ঠ খনিজ সম্পদের ভূস্তর জেয়ার-এর দক্ষিণাঞ্চল কাটাঙ্গা প্রদেশ থেকে জাম্বিয়া রোডেশিয়া হয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা পর্যন্ত বিস্তৃত। আজকাল জানা গেছে নামিবিয়া এবং বৎসোআনাও এই ভূগর্ভ-সম্পদে সমৃদ্ধ। এ অঞ্চলে পাওয়া যায় সোনা, হীরে, তামা, সীসে, লোহা, কয়লা, ম্যাঙ্গানিজ, ক্রোমাইট, বক্সাইট, কোবাল্ট, নিকেল, জিঙ্ক, টিন, অ্যাসবেস্টস,—এবং আণবিক শক্তির উৎস ইউরেনিয়াম। বিশ্বের বৃহত্তম স্বর্ণখনি অঞ্চল দক্ষিণ আফ্রিকার রানড্ অঞ্চল, অন্যতম বৃহৎ তাম্রখনি অঞ্চল রোডেশিয়ায়, ইউরেনিয়ামের বৃহত্তম খনি নামিবিয়ায়, খুব উঁচুদরের আকরিক লোহা আর বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ অ্যাসবেস্টস-খনি সোআজিল্যাণ্ডে ; নামিবিয়ার সমুদ্রকূলে, দক্ষিণ আফ্রিকায়, রোডেশিয়ায় নদীস্রোতে হীরে ভেসে আসে, দক্ষিণ আফ্রিকার কিম্বার্লি বিশ্বের বৃহত্তম হীরকখনি অঞ্চল ; বৎসোআনায় সম্প্রতি তামা, নিকেল

আর কোবাল্টের বিশাল ভাণ্ডার আবিষ্কৃত হয়েছে, হীরের বড় স্তর পাওয়া গেছে ; লেসোথোতেও হীরে পাওয়া গেছে। এখানে খনিজ সম্পদের মধ্যে অভাব পেট্রলিয়মের। সম্প্রতিকালে নামিবিয়ার উপকূলবর্তী সমুদ্রতলে পেট্রলিয়মের সন্ধান পাওয়া গেছে।

এ অঞ্চলে কুবেরের সম্পদ। সূর্যকরোজ্জ্বল দেশ, সোনার দেশ, সুন্দর দেশ, মানুষের বাঁচার মতো থাকার মতো সব দেশ। সেই দেশগুলোতেই অধিকাংশ মানুষের দুর্দশার অবধি নেই, লাঞ্ছনা-অপমানের সীমা-পরিসীমা নেই, অপুষ্ট শিশুগুলোর অকালমৃত্যুর হার মানুষের বুক ফাটিয়ে দেয়।

॥ তিন ॥

দক্ষিণ আফ্রিকা

১৯৭০ সালের লোকগণনার হিসাবে দক্ষিণ আফ্রিকার জনসংখ্যা ২ কোটি ১৪ লক্ষ ৪৮ হাজার। তার মধ্যে শ্বেতাঙ্গের সংখ্যা ৩৭ লক্ষ ৫১ হাজার, শতকরা ১৭·৫ ভাগ। কালো আফ্রিকানদের সংখ্যা ১ কোটি ৫০ লক্ষ ৫৮ হাজার—শতকরা ৭০·২ ভাগ। ভারতীয় বংশজাত, অন্যান্য এশিয়ান জাতি ও মিশ্রবর্ণের মানুষদের মোট সংখ্যা ২৬ লক্ষ ৩৯ হাজার—শতকরা ১২·৩ ভাগ। বর্তমানে মোটামুটি হিসেব-আন্দাজে বলা চলে, শ্বেতাঙ্গ ৪০ লক্ষ আর অ-শ্বেতাঙ্গ ২ কোটি।

দেশের শাসন সম্পূর্ণভাবে শ্বেতাঙ্গদের একচেটিয়া, অ-শ্বেতাঙ্গদের কোন অধিকার নেই। দেশের মোট ৪ লক্ষ ৭২ হাজার ৩৫৯ বর্গ-মাইল জমির মধ্যে ৪ লক্ষ ১৬ হাজার ১৩০ বর্গমাইল জমি "শ্বেতাঙ্গ এলাকা" বলে নির্দিষ্ট, অ-শ্বেতাঙ্গদের সে এলাকায় জমি নেওয়া নিষিদ্ধ, বসবাস নিষিদ্ধ। ৫৬ হাজার বর্গমাইল জমি কালোমানুষদের জন্য বরাদ্দ। অর্থাৎ, জনসংখ্যার শতকরা ২০ ভাগের কম লোকের জন্য জমির শতকরা ৮৮ ভাগ ঘেরা আছে, আর শতকরা ৮০ ভাগেরও বেশি মানুষের জন্য বরাদ্দ আছে জমির শতকরা ১২ ভাগের মতো।

শ্বেতাঙ্গ জমির মালিকদের ২৫০০০ ফার্ম আছে যেগুলোর প্রত্যেকের জমির পরিমাণ ২০০০ একরের বেশি। ১৯৫৩ সালের একটা হিসেবে
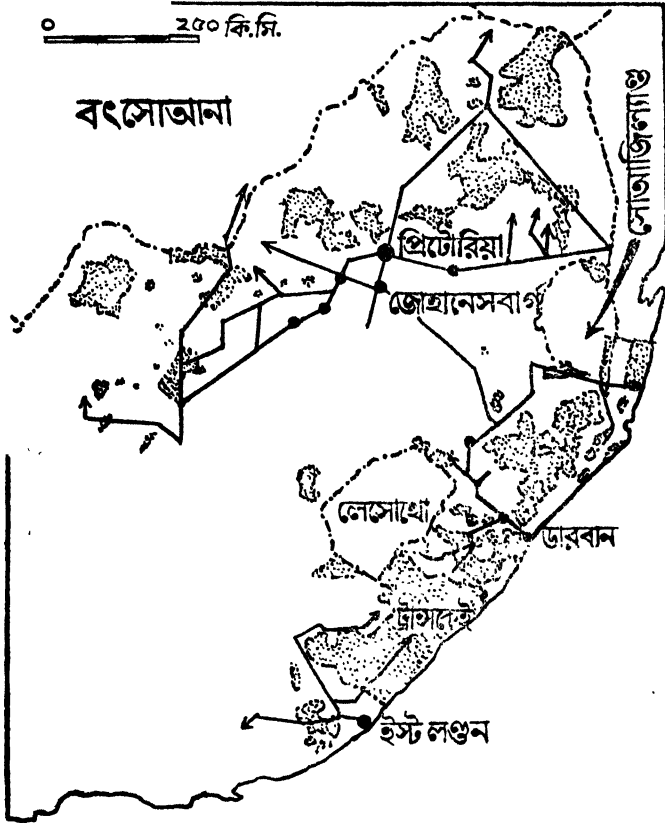
দক্ষিণ আফ্রিকায়
কালো মানুষের জন্য নির্দিষ্ট ভূমি (বাণ্টুস্তান)
ইউরোপীয় বসতি-বিকাশের গতিরেখা —

দেখা যায়, প্রায় ৩০০ শ্বেতাঙ্গ ফার্ম আছে যেগুলোর প্রত্যেকটার জমির পরিমাণ ১৫০০০ 'মর্গেন'-এর বেশি, অর্থাৎ ৩১৬৫০ একরেরও

বেশি।[৩] এসব জমিতে কালো মানুষের বসবাস নিষেধ, কিন্তু ক্ষেতমজুর বা ভাগচাষীর খাটুনী খাটার লোক কালোমানুষ। ১৯৬১ সালে শ্বেতাঙ্গ কৃষি-ফার্মে পুরো সময়ের ক্ষেতমজুরের কাজে প্রায় ৮ লক্ষ ৫০ হাজার কালো আফ্রিকান নিযুক্ত ছিল, আর শ্বেতাঙ্গ গৃহস্থালীতে ভৃত্যের কাজ করছিল ১ লক্ষ ২৬ হাজার কালো আফ্রিকান।[৪] দক্ষিণ আফ্রিকার জাতীয় আয়ের শতকরা ৭৫ ভাগ নিয়ে নেয় ৪০ লক্ষ শ্বেতাঙ্গ, আর ২ কোটি অ-শ্বেতাঙ্গদের জন্য পড়ে থাকে বাকী শতকরা ২৫ ভাগ।[৫] দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে শতকরা ৬০ ভাগ নিজেদের "আফ্রিকানের" বলে পরিচয় দেয়—ওলন্দাজ ভাষার সঙ্গে নানা ভাষার মিশ্রণে উদ্ভূত তাদের ভাষাকে বলে 'আফ্রিকান্‌স্'। ১৯১০-২০ সাল পর্যন্ত এরা 'বোয়ার' নামে পরিচিত ছিল। শ্বেতাঙ্গদের বাকী ৪০ ভাগ ইংরেজী-ভাষী।

সত্যকার আফ্রিকান যারা সেই কালোমানুষদের মধ্যে অনেকগুলি জাতিগোষ্ঠী রয়েছে। এদের মধ্যে প্রধান ভাষাগুলির নাম খোশা, জুলু, সোথো, ৎসোআনা। ১৯৬০ সালের লোকগণনার সময় খোশা ভাষীর সংখ্যা ছিল ৩০ লক্ষ ৪৪ হাজার, জুলু—২৮ লক্ষ ৬৭ হাজার, সোথো—১২ লক্ষ ৮২ হাজার, এবং ৎসোআনা—১১ লক্ষ ৪৯ হাজার। এছাড়া আরো ছ-সাতটি ভাষা সম্প্রদায় রয়েছে।[৬]

দক্ষিণ আফ্রিকার মিশ্রবর্ণের মানুষরা অধিকাংশ অন্তরীপ-অঞ্চলে 'কেপ'-প্রদেশের বাসিন্দা। বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে এদের উৎপত্তি, তার মধ্যে আদিবাসী সান জাতি, খয় খইন জাতি, ইউরোপীয়, দক্ষিণ এশিয়া ও ভারত থেকে নিয়ে আসা ক্রীতদাস, আফ্রিকার অন্যান্য দেশ থেকে নিয়ে আসা ক্রীতদাস, সবাই আছে। মালয় ও ইন্দোনেশিয়া থেকে যাদের ক্রীতদাস করে নিয়ে আসা হয় তাদের অধিকাংশই ছিল মুসলমান; তাদের বংশধররা এখনো ইসলাম ধর্ম নিয়ে চলে, তাই মিশ্রবর্ণের মধ্যে 'কেপ মালয়' একটা বিশিষ্ট সম্প্রদায়। মিশ্রবর্ণের মানুষদের অধিকাংশের বর্ত্তমান মাতৃভাষা 'আফ্রিকান্‌স্'—বোয়ারদের

ভাষা। ১৯৭০ সালের লোকগণনার সময়ে মিশ্রবর্ণের মানুষদের সংখ্যা ছিল ২০ লক্ষ ১৯ হাজার।

'এশিয়াটিক' বলে যাদের পৃথকভাবে নির্দিষ্ট করা হয়, ১৯৭০ সালে তাদের সংখ্যা ছিল ৬ লক্ষ ২০ হাজার। তাদের অধিকাংশেরই পূর্বপুরুষরা ভারতবর্ষ থেকে এসেছিল চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক হিসাবে; অল্প কিছু লোক এসেছিল ব্যবসায়ী হয়ে। এরা ভারত-উদ্ভূত বলে পরিচিত। অল্পসংখ্যক লোকের পূর্বপুরুষ চীন বা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যান্য দেশ থেকে এসেছিল। আজকের দক্ষিণ আফ্রিকার 'ভারতীয়'দের শতকরা ৯৫ জনের জন্ম হয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকায়, এবং বহু মানুষই কখনো ভারতবর্ষ চোখে দেখেনি। এদের সাধারণ ভাষা ইংরেজী। এরা অধিকাংশ নাটাল ও ট্রান্সভাল প্রদেশের বাসিন্দা।

দক্ষিণ আফ্রিকার খনিতে ও অন্যান্য শিল্পে বহু কোটি টাকার মূলধন লগ্নী রয়েছে। এই মূলধনের অনেকটাই বৃটিশ ও মার্কিন মূলধন এককালে বৃটিশ মূলধনই প্রায় একচেটিয়া ছিল, পরে এল মার্কিন মূলধন। সম্প্রতিকালে ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী ও জাপান এই উচ্চমুনাফার দেশে মূলধন লগ্নী বাড়িয়েছে। ১৯৭০ সালের এক হিসেবে বলা হয়েছিল—'দক্ষিণ আফ্রিকায় লগ্নী বৈদেশিক মূলধনের পরিমাণ ৩০০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, তার শতকরা ৬০ ভাগ বৃটিশ এবং ১৩ ভাগ মার্কিন; বৃটিশ একচেটিয়া কোম্পানীগুলির ন্যূনতম মুনাফার হার শতকরা ১২·৫ ভাগ, মার্কিন একচেটিয়া কোম্পানীগুলির ন্যূনতম মুনাফার হার শতকরা ২০·৬ ভাগ; বিশ্বের অন্যত্র মুনাফার হার সচরাচর শতকরা ৮·৫ ভাগ।[৭] লণ্ডনের টাইম্‌স্ পত্রিকার সংবাদ ছিল—'১৯৭০ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রত্যক্ষ লগ্নী নতুন মূলধনের শতকরা ৭০ ভাগ এসেছিল বিদেশ থেকে।[৮] লণ্ডনের ইকনমিস্ট পত্রিকা সংবাদ দিয়েছিল—১৯৭৪ সালে এক বছরেই দীর্ঘমেয়াদী বেসরকারী বৈদেশিক মূলধনের নীট আমদানী হয়েছিল ৮৫০

মিলিয়ন ডলার।[৯] এখনকার আন্দাজে দক্ষিণ আফ্রিকায় লগ্নী বৃটিশ মূলধনের পরিমাণ ৪০০০ মিলিয়ন ডলার, মার্কিন মূলধনের পরিমাণ ১০০০ মিলিয়ন ডলার।

১৯৫৬ সাল থেকে পশ্চিম জার্মান মূলধনের লগ্নী দ্রুত হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৫৬ সালে প্রত্যক্ষ লগ্নী পশ্চিম জার্মান মূলধনের পরিমাণ ছিল ২৪০ মিলিয়ন রান্‌ড্; ১৯৭২ সালে ১৬০০ মিলিয়ন রান্‌ড্।[১০] রান্‌ড দক্ষিণ আফ্রিকার মুদ্রা, মূল্য বৃটিশ পাউণ্ড-স্টার্লিংয়ের অর্ধেক ছিল; ১৯৭৪ সালে ১ রান্‌ড্ = ˙৬২ পাউণ্ড।

বর্ণবৈষম্যের অপরাধে এবং মানবিক অধিকার হরণের অপরাধে দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার বিশ্বরাষ্ট্রসংঘের দরবারে বারবার অপরাধী সাব্যস্ত হয়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে কোনো রাষ্ট্রের ব্যবসা-বাণিজ্য করা উচিত নয়, এবং দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক নিবারণ-শক্তি ('স্যাংশন') প্রয়োগ করা উচিত বলে বিশ্বরাষ্ট্রসংঘে বারবার প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। তথাপি, বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম জার্মানী দক্ষিণ আফ্রিকায় মূলধন লগ্নী করে চলেছে, বাণিজ্যিক আদানপ্রদান পুরোদমে চালাচ্ছে এবং অস্ত্রশস্ত্র জোগান দিচ্ছে। ফ্রান্স, ইটালী, ইরাণ, জাপান দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে পুরোদস্তুর ব্যবসা-বাণিজ্য চালাচ্ছে। ইরাণ দক্ষিণ আফ্রিকাকে পেট্রল সরবরাহ করছে। জাপান দক্ষিণ আফ্রিকার লোহা-ইস্পাতের বড় খরিদ্দার; দক্ষিণ আফ্রিকায় জাপান সম্বন্ধে চালু বিদ্রূপ হল যে যদিও দক্ষিণ আফ্রিকায় অ-শ্বেতাঙ্গ মাত্রেই অন্ত্যজ-অস্পৃশ্য, তথাপি জাপানীরা বড় খরিদ্দার বলে তাদের খাতির করে 'শ্বেতাঙ্গ' ('অনারারী হোয়াইট') বলে গণ্য করা হয়।[১১]

দক্ষিণ আফ্রিকার পশুসম্পদ উল্লেখযোগ্য। কৃষি, পশুপালন ও ফলবাগিচা এখানকার বহু মানুষের প্রধান কর্ম। জমির প্রায় শতকরা ৯০ ভাগ পশুপালনে ব্যবহার হয়। কিছুকাল আগের হিসাব অনুসারে এ দেশে ১ কোটি ২৫ লক্ষ গরুমহিষ আছে—তার ৫০ লক্ষ কালো-

মানুষদের ; আর ৩ কোটি ৯০ লক্ষ ভেড়া আছে, তার ৪৫ লক্ষ কালো-মানুষদের।[১২] পশম দক্ষিণ আফ্রিকার অন্যতম প্রধান রপ্তানী সামগ্রী, সোনা আর ইউরেনিয়মের পরেই পশমের স্থান। তাছাড়া দক্ষিণ আফ্রিকা হীরে রপ্তানী করে, লোহা-ইস্পাত রপ্তানী করে, ফল রপ্তানী করে, চিনি রপ্তানী করে, মদ রপ্তানী করে। এসবের বেশির ভাগ কেনে বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী, কানাডা।

এত রপ্তানী সত্ত্বেও দক্ষিণ আফ্রিকার বৈদেশিক বাণিজ্যে ঘাটতি। ১৯৭৫ সালে ইকনমিস্ট পত্রিকার সংবাদ—যদিও তখন বিশ্বের বাজারে সোনার দাম দারুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল, এবং দক্ষিণ আফ্রিকা প্রতি বৎসর প্রায় ৩৫০০ মিলিয়ন ডলার মূল্যের সোনা রপ্তানী করেছিল, তথাপি বৈদেশিক বাণিজ্যের চলতি হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকার ঘাটতি ছিল ১২০০ মিলিয়ন ডলার।[১৩]

ঘাটতির একটা বড় কারণ, সাম্রাজ্যবাদের দুর্গ হিসাবে দক্ষিণ আফ্রিকার অস্ত্রসজ্জা। যুদ্ধবিমান, ট্যাঙ্ক, হেলিকপ্টার, সাঁজোয়া গাড়ি, সাবমেরিন থেকে শুরু করে নানারকম অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধসরঞ্জাম দক্ষিণ আফ্রিকা কিনছে ঊর্ধ্বশ্বাসে। যুদ্ধাস্ত্র ও যুদ্ধসরঞ্জাম উৎপাদনের কলকারখানা, যন্ত্রপাতি, ডিজাইন-লাইসেন্স-কারিগরী, সবই কেনা হচ্ছে দ্রুতবেগে। সামরিক খাতে ব্যয়বরাদ্দ দুই বছরে দ্বিগুণ হয়েছে—১৯৭৩-৭৪ সালে ছিল ৪৭০ মিলিয়ন রান্ড্, ১৯৭৪-৭৫ সালে ৭০০ মিলিয়ন রান্ড্, আর ১৯৭৫-৭৬ সালে হবে ৯৪৮ মিলিয়ন রান্ড্ (১৩২৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার)।[১৪] ১৯৭৪ সালে শুধু ফ্রান্স থেকেই যা অস্ত্রশস্ত্র কেনা হয়েছে তার দাম প্রায় ১১১ মিলিয়ন পাউণ্ড (=২২২ মিলিয়ন রান্ড্)।[১৫]

শোষণ-অত্যাচারের রাজত্ব বজায় রাখতে বন্দুক-কামানের এই খরচা। দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার যুদ্ধ চালাচ্ছে, আরো বৃহৎ যুদ্ধের জন্য তৈরী হচ্ছে। ভিয়েৎনামে মার্কিন সরকার যে কায়দায় যুদ্ধ

চালিয়েছিল, দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার দক্ষিণ আফ্রিকায় সেই কায়দা প্রয়োগের ব্যবস্থা করছে।

চার ॥

জিম্বাবোয়ে (রোডেশিয়া)

দেশটার ইউরোপীয় নাম রোডেশিয়া, সিসিল রোড্‌সের নামে,— আফ্রিকান নাম জিম্বাবোয়ে। ১৯৭২ সালের আনুমানিক হিসেবে লোকসংখ্যা ৫৬ লক্ষ ৮৯ হাজার। তার মধ্যে ৫৪ লক্ষ লোকই কৃষ্ণকায় আফ্রিকান, শতকরা ৯৪.৯ জন ; শ্বেতাঙ্গের সংখ্যা ২ লক্ষ ৬২ হাজার, শতকরা ৪.৬ জন ; মিশ্রবর্ণ, এশিয়ান ইত্যাদির সংখ্যা ২৭ হাজার।

রোডেশিয়ার শ্বেতাঙ্গ-রাজ দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ-রাজের দোসর। জমি-বন্দোবস্তের ব্যাপারে সেটা দেখা যায়। ১৯৩১ সালের ভূমি-বরাদ্দ আইনে দেশের জমিকে তিন ভাগে চিহ্নিত করা হল— (১) ইউরোপীয় এলাকা, (২) আফ্রিকান জমি এবং (৩) সরকারী খাসজমি। ইউরোপীয় এলাকার জন্য বরাদ্দ হল ৩৫.৬ মিলিয়ন একর, আফ্রিকানদের জন্য বরাদ্দ ৪৪.৪ মিলিয়ন একর, বাকী ১৬.৫ মিলিয়ন একর সরকারী খাস ও অ-চিহ্নিত জমি। এতে শানালো না, ১৯৬৯ সালে আবার ভূমিস্বত্ব আইন হল, সরকারী খাস ও অ-চিহ্নিত জমি থেকে আফ্রিকানদের জন্য সামান্য ছেড়ে দিয়ে ইউরোপীয়দের জন্য সিংহভাগ দিয়ে দেওয়া হল। ফল হল, ৫৪ লক্ষ আফ্রিকানের জন্য বরাদ্দ ৪৪.৯৫ মিলিয়ন একর আর ২½ লক্ষ ইউরোপীয়ানের জন্য গণ্ডী দেওয়া এলাকাও ৪৪.৯৫ মিলিয়ন একর। দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে তুলনা করার সময় খেয়াল রাখতে হবে যে দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গের সংখ্যা ৩০.১ লাখ, ১৭.৫% আর রোডেশিয়ায় ২½ লাখ, ৪.৬%। মাথাপিছু হিসাবে দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গদের জমি ৫ একর, রোডেশিয়ায় ১৭৯ একর। দক্ষিণ আফ্রিকাতে যেমন,

রোডেশিয়াতেও তেমনি সবচেয়ে খারাপ জমির টুকরোগুলো কালো-মানুষদের ভাগে—রেলপথ, চলাচল ব্যবস্থা, জল-সরবরাহ, শহর-গঞ্জ সবই শ্বেতাঙ্গ এলাকায়।
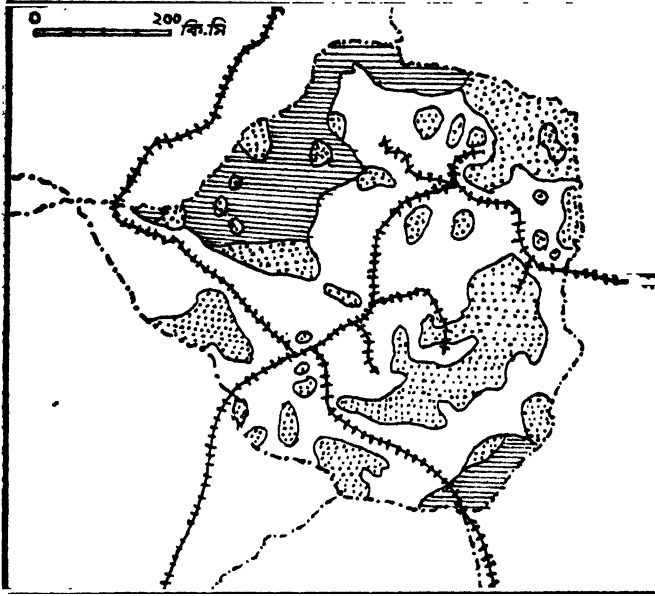
রোডেশিয়ায় ভূমি-বণ্টন, ১৯৩১

রেলপথ ++++++++++ ইউরোপীয় জমি ☐
আ[illegible]কান জমি ▒ সরকারী খাস ☰

জমির ব্যাপারে যেমন, আয়-বণ্টনেও তেমন। খনিতে, কল-কারখানায়, শ্বেতাঙ্গ খামারে মেহনত যারা করে তাদের প্রায় সবই কালোমানুষ। শ্বেতাঙ্গরা শাসক-মালিক-চালক, ম্যানেজার-ফোরম্যান, দক্ষ শ্রমিক। মজুরী-বেতন বাবদে বার্ষিক মাথাপিছু উপার্জনের ছক, পাউণ্ডের হিসাবে, এইরকম[১৬] :—

		আফ্রিকান	ইউরোপীয়
১৯৫৬	...	৭০	১,১০০
১৯৬১-২	...	৮৭	১,২০৯

গড়পড়তা বার্ষিক মজুরী রোডেশিয়ান ডলার-এর হিসেবে পরবর্তীকালে দাঁড়িয়েছে[১৭] :—

		আফ্রিকান	ইউরোপীয়
১৯৬৫	...	২৪৬	২৫৭৬
১৯৬৮	...	২৭২	২৮৩৬
১৯৭১	...	৩১৫	৩৩৮৭

১৯৬২ সালে রোডেশিয়ার শ্বেতাঙ্গ শ্রমিক বৃটেনে শ্বেতাঙ্গ শ্রমিকের চেয়ে শতকরা ৫০ ভাগ বেশি মজুরী পেত, আফ্রিকান শ্রমিক পেত বৃটিশ শ্রমিকের মজুরীর দশ ভাগের একভাগ।[১৮]

১৯৬০ সালে মোট উপার্জনের শতকরা ৬০ ভাগ নিয়েছিল ইউরোপীয়রা—তখন তারা জনসংখ্যার শতকরা ৮ ভাগ ছিল। মজুরী-চাকুরিতে নিযুক্ত আফ্রিকানদের সংখ্যা ছিল জনসংখ্যার শতকরা ৩৫ ভাগ, তারা পেয়েছিল উপার্জনের শতকরা ২৮ ভাগ। আর, জমিই যাদের সম্বল সেরকম আফ্রিকানদের সংখ্যা ছিল জনসংখ্যার শতকরা ৫৭ ভাগ, তারা পেয়েছিল উপার্জনের শতকরা ১২ ভাগ। আফ্রিকান বেকারের সংখ্যা অনেক, নিত্য বৃদ্ধি পায়।[১৯]

দক্ষিণ-আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ-রাজের সঙ্গে রোডেশিয়ার শ্বেতাঙ্গ-রাজের একটা সূক্ষ্ম পার্থক্য আছে। রোডেশিয়ায় আইন করে ঘোষণা করে দেওয়া হয়নি যে শ্বেতাঙ্গ ছাড়া কেউ ভোটের অধিকার পাবে না। এই পার্থক্যটা আসলে একটা কথার ফাঁকি মাত্র, কারণ ভোটার হবার ন্যূনতম যোগ্যতা যেভাবে ধার্য করা হয়েছে তাতে খুব কম আফ্রিকানই ভোটার হতে পারে। ভোটার হতে গেলে নির্দিষ্ট পরিমাণ উপার্জন থাকা চাই, এবং নির্দিষ্ট মানের শিক্ষা থাকা চাই। আফ্রিকানদের এই দুই দিকেই বঞ্চিত করে রাখা হয়েছে।

১৮৯৮ সালের তুলনায় আফ্রিকানদের মজুরী-উপার্জন টাকার অঙ্কে একটু একটু করে বেড়েছে—যদিও বাস্তব মজুরী কমেছে। কিন্তু আফ্রিকানদের উপার্জন যেমন একটু একটু বেড়েছে, আফ্রিকান

জনসংখ্যা বেড়েছে, এবং ভোটার হবার যোগ্য আফ্রিকানের সংখ্যা বেড়েছে (অনুপাত কমলেও সংখ্যা বেড়েছে)—তেমনি ভোটার হওয়ার যোগ্যতার মাত্রাও বাড়ানো হয়েছে। নীচের ছক থেকে ব্যাপারটা স্পষ্ট :—

খ্রীস্টাব্দ		ভোটার হবার জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম বার্ষিক উপার্জন : পাউণ্ড
১৮৯৮	…	৫০
১৯১৪	…	১০০
১৯৫১	…	২৪০
১৯৬১	…	৭২০

প্যাট্রিক কীট্লি ঠিকই লিখেছেন—"প্রাপ্তবয়স্ক সকল লোক ভোটার হবে, সে কল্পনা আফ্রিকানদের কাছে সাহারা মরুর মরীচিকার মতো"; যতই তার দিকে এগোনো যায় ততই সে দূরে সরে যায়।[২০]

লেখাপড়া শিখে ভোটার হবে? ১৯৬১ সালের আইনে বলা হল ৭২০ পাউণ্ড বার্ষিক উপার্জনের জায়গায় ১২০ পাউণ্ড হলেও চলবে যদি সেই সঙ্গে অন্ততঃ দুই বৎসরের মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা থাকে। ১২০ পাউণ্ড বার্ষিক উপার্জনই সেসময়কার গড়পড়তা মাথাপিছু উপার্জনের চেয়ে শতকরা ৪৫ ভাগ বেশি। আর সেসময়ে মাধ্যমিক স্তরে আফ্রিকান ছাত্রের সংখ্যা ৩,৩০০টি।[২১] শ্বেতাঙ্গ শিশুর জন্য সরকারী ব্যয়ে শিক্ষা সার্বজনীন। কালো ছেলেমেয়েদের ইস্কুলে যেতে হলে বাপ-মাকে খরচ জোগাতে হয়। শ্বেতাঙ্গ ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য সরকারী ব্যয়বরাদ্দের মাথাপিছু হার ১৯৬০ সালে ছিল ১০৩ পাউণ্ড, কালো ছেলেমেয়েদের মাথাপিছু বরাদ্দ ৮ পাউণ্ড। যে কালো ছেলেমেয়েরা ইস্কুলে ভর্তি হতে গিয়েছিল, ১৯৬০ সালে তাদের শতকরা ১৫ জনকে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল জায়গার অভাবে।[২২]

তৎপর হয়ে উঠেছে।'[২৭] রোডেশিয়ায় গ্রামাঞ্চলগুলোয় কাঁটা তারের বেড়া দিয়ে ঘিরে রাখা, গাছপালা জ্বালিয়ে দেওয়া, হেলিকপ্‌টার ও যুদ্ধবিমান দিয়ে সন্ত্রাস—ভিয়েৎনামে অনুসৃত মার্কিনী কায়দার অনেকগুলোই খাটানো হচ্ছে।

ইকনমিস্ট পত্রিকার ২৯শে মে তারিখের ওই সংখ্যাতেই সংবাদদাতা আরো খবর দিয়েছিলেন। ১৯৭৫-এর শেষে সরকারী আন্দাজ ছিল রোডেশিয়ার ভেতরে তৎপর গ্যেরিলার সংখ্যা ১০০-র বেশি নয়; মে মাসে সংবাদদাতার আন্দাজ ১০০০-এর বেশি তো বটেই, ২০০০ও হবে। শ্বেতাঙ্গরা রোডেশিয়া ছেড়ে চলে যাচ্ছে প্রতি মাসে ১১০০ জন করে, আসছে কম; মে মাসে আমদানীর চেয়ে রপ্তানী ৮১৭ জন বেশি।

রোডেশিয়ায় শ্বেতাঙ্গরাজের শেষ প্রহরের ঘণ্টা বাজছে।

॥ পাঁচ ॥

নামিবিয়া

দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার ওয়ালফিস্‌ উপসাগরের তীরে জার্মান মিশনারীরা যাতায়াত করছিলেন ১৮৭৫-৮০ সাল নাগাদ। তাঁদের পিছু পিছু জার্মান বণিকরাও এল। ১৮৯০ সালে গোটা দেশটা জার্মান কলোনী হয়ে গেল। বৃটিশ সাম্রাজ্য ও জার্মান সাম্রাজ্যের অনেক দর-কষাকষি ও আদান-প্রদানের পর দেশের বর্তমান সীমানা স্থির হয়েছিল। জার্মানদের জাম্বেসি নদী পর্যন্ত পৌঁছবার সুবিধা রক্ষার জন্য উত্তর-পূর্বে এক ফালি এলাকা রাখা হয়েছিল।

১৯১৪-১৮ সালের মহাযুদ্ধের সময় দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে বৃটিশ সৈন্য গিয়ে জার্মানদের হারিয়ে দেশটা দখল করে নেয়। যুদ্ধশেষে লীগ অব নেশন্‌স্‌ এই দেশটা দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের হাতে অর্পণ করে দিল—অছি ও অভিভাবক হিসাবে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার

এ দেশটার প্রশাসন চালাবে ও অধিবাসীদের শিক্ষাদীক্ষা দিয়ে স্বাধীনতা পাওয়ার উপযুক্ত করে তুলবে, কথা ছিল তাই। দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার দেশটাকে গ্রাস করল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষে 'লীগ অব্ নেশন্‌স্'-এর উত্তরাধিকারী নতুন বিশ্বরাষ্ট্রসংঘ ইউ-এন্-ও দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারকে দেশটা ছেড়ে দিতে বলল। দক্ষিণ আফ্রিকা অস্বীকার করল। আন্তর্জাতিক বিচার-আদালতে মামলা শুরু হল। ২৫ বৎসর ধরে আইনের কূটতর্ক চলার পর ১৯৭১ সালে আন্তর্জাতিক আদালত রায় দিল, দক্ষিণ আফ্রিকা এ দেশটা দখল করে রেখেছে বেআইনী ভাবে, এবং দক্ষিণ আফ্রিকাকে দেশটা ছেড়ে চলে যেতে নির্দেশ দিল। দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার এ নির্দেশ অমান্য করে এবং ইউ-এন-ওর সমস্ত আবেদন ও নির্দেশ অগ্রাহ্য করে দেশটা আঁকড়ে আছে। সেই সঙ্গে এদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের ওপর চলছে দমন-পীড়ন, কারাগার ও প্রাণদণ্ড।

১৯৭০ সালের আনুমানিক হিসাবে এ দেশের জনসংখ্যা ৭ লক্ষ ৪৫ হাজার। তার মধ্যে শ্বেতাঙ্গ ৯০ হাজার, তাদের অধিকাংশই দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে আগত 'আফ্রিকানের', কিছু জার্মান আর কিছু ইংরেজী-ভাষী। সাড়ে ছয় লক্ষ আফ্রিকানদের মধ্যে উত্তর প্রান্তের ওভাম্বো জাতির সংখ্যা সাড়ে তিন লক্ষের মতো; তার পরে হেরেরো, ডামারা ও নামা জাতি। এককালে নামিবিয়ার হেরেরো জাতি খুব শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ ছিল। ১৮৯০-এর দশকে তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৮০ হাজার, এবং তাদের দেড় লক্ষ গরু মহিষ ছিল। জার্মানরা এদের ধ্বংস করে। ১৯০৪ সালে হেরেরো-বিদ্রোহ দমন করা হয় বীভৎসভাবে। বছর দশেকের মধ্যে হেরেরো জাতি হয়ে দাঁড়াল ১৫ হাজার দুর্দশাগ্রস্ত বাস্তুহারার একটা পাল।

এতকাল এ দেশ দীনদরিদ্র বলেই জানা ছিল, এদেশের খবর বিশেষ কেউ রাখতো না। সমুদ্রকূল বরাবর দীর্ঘ একটা অঞ্চল নামিব মরুভূমি—'জলহীন ফলহীন আতঙ্ক-পাণ্ডুর মরুক্ষেত্র'।

'কঙ্কাল-উপকূল' বলে এ অঞ্চলের কুখ্যাতি ছিল। দক্ষিণে এই নামিব মরু বৎসোআনার কালাহারি মরুর সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু সমুদ্রকূল থেকে খানিকটা পূর্বদিকে এবং উত্তরদিকে উঁচু জমি রয়েছে, পশুপালন-কৃষি সেখানে সম্ভব। নামিব মরুঅঞ্চল আবার হীরক-ভূমি—সমুদ্রকূলে ভিজে মাটিতে হীরে পাওয়া যায়, এবং মরুঅঞ্চলেও এখানে-সেখানে মাটির একটু নীচেই হীরে পাওয়া যায়। আর সম্প্রতিকালে পাওয়া গেছে হীরের চেয়েও দামী ইউরেনিয়মের প্রায়-অফুরান ভাণ্ডার। বৃটিশ কোম্পানী 'রিও-টিণ্টো-জিঙ্ক', ফরাসী কোম্পানী 'টোটাল' ইত্যাদি বহুজাতিক অতিকায় 'কর্পোরেশন' মিলে এখানে রস্‌সিং-য়ে যে ইউরেনিয়ম খনি চালাচ্ছে, ১৯৭৬ সালের জুলাই মাসে তার উৎপাদন শুরু হবে ; সম্ভবতঃ এটাই বিশ্বের বৃহত্তম ইউরেনিয়ম খনি হয়ে উঠবে।[২৮]

দক্ষিণ আফ্রিকা বেআইনীভাবে নামিবিয়া দখল করে রেখেছে বলে বিশ্বরাষ্ট্রসংঘের সিদ্ধান্ত এদেশের সঙ্গে কোন দেশের ব্যবসা-বাণিজ্য করা উচিত নয়। এ সিদ্ধান্ত অমান্য করে যেসব রাষ্ট্র গোপনে বা প্রকাশ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য করছে, তাদের মধ্যে বৃটেন, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, পশ্চিম জার্মানী ছাড়া এশিয়ার জাপানও আছে।

॥ ছয় ॥

বৎসোআনা

জাতির নাম ৎসোআনা, বহুবচনে বা-ৎসোআনা, দেশের নাম বৎসোআনা। ইংরেজ 'বাৎসোআনা' শব্দটাকে বানিয়েছিল 'বেচুয়ানা', দেশটার নাম দিয়েছিল 'বেচুয়ানাল্যাণ্ড'। বিরাট দেশ —ফ্রান্সের চেয়ে বড় ; কিন্তু জনবিরল, কারণ অনেকখানি অঞ্চল জুড়ে কালাহারি মরুভূমি। উত্তরে প্রচুর জলের সন্ধান আছে, 'ওকোভাঙ্গো বেসিন' জলের ভাণ্ডার। কিন্তু 'সি-সি' মাছি আর

ম্যালেরিয়া জ্বরের দৌরাত্ম্য ভয়ানক। আধুনিক বিজ্ঞান এই সমস্যার সমাধান করতে পারে,—কিন্তু এ কাজে বিজ্ঞানকে লাগানোর চেয়ে বিশ্বের ধনপতিরা আণবিক ধ্বংসকাণ্ড ও মারণাস্ত্র উৎপাদনে বেশি আগ্রহী।

এককালে কথা ছিল বৎসোআনাকে দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়নের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হবে। দেশের জনসাধারণের তাতে ঘোর আপত্তি ছিল। ১৯৬২ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারও এতগুলো কালো-মানুষের সংখ্যা আর যোগ করা অনুচিত বিবেচনা করে বৎসোআনার অন্তর্ভুক্তিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করল। দক্ষিণ আফ্রিকা সেসময় বৃটিশ কমনওয়েলথ থেকে বেরিয়ে আসার ফলেও বৃটিশ সরকার উপায় খুঁজে পাচ্ছিল না। অগত্যা ১৯৬৬ সালে বৎসোআনাকে স্বাধীনতা দেওয়া হল।

কিন্তু এই 'স্বাধীনতা'র মানে বিশেষ কিছু হল না। দক্ষিণ আফ্রিকা আর রোডেশিয়া দিয়ে পরিবৃত বৎসোআনার অর্থনীতিও দক্ষিণ আফ্রিকার সরকার ও ধনপতিদের মুঠোর মধ্যে। বৎসোআনার বহির্বাণিজ্য দক্ষিণ আফ্রিকার মারফতে হয়। রপ্তানীর শতকরা ৯০ ভাগ কেনে দক্ষিণ আফ্রিকা ও রোডেশিয়া। বৎসোআনার নিজস্ব শুল্কব্যবস্থা নেই, দক্ষিণ আফ্রিকার শুল্কব্যবস্থার সঙ্গে এ দেশ যুক্ত। বৎসোআনার নিজস্ব মুদ্রা নেই, দক্ষিণ আফ্রিকার মুদ্রাই এ দেশে চলে। দেশের প্রায় ৪০।৫০ হাজার মানুষ দক্ষিণ আফ্রিকার খনিতে-খামারে-কারখানায় খাটুনি খেটে জীবিকা সংস্থান করতে যায়। তাদের উপার্জনের ওপর নির্ভর করে তাদের পরিবার—তাদের পাঠানো টাকা বৎসোআনার 'বৈদেশিক বাণিজ্য'-খাতে আয়ের শতকরা ১০ ভাগ।

রোডেশিয়ার সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকার যোগাযোগ-ব্যবস্থা, রেল লাইন ও রাস্তা, বৎসোআনার মধ্য দিয়ে। কিন্তু এগুলোর ওপর বৎসোআনা সরকারের কোনো কর্তৃত্ব নেই। রেল-চলাচল বন্ধ করলে বৎসোআনার অনেক মানুষ বেকার হবে। সবচেয়ে তাজ্জব

ব্যাপার—উত্তর-পূর্বদিকে সীমান্ত অঞ্চলে ফ্রান্সিসটাউন শহর এবং ২০০০ বর্গমাইল এলাকার মালিক দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গ শহরের এক কোম্পানী ; এখানকার শ্বেতাঙ্গরা নিজেদের দক্ষিণ আফ্রিকার অঙ্গ বলেই মনে করে।

এদেশের সরকার দক্ষিণপন্থী, সাম্রাজ্যবাদের সহযোগী। আফ্রিকান জাতীয় জাগরণের চাপে, এবং আফ্রিকার সদ্যস্বাধীন অন্যান্য দেশের সঙ্গে কথাবার্তায় দক্ষিণ আফ্রিকা ও রোডেশিয়ার শ্বেতাঙ্গ-রাজের বিরুদ্ধে মাঝে মাঝে মৃদু নিন্দাবাদ করলেও বৎসোআনা সরকার অর্থনৈতিক বাধ্যবাধকতার যুক্তি দেখিয়ে প্রায়-নিরপেক্ষ ভঙ্গী নিয়েই চলে।

দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে গোপনে পালিয়ে আসার একটা পথ বৎসোআনা দিয়ে। দক্ষিণ আফ্রিকার পুলিসের হাত এড়িয়ে অনেক মানুষ বৎসোআনায় চলে আসে। নামিবিয়া থেকেও অনেক মুক্তিযোদ্ধা বৎসোআনায় আশ্রয় নিতে আসে। এদের মাঝে মাঝে গ্রেপ্তার করা হয়, কারাদণ্ডও দেওয়া হয়। দক্ষিণ আফ্রিকার পুলিস একাধিকবার সীমান্ত লঙ্ঘন করে বৎসোআনার ভেতর থেকে রাজনৈতিক আশ্রয়প্রার্থীদের ধরে নিয়ে গেছে। ফ্রান্সিসটাউনে আশ্রয়প্রার্থীদের বাসস্থল এবং বিদেশে নিয়ে যাওয়ার ছোট বিমান ধ্বংস করে দেওয়ার ঘটনাও আছে।

বৎসোআনা যদি দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারত, তাহলে আফ্রিকা-দক্ষিণে নতুন প্রভাত ত্বরান্বিত হত।

লেসোথো

'সোথো' ভাষাগোষ্ঠীর দক্ষিণশাখার মানুষদের ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে অন্যান্য অঞ্চল থেকে হটিয়ে উৎখাত করা হচ্ছিল। তাদের কয়েকটা উপজাতিকে এই অঞ্চলটায় শেষ পর্যন্ত থাকতে দেওয়া হয়েছিল। 'সোথো'র বহুবচনে 'বা-সোথো', ইউরোপীয় উচ্চারণে

হল 'বাসুটো', দেশটার নাম হয়ে গেল 'বাসুটোল্যাণ্ড'। ১৯৬৬ সালের বৃটিশ সরকারের কাছ থেকে স্বাধীনতা পাবার পর দেশের নাম ঠিক করে রাখা হয়েছে 'লেসোথো'।

সুন্দর দেশ, প্রাকৃতিক দৃশ্যে মনোহর। কিন্তু এখনো অতি দরিদ্র। দেশের দুই-তৃতীয়াংশ পাহাড়-অঞ্চল, প্রায় সব মানুষই ভীড় করে থাকে পশ্চিমদিকের নীচু এলাকায়। সেখানে আবার মাটি-ক্ষয়ের ফলে কৃষিকর্ম দুষ্কর। দেশের প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের প্রায় অর্ধেক দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রবাসী শ্রমিক—তাদের উপার্জন দেশের আয়ের একটা বড় অংশ। শ্রমিক রপ্তানীই একমাত্র উল্লেখযোগ্য রপ্তানী বললে অন্যায় হয় না। সম্প্রতি হীরে, পশম এবং কিছু পশু চালান হচ্ছে।

বৃটিশ সরকার 'স্বাধীনতা' দেবার সময় ক্ষমতা দিয়েছিল প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীপ্রধানদের হাতে, রাজতন্ত্রের হাতে। দেশের সরকার ঘোর প্রতিক্রিয়াশীল। বামপন্থী প্রগতিশীল দল আছে, একটি ছোট্ট কমিউনিস্ট পার্টিও গঠিত হয়েছে। ১৯৭০ সালে নির্বাচনে ক্ষমতাসীন 'বাসুটোল্যাণ্ড ন্যাশানাল পার্টি' নানাবিধ কারচুপি ও জবরদস্তি চালিয়েছিল।[২৯] ১৯৭৪ সালে সরকার-বিরোধী প্রগতিশীল 'বাসুটোল্যাণ্ড কংগ্রেস পার্টি'র ৩২ জন সমর্থককে গ্রেপ্তার করে দক্ষিণ আফ্রিকার কায়দায় 'গুরুতর দেশদ্রোহিতা'র অভিযোগে মামলা শুরু করা হয়েছিল।[৩০]

সোআজিল্যাণ্ড

বৎসোআনা বা লেসোথোর তুলনায় সোআজিল্যাণ্ড ঐশ্বর্যশালী দেশ। খনিজ সম্পদ প্রচুর। বিশ্বের বৃহত্তম অ্যাসবেস্টস খনিগুলোর অন্যতম এখানকার হ্যাভেলক খনি। উঁচুদরের আকরিক লোহা, অ্যান্থ্রাসাইট, কয়লা, টিন এখানকার খনিজ উৎপাদনের মধ্যে। কৃষিসম্পদেও এ দেশ ধনবান। জলহাওয়া জমি ভালো,—

নানা রকম ফসল হয়। খনিজ সামগ্রী ছাড়াও সোআজিল্যাণ্ডের রপ্তানী-বাণিজ্যে চিনি, টিন-ভরা ফল, মাংস, কাগজ তৈরীর জন্য কাঠের মণ্ড বেশ উল্লেখযোগ্য ; দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে পাহাড়-এলাকায় পাইন গাছ আর ইউক্যালিপটাস গাছ লাগানো শুরু হয়, এ অঞ্চলে এসব গাছের যেরকম দ্রুত বৃদ্ধি দেখা গেছে, তা অন্যদেশে সচরাচর দেখা যায় না।

সমৃদ্ধিশালী দেশ, কাজেই শ্বেতাঙ্গ ধনপতিদের বিচরণস্থল। দেশের দশ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে শ্বেতাঙ্গদের সংখ্যা প্রায় দশ হাজার। জমির প্রায় অর্ধেকের মালিক শ্বেতাঙ্গ—তাদের অনেকে আবার দক্ষিণ আফ্রিকার বাসিন্দা, এখানকার খামারবাড়িতে ছুটি উপভোগ করতে আসে। দেশের আসল রাজা কার্ল টড্ নামক দক্ষিণ আফ্রিকার এক শ্বেতাঙ্গ—জমির অনেকটা তাঁর দখলে ; তিনি আবার দক্ষিণ আফ্রিকার ত্রিশ-পঁয়ত্রিশটা বৃহৎ কোম্পানীর ডিরেক্টর। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে শ্বেতাঙ্গ ট্যুরিস্টের দল এখানে বেড়াতে আসে। তাদের জন্য আধুনিক প্রাসাদোপম হোটেল, সুইমিং পুল, জুয়াখেলার 'কাসিনো', মদ্যশালা আছে—সেসবের মালিকও শ্বেতাঙ্গ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে এককালে কিউবার হাভানা শহরের যে সম্পর্ক ছিল, দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে সোআজি-ল্যাণ্ডের সেই সম্পর্ক।

দেশের এত সম্পদ, কিন্তু দেশের অধিকাংশ মানুষ বঞ্চিত। এক প্রতিক্রিয়াশীল উপজাতীয় রাজতন্ত্র বহাল আছে, তার আওতায় আইনসভার 'নির্বাচন'ও হয়। কিন্তু বিরোধী বামপন্থী মতামত প্রকাশ প্রায় নিষিদ্ধ। ১৯৬৩ সালে সারা দেশ জুড়ে খনি-শ্রমিক, চিনি-কল-শ্রমিক এবং অন্যান্য শ্রমিকরা মজুরী বৃদ্ধির দাবীতে বিরাট ধর্মঘট করেছিল। অনেক ধরপাকড়, বরখাস্ত ইত্যাদি করেও ধর্মঘট ভাঙতে না পেরে বৃটিশ সরকার কেনিয়া থেকে সৈন্যবাহিনী এনে গুলিগোলা চালিয়ে ধর্মঘট দমন করেছিল। প্রতিক্রিয়াশীল

উপজাতি-প্রধানরা শ্রমিকদের বিরুদ্ধেই ছিল। স্বাধীনতার পরে তাদের সে চরিত্র পাল্টায়নি।

১৯৭৫ সালের শেষাশেষি পর্তুগীজ সাম্রাজ্যবাদের অবসানের পর আফ্রিকা-দক্ষিণে যে নতুন হাওয়া বইতে শুরু করে, শোনা যায় সোআজি-রাজের গায়েও সে হাওয়ার ছোঁয়া লেগেছে—দক্ষিণ আফ্রিকার মুক্তিসংগ্রামীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার মত অবস্থা হয়েছে।'[১১]

* * *

আফ্রিকা-দক্ষিণের সামগ্রিক অবস্থা বিশ্লেষণ করে এটা দেখা যায় যে এখানে জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম শুধু শাসকের গায়ের রঙ বদলাবার সংগ্রাম নয়। দক্ষিণ আফ্রিকা শিল্পোন্নত দেশ, একচেটিয়া ধনতন্ত্রের দেশ; খনি-জমি-কলকারখানার মালিকানা ব্যবস্থা না বদ্‌লে সেখানকার মুক্তি-সংগ্রাম জয়যুক্ত হতে পারবে না। দক্ষিণ আফ্রিকার অর্থনীতির সঙ্গে বৎসোআনা-লেসোথো-সোআজিল্যাণ্ডের অর্থনীতি যেরকম একীভূত, এবং রোডেশিয়া যেভাবে দক্ষিণ আফ্রিকার ওপর নির্ভরশীল, তাতে মুক্তিসংগ্রামের ক্ষেত্র গোটা আফ্রিকা-দক্ষিণ। এই যুদ্ধক্ষেত্রে শাসকদের প্রধান দুর্গ দক্ষিণ আফ্রিকা, তার সহযোগী প্রতিক্রিয়াশীল উপজাতি-গোষ্ঠীপ্রধানরা এবং পৃষ্ঠপোষক বৃটিশ-মার্কিন-ফরাসী-পশ্চিম জার্মান-জাপানী একচেটিয়া ধনতন্ত্র।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইউরোপীয় অভিযান

॥ এক ॥

আফ্রিকার দক্ষিণপ্রান্তে ইউরোপীয়দের প্রথম উল্লেখযোগ্য পদার্পণ ঘটেছিল ১৪৮৮ খ্রীস্টাব্দে। প্রাচ্যদেশে, বিশেষতঃ ভারতবর্ষে যাবার জন্য সমুদ্রপথের সন্ধানে পর্তুগালের রাজা তিনটি জাহাজ পাঠিয়েছিলেন বার্থলোমিউ দিয়াজ্-এর পরিচালনায়। ভারত ও প্রাচ্যদেশের মণিমাণিক্য, রেশম এবং সুগন্ধি মশলার আকর্ষণ ছিল এই সন্ধানের পেছনে। তাছাড়াও ছিল আফ্রিকার হাতীর দাঁতের টান; এবং, আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল থেকে ধরে-নিয়ে-আসা ক্রীতদাসের টান, যে ক্রীতদাসরা ইতিমধ্যেই কৃষ্ণবর্ণ গজদন্ত ('ব্ল্যাক্ আইভরি') আখ্যা পেয়েছিল।

দিয়াজ্-এর জাহাজ পর্তুগাল থেকে রওনা হয়ে আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল বরাবর দক্ষিণদিকে চলতে চলতে আফ্রিকার দক্ষিণ-প্রান্ত ঘুরে মসেল্ উপসাগরের কূলে ভিড়ল ১৪৮৮ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী। সেখান থেকে কিছুদূর পূবে জাহাজ আবার আল্‌গোআ উপসাগরে পৌঁছে ভারত-মহাসাগরের সীমানায় ঢুকল। কিন্তু দিয়াজ্‌কে ফিরতে হল, তাঁর নাবিকরা আর এগোতে অস্বীকার করল। ফেরার পথে দিয়াজ আফ্রিকার দক্ষিণ-প্রান্তের শেষবিন্দু-স্বরূপ অন্তরীপটি দেখতে পেলেন। নাম দিলেন 'কাবো দে বোআ এস্‌পেরান্সা'—ইংরেজীতে 'কেপ অব গুড্ হোপ', বাঙলায় "উত্তমাশা অন্তরীপ'। ভারত ও প্রাচ্যদেশের ঐশ্বর্যের নাগাল পাবার আশা জাগিয়েছিল এই অন্তরীপ।

১৪৯৭ সালের ৭ই জুলাই তারিখে পর্তুগাল-রাজ আবার অভিযাত্রী জাহাজ পাঠালেন ওই পথে। এবার নায়ক ভাস্কো দা গামা, জাহাজ চারটি। উত্তমাশা অন্তরীপ প্রদক্ষিণ করে ভাস্কো দা গামা

মসেল্ উপসাগরের কূলে ভিড়ে নোঙর ফেললেন ২২শে নভেম্বর তারিখে—পুরো সাড়ে চার মাস পরে। ভাস্কো দা গামা এখানে বেশ কয়েকটা দিন কাটালেন, স্থানীয় অধিবাসীদের দেখা পেলেন, তাদের কাছ থেকে গরু ভেড়া হরিণের মাংস ও অন্য খাদ্যসামগ্রী সংগ্রহ করলেন। দিয়াজ্ এর আগে মসেল্ বা আলগোআ উপসাগরের তীরভূমিতে স্থানীয় অধিবাসীদের দেখা পাননি।

এরপর ভাস্কো দা গামা আফ্রিকার পূর্বকূল বরাবর উত্তরদিকে চললেন। তাঁর শোনা ছিল যে উত্তরদিকে খানিকদূর গেলে সোফালা বন্দর পাওয়া যাবে, সেখানে আরব ও ভারতীয় বণিকদের বসতি আছে, এবং সেখানে ভারত-মহাসাগরের দক্ষ নাবিকদের পাওয়া যাবে যারা ভারতের মালাবার-উপকূলে পৌঁছবার পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে পারে।

ভাস্কো দা গামা সৎপ্রকৃতির লোক ছিলেন না, এবং জলদস্যু-সুলভ নৃশংসতা তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ছিল। তখনকার আমলের বর্ধিষ্ণু আরব বন্দর মোসাম্বিকে পৌঁছে তিনি স্বভাবদোষে কার্য উদ্ধার করতে পারেননি, তাঁকে আরো উত্তরে গিয়ে মেলিন্দে বন্দরে আশ্রয় নিতে হয়েছিল। এখানে তিনি পেলেন গুজরাটী নাবিক মালেমো কানা-কে। পর্তুগীজ নাবিকদের ধারণা ছিল তারা খুব ওস্তাদ। কিন্তু কানা যে তাদের চেয়ে অনেক বেশী দক্ষ তা তারা স্বীকার করতে বাধ্য হল।[১] কানা তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে এল কালিকট বন্দরে,—১৬ই মে ১৪৯৮ তারিখে ভাস্কো দা গামার জাহাজ ভারত-উপকূলের সন্নিকটে নোঙর ফেলল।

ইউরোপীয় সামাজ্যবাদীদের লেখা ইতিহাস-ভূগোল আর আফ্রিকার অভ্যন্তরে রোমহর্ষক অভিযানের কল্পকাহিনী পড়ে, আর কিছুদিন আগে পর্যন্তও মার্কিন সিনেমা দেখে, আমাদের এদেশে পর্যন্ত বর্তমান কালে ধারণা হয়েছিল যে ইউরোপীয়রা আসার আগে আফ্রিকা সম্পূর্ণ তমসাচ্ছন্ন ছিল, আর অধিবাসীরা ছিল নরখাদক

অরণ্যচারী হিংস্রস্বভাব প্রায়-বনমানুষ। সম্প্রতি প্রাচীন আফ্রিকার লুপ্তচিহ্ন পুনরুদ্ধার হচ্ছে, প্রত্নতাত্ত্বিক পুনর্বিচার হচ্ছে, অনেক নতুন তথ্য আবিষ্কার হচ্ছে এবং পুরনো তথ্যগুলোর ওপর নতুন আলোক-পাত হচ্ছে। ফলে ইউরোপীয়রা আসার আগে আফ্রিকার এই দক্ষিণভাগেও মানুষের সভ্যতার কি বিস্ময়কর বিকাশ ঘটেছিল তা আমরা এখন একটু-একটু বুঝতে পারছি। রোডেশিয়ায় প্রাচীন জিম্বাবোয়ের ধ্বংসাবশেষ যে সভ্যতার লুপ্তস্মৃতি বহন করছে, সে যে কত সমৃদ্ধ ছিল, পাথর-কাঠ-সোনা-রূপোয় যে শিল্পীরা ছবি এঁকেছিল, মূর্তি গড়েছিল, বিচিত্র কারুকার্যমণ্ডিত অলঙ্কার গড়েছিল, তাদের সমাজজীবন কেমন ছিল—এসব চিন্তা নতুন করে শুরু হয়েছে ১৯৫০-এর দশকে।[২]

অবশ্যই, আফ্রিকার প্রতি নবজাগ্রত অনুরাগবশে বা ইউ-রোপীয়দের প্রতি বিরাগবশে আফ্রিকার প্রাচীন সভ্যতাকে অতি-রঞ্জিত করে দেখাও ভুল। আফ্রিকার দক্ষিণভাগে আফ্রিকানদের বর্ণলিপি ছিল না, সমুদ্র-জাহাজ ছিল না, বন্দুক ছিল না। কৃষিবিদ্যায় বা খনিবিজ্ঞানে তারা খুব অগ্রসর ছিল না। এ সময় পর্যন্ত তাদের সমাজগঠন অধিকাংশ ক্ষেত্রে দাসপ্রথাভিত্তিক গোষ্ঠীতান্ত্রিক। তাদের মধ্যে উপজাতীয় সংঘর্ষ প্রায়ই হতো, এবং বিভিন্ন জাতির মধ্যে সম্প্রীতি কদাচিৎ দেখা যেত।

এগুলো পশ্চাৎপদতার লক্ষণ নিশ্চয়ই। কিন্তু আফ্রিকানদের যা ছিল তা অবজ্ঞা করার মতো নয়, এবং চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতাব্দীর পর্তুগীজ বা অন্যান্য ইউরোপীয়রা মানবিক শীল-সংস্কৃতিতে আফ্রিকানদের চেয়ে বেশি উঁচু স্তরে ছিল না।

॥ দুই ॥

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ এবং ষোড়শ শতাব্দী পর্তুগালের সওদাগরী সাম্রাজ্য বিস্তারের যুগ। ১৫০০ সাল নাগাদ আফ্রিকার পশ্চিম-উপকূলে উত্তরে কেপ ভার্দ দ্বীপের অঞ্চল থেকে দক্ষিণে কঙ্গো

নদীর মোহানা পর্যন্ত প্রায় ২০০০ মাইল তীরভূমিকে 'গিনি উপকূল' নাম দিয়ে পর্তুগাল-রাজ তাঁর নিজের এলাকা বলে ঘোষণা করলেন। এই তীরভূমি থেকে প্রধান সামগ্রী যা সংগ্রহ করা হতো, তা হল ক্রীতদাস, হস্তিদন্ত এবং স্বুবর্ণ। পশ্চিম আফ্রিকার পর্তুগীজ ঘাঁটি-গুলির সঙ্গে দক্ষিণ আমেরিকার ব্রাজিলে পর্তুগীজ ঘাঁটিগুলির সামুদ্রিক আদানপ্রদান দ্রুত গড়ে ওঠে। ১৫৭৬ সালে আঙ্গোলায় পর্তুগীজরা লুআণ্ডা বন্দর-নগর স্থাপন করে। আঙ্গোলা শীঘ্রই ব্রাজিলে ও কারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জে স্পানিশ পর্তুগীজ জমিদারীতে ক্রীতদাস চালান দেবার প্রধান ঘাঁটি হয়ে উঠল। ১৫৮০ থেকে ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পর্তুগীজরা প্রায় ৪০ লক্ষ আফ্রিকান নরনারীকে ক্রীতদাস করে চালান দিয়েছিল, তার মধ্যে আঙ্গোলা থেকেই ৩০ লক্ষের ওপর মানুষ চালান হয়েছিল। আঙ্গোলার অনেক আফ্রিকান গ্রাম-গোষ্ঠী উজাড় করে দেওয়া হয়েছিল।[৩]

আফ্রিকার পশ্চিম-উপকূলের পর্তুগীজ ঘাঁটিগুলোর দৃষ্টি ছিল পশ্চিমমুখে, আমেরিকার দিকে। পূর্ব-উপকূলের দৃষ্টি ছিল ভারতবর্ষ ও দূরপ্রাচ্যের দিকে। ১৫১০ সালের মধ্যে পর্তুগীজরা আফ্রিকার পূর্ব-উপকূলে মোসাম্বিক, মোম্বাসা, সোফালা বন্দরগুলো আরব বণিকদের হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়। ১৫১০ খ্রীস্টাব্দে ভারতে বিজাপুরের সুলতানের অধিকারভুক্ত গোয়া বন্দর তারা দখল করে। এরপর ভারত-মহাসাগর কার্যতঃ পর্তুগীজ মহাসাগর হয়ে রইল প্রায় একশো বছর। ১৫৫৬ সালে চীনের দক্ষিণ উপকূলে মাকাও বন্দর পর্তুগীজরা দখল করে। ১৫৬৪ সাল নাগাদ ইন্দোনেশিয়ার মলক্কা দ্বীপপুঞ্জ গোটাটা পর্তুগীজদের করায়ত্ত হয়। ষোড়শ শতাব্দীর শেষে বাংলাদেশে কবি মুকুন্দরাম সমুদ্র-উপকূলের নৌযাত্রা সম্বন্ধে লিখেছিলেন—'রাত্রিদিন বাহে ডিঙ্গা হারমাদের ডরে'। পর্তুগীজ আরমাডা নৌবহর জলদস্যুতা, লুণ্ঠন, বলাৎকার ও অন্যান্য নৃশংসতার জন্য এসময়ে সর্বত্রই ত্রাসের কারণ হয়ে উঠেছিল।

আফ্রিকার অভ্যন্তর সম্বন্ধে এ যুগে পর্তুগীজ বা অন্য ইউরোপীয়দের খুব আগ্রহ ছিল না। রাজা সলোমনের গুপ্তধনের কাহিনী জনশ্রুতিতে ছিল ; আফ্রিকার মধ্যস্থলে 'প্রেস্টার জন' নামে একজন প্রবল প্রতাপশালী ও ঐশ্বর্যশালী খ্রীস্টান সম্রাট আছেন, এই কল্পকথাও ছিল। কিন্তু নির্ভরযোগ্য কোনো সন্ধান ছিল না। মোসাম্বিক অঞ্চলে আফ্রিকানরা সোনার গুঁড়ো নিয়ে আসত, সেই সূত্র ধরে পর্তুগীজ বণিকরা জিম্বাবোয়ে অঞ্চলে 'মনোমোটাপা'র রাজ্য পর্যন্ত গিয়েছিল ; কিন্তু সোনার খনির সন্ধান মেলেনি। সোনার খনির জন্য তখন খুব ব্যস্ত হওয়ার দরকারও হয়নি, কারণ হাতের কাছে মজুত ছিল কৃষ্ণকায় মানুষের পাল, ক্রীতদাস-ব্যবসায়ের কালো সোনা।

আফ্রিকার দক্ষিণভাগ তখন জনবিরল সুবর্ণবিহীন অঞ্চল বলে ধরে নেওয়া হয়েছিল। মোসাম্বিক মোম্বাসা আঙ্গোলা গোয়া মলক্কা নিয়ে পর্তুগীজরা তখন এত মত্ত যে আফ্রিকা-দক্ষিণে বেশি কালক্ষেপ করার মতো সময় বা লোকবল নিয়োগ করার মতো লোক তাদের ছিল না। ভাস্কো দা গামার পর থেকে ১৬৫২ সাল পর্যন্ত পর্তুগীজ, ইংরেজ, ওলন্দাজ ইত্যাদি জাহাজ আফ্রিকার দক্ষিণ উপকূলে কখনো কখনো এসে ভিড়তো, পশুমাংস বা অন্য খাদ্যসামগ্রী ও পানীয় জল সংগ্রহ করতো, প্রসন্ন সূর্যের আলোয় বিশ্রাম নিতো, তারপর চলে যেতো মোসাম্বিক, মোম্বাসা বা মাদাগাস্কার ; সেখান থেকে ভারতবর্ষ বা সিংহল, বা সরাসরি দূরপ্রাচ্য—সুমাত্রা, যবদ্বীপ, মলক্কা দ্বীপ। আফ্রিকা-দক্ষিণে ইউরোপীয়দের বসতিস্থাপন করার কথা তখন কারু মনে হয়নি, এবং সমুদ্রতীর ছেড়ে বেশিদূর ভেতরে যাবার কথা নাবিকরা ভাবতো না। জনশ্রুতি ছিল যে একটু ভেতরে গেলেই ভয়ঙ্কর হিংস্র যোদ্ধা ও নরখাদক জাতির কবলে পড়তে হবে। পূর্ব আফ্রিকায় সোফালা মোসাম্বিক মোম্বাসা জয় করেছিলেন যে পর্তুগীজ নায়ক ফ্রাঞ্চেস্কো দে আলমেইদা, তিনি ১৫১০ সালে

দেশে ফেরার পথে অন্তরীপে নেমে স্থানীয় অধিবাসীদের সঙ্গে বিবাদ বাধিয়ে প্রায় সদলবলে নিহত হন। ফলে এ অঞ্চলটা খুব আকর্ষণীয় ছিল না।

১৬৪৮ সাল নাগাদ হল্যাণ্ডে খবর পৌঁছল যে অন্তরীপ অঞ্চলের নরখাদক হিংস্র জাতির সম্পর্কে জনশ্রুতি নিতান্ত অমূলক, এবং প্রাচ্যদেশে যাতায়াতের পথে ওলন্দাজ জাহাজগুলোর রসদসংগ্রহের জন্য ও বিশ্রামের জন্য উত্তমাশা অন্তরীপ এলাকায় একটা উপনিবেশ স্থাপন করা যেতে পারে। ১৬৪৭ সালে একটা ভারতগামী ওলন্দাজ জাহাজ অন্তরীপের তীরভূমির কাছে ভেঙে পড়ে। নাবিকরা তীরে আশ্রয় নেয়। পরবর্তী জাহাজ আসে প্রায় এক বৎসর পরে। এই এক বৎসরকাল ওই নাবিকরা ওখানে নির্বিঘ্নেই কাটিয়েছিল; সামান্য চাষবাস করে তারা নিজেদের খাদ্যও জোগাড় করতে পেরেছিল। ১৬৪৮ সালে এরা দেশে ফিরে এই জায়গাটা সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে।

॥ তিন ॥

উত্তমাশা অন্তরীপে একটা ঘাঁটি সেসময়ে ওলন্দাজ বণিকদের খুব দরকারও হয়েছিল।

ষোড়শ শতাব্দীতে হল্যাণ্ড স্পেনের সম্রাটের অধীন ছিল। ১৫৬০-এর দশক থেকে বিদ্রোহ, বিদ্রোহ-দমন, পুনরায় বিদ্রোহ ও যুদ্ধের দীর্ঘ ইতিহাস শুরু হয়। ১৫৮০ সালে পর্তুগালের রাজার মৃত্যুর পর স্পেন-সম্রাট দ্বিতীয় ফিলিপ পর্তুগালের সিংহাসন দখল করেন এবং লিসবনে ওলন্দাজ বণিকদের যাতায়াত বন্ধ হয়ে যায়। এ পর্যন্ত প্রাচ্যদেশ থেকে মশলা ও অন্যান্য সামগ্রী পর্তুগীজ বণিকরা লিসবনের পাইকারী-বাজারে পৌঁছে দিত, সেখান থেকে ইউরোপের অন্যান্য বাজারে নিয়ে যেত প্রধানতঃ ওলন্দাজ বণিকরা। ১৫৮১ সালের পর ওলন্দাজদের এই ব্যবসা সম্পূর্ণ বন্ধ হবার উপক্রম হল।

তাছাড়া ছিল ধর্মীয় সংঘর্ষ। সেসময়ে স্পেন-পর্তুগাল ক্যাথলিক দেশ, হল্যাণ্ড প্রোটেস্টান্ট। অতএব ভারত-মহাসাগরের সওদাগরী সাম্রাজ্য থেকে পর্তুগীজদের উৎখাত করা ওলন্দাজদের চোখে একটা ধর্মকর্মও হয়ে উঠেছিল, মূর্তিপূজক বিধর্মীদের বিরুদ্ধে জেহাদ-এর মতো। বাণিজ্যিক-সাম্রাজ্যিক স্বার্থের সঙ্গে ধর্মীয় প্রেরণার এরকম মিলন বিস্ময়কর নয়, এর আরো অনেক নজীর আছে।

প্রাচ্যদেশে বাণিজ্যবিস্তারের জন্য ওলন্দাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী স্থাপিত হয়েছিল ১৬০৫ সালে। ১৬৬০ সালের মধ্যে ওলন্দাজরা প্রাচ্যের বিভিন্ন বন্দর ও সওদাগরী ঘাঁটি থেকে পর্তুগীজদের বিতাড়িত করে। যদিও স্পেন-সম্রাট ১৬৪৮ সালের আগে ওলন্দাজ সাধারণতন্ত্রের স্বাধীনতা স্বীকার করেননি, তথাপি ১৬০৯ সালে যুদ্ধবিরতি-চুক্তির পর থেকে ওলন্দাজ সাধারণতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে চলছিল।

সপ্তদশ শতাব্দীতে ওলন্দাজ সওদাগরী সাম্রাজ্যের প্রসারের মোটামুটি চেহারাটা এখানে উল্লেখ করা উচিত। এ সাম্রাজ্যের সর্ববৃহৎ ভূমি 'ডাচ্ ইস্ট ইণ্ডিজ', আজকের ইন্দোনেশিয়া। বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র প্রায় ৩০০০টি দ্বীপের সমষ্টি এই ইন্দোনেশিয়ায় ওলন্দাজ সাম্রাজ্যের পত্তন হয়েছিল সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই। ওলন্দাজরা এদিকে এসেছিল পর্তুগীজদের পথ অনুসরণ করে এলাচ, লবঙ্গ, দারুচিনি, গোলমরিচ প্রভৃতি দামী মশলার সন্ধানে। ১৬০৪ সালের মধ্যেই যবদ্বীপ থেকে ও মলক্কা দ্বীপ থেকে পর্তুগীজদের হঠিয়ে ওলন্দাজরা ঘাঁটি গেড়ে বসল। যবদ্বীপের প্রাচীন নগর 'জাকার্তা'র ধ্বংসভূমিতে ওলন্দাজরা নতুন বাণিজ্য-নগর 'বাটাভিয়া' স্থাপন করে ১৬১৯ সালে। তারপর ইন্দোনেশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন রাজা ও সুলতানদের কখনো খাতির-তোষামোদ ক'রে, কখনো ঘুষ দিয়ে, কখনো ঠকিয়ে, কখনো যুদ্ধে বিধ্বস্ত ক'রে, কখনো তাদের পরস্পরের কলহ-সংঘর্ষের সুযোগ নিয়ে, গোটা ইন্দোনেশিয়া

সম্পূর্ণ গ্রাস করতে ওলন্দাজদের প্রায় তিনশো বছর লেগেছিল। যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ, সুমাত্রা প্রভৃতি বৃহৎ জনবহুল দ্বীপগুলো এবং প্রধান নগরগুলো ওলন্দাজরা দখল করার পরেও ইন্দোনেশিয়ার বহু অঞ্চলে স্থানীয় প্রতিরোধ-সংগ্রাম চালু ছিল বহুকাল। ইন্দো-নেশিয়ার মানুষ তিনশো বছর ধরে অনেক বিদ্রোহ-অভ্যুত্থান ও যুদ্ধ করেছিল। কিন্তু যেমন ভারতবর্ষে, যেমন আফ্রিকায়, তেমনি ইন্দোনেশিয়াতেও সে সময়ে বিদেশী লুণ্ঠন অত্যাচারের বিরুদ্ধে সে সংগ্রামে জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়নি, সামন্তবাদী প্রাচীন সমাজের পরিবর্তে নূতন গণতান্ত্রিক স্বদেশী সমাজ নির্মাণে গোটা জাতিকে উদ্বুদ্ধ করে তোলার মতো কোন কর্মসূচী বা নেতৃত্বের উদ্ভব হয়নি। ফলে, বহু বীরত্ব ও আত্মত্যাগ সত্ত্বেও ইন্দোনেশিয়ার মানুষ বারবার পরাস্ত ও বিধ্বস্ত হয়েছিল—ভারত ও আফ্রিকার মানুষের মতোই।

১৬০৮ সালের মধ্যে ওলন্দাজরা আফ্রিকার পূর্ব উপকূলে মোসাম্বিকে পর্তুগীজ ঘাঁটির ওপর কয়েকবার হানা দিয়েছিল, কিন্তু দখল করতে পারেনি। ১৬৩৯ সালে ভারতে পর্তুগীজ ঘাঁটি গোয়া ওলন্দাজরা অবরোধ করেছিল। ১৬৪১ সালে আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলে আঙ্গোলার লুআণ্ডা ও বেন্‌গুয়েলা দুটি বন্দরই ওলন্দাজরা দখল করেছিল—১৬৪৮ সাল পর্যন্ত এ দুটি বন্দর ওলন্দাজ অধিকারে ছিল। ১৬৫৮ সালে সিংহলে পর্তুগীজদের শেষ উপনিবেশ থেকে ওলন্দাজরা তাদের বিতাড়িত করে।

সপ্তদশ শতাব্দীতে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় ওলন্দাজ বাণিজ্যের গুদাম-গঞ্জ-আড়ত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল—মসলিপত্তন (১৬০৫), সুরাট (১৬১৬), কারিকল (১৬৪৫), চুঁচুড়া (১৬৫৩), কাশিমবাজার, বরানগর, পাটনা (১৬৫৮) ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

এসব জায়গা থেকে পণ্যসামগ্রী ইউরোপের বাজারে নিয়ে যাওয়া এবং ইউরোপের উৎপন্ন সামগ্রী এসব জায়গায় নিয়ে আসার জন্য ওলন্দাজ জাহাজ উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে যাতায়াত করছিল; সেসব

জাহাজ ওলন্দাজ বণিক, কর্মচারী, সৈন্যসামন্ত ও ভাগ্যান্বেষীদেরও বহন করত।

উত্তমাশা অন্তরীপে ওলন্দাজ জাহাজের একটা বিরামস্থল যে এসময়ে দরকারী হয়ে উঠেছিল তা এসব তথ্য থেকে বেশ বোঝা যায়। সে সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকার বিশাল পশুসম্পদ, ফসল এবং দাসশ্রমিকের শ্রমের বিশাল উৎস চোখের সামনে ততটা ছিল না, খনিজসম্পদের কথাটা একেবারেই জানা ছিল না।

॥ চার ॥

১৬৫২ সালে প্রায় একশোজন ওলন্দাজকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে লোভ দেখিয়ে পাঠানো হল অন্তরীপে উপনিবেশ স্থাপন করার জন্য। অন্তরীপ অঞ্চলে তখন আদিবাসিন্দা খয়-খইন জাতির প্রধানরা এই বিদেশীদের বেশ সাদরেই অভ্যর্থনা করে নেয়। দেদার জমি পড়ে ছিল, পশুসম্পদও অঢেল, সমুদ্রে মাছও অগুণতি—কাড়াকাড়ি মারামারির কথা তখন কারু মনে আসেনি। ওলন্দাজরা সমুদ্রতীরের কাছাকাছি জায়গায় ঘরবাড়ি তুলে, জমিজমা ঘিরে নিয়ে চাষবাস শুরু করল।

ওলন্দাজ ভাষায় 'বোয়ার' শব্দটার মানে 'চাষা'। আমাদের দেশে কৃষকদের যখন 'চাষা' বলা হয় তখন তার মধ্যে যেমন খানিকটা অবজ্ঞা তাচ্ছিল্য জড়ানো থাকে, ওলন্দাজ 'বোয়ার' শব্দটার মধ্যেও তেমনি অবজ্ঞা মেশানো ছিল—'গাঁওয়ার' বা 'গাঁইয়া' অর্থটাও এ শব্দটার সঙ্গে জড়ানো ছিল। ইংরেজী ভাষার 'বূর' (boor) শব্দটার মানে সংস্কৃতিবর্জিত 'গাঁওয়ার'—ওলন্দাজ ভাষার 'বোয়ার' (boer) আর ইংরেজী ভাষার 'বূর' (boor) একই শব্দ।

দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম ওলন্দাজ বাসিন্দারা কৃষকই ছিল, তাদের 'বোয়ার' নামে অভিহিত করা হত। ওলন্দাজ ভাষা জার্মান গোষ্ঠীর অন্তর্গত। কালে কালে 'বোয়ার'দের মূল ওলন্দাজ ভাষার সঙ্গে

কিছু স্থানীয় আফ্রিকান শব্দ ও ইংরেজী শব্দ যোগ হয়ে বর্তমানে এদের বংশধরেরা যে ভাষা বলে তারা তার নাম দিয়েছে 'আফ্রিকা-া-ন্‌স্' (Afrikaans)।

অন্তরীপ অঞ্চলে বোয়াররা প্রথমদিকে যে আদিবাসিন্দাদের দেখা পেয়েছিল, তারা কৃষ্ণকায় ছিল না। তাদের গায়ের রঙ ছিল ফিকে হলুদ থেকে গাঢ় তামাটে। বোয়াররা দেখেছিল এদের মধ্যে দুটো জাতি। অপেক্ষাকৃত খর্বকায় জাতিটিকে বোয়াররা নাম দিয়েছিল boschjesman, ইংরেজীতে সেটা দাঁড়িয়েছে 'বুশম্যান'। ওলন্দাজ শব্দটার মানে 'জংলী মানুষ' বা 'বুনো'। বোয়ারদের ধারণা হয়েছিল এরা খুব অ-সভ্য। কিন্তু এরা পৃথিবীর প্রাচীনতম শিল্পীজাতির অন্যতম। একসময়ে এদের পূর্বপুরুষরা গোটা আফ্রিকায় পাহাড়ের গায়ে, গুহার দেওয়ালে, পাথরের ওপর নিজেদের চিত্রকলার নমুনা রেখে দিয়েছিল। এদের আঁকা জন্তুজানোয়ারের ছবি, পশুশিকারের দৃশ্য, ধাবমান হরিণের ছবি আজো বিশ্বের বিস্ময় হয়ে আছে। এই বুশম্যানদের প্রধান জীবিকা ছিল পশুশিকার।

বোয়াররা যাদের বুশম্যান বলত, পরে বোঝা গেল তাদের মধ্যে আসলে দুটো জাতি। এদের মধ্যে যাদের দৈর্ঘ্য সাড়ে তিন ফুট থেকে পাঁচ ফুটের মধ্যে এবং যাদের বাহুগুলো পায়ের তুলনায় বেশি লম্বা, তাদের পরে নাম হল 'পিগ্‌মি'—খর্বকায়, বামন।

বুশম্যানরা পিগমিদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত দীর্ঘকায়, সাধারণতঃ পাঁচ ফুটের ওপর।

বুশম্যানদের চেয়েও আরেকটু দীর্ঘকায় জাতিটির নাম খয়-খইন। এরা মাঝে মাঝে পশুশিকার করত, কিন্তু এদের প্রধান জীবিকা ছিল পশুপালন ও প্রাথমিক ধরনের কৃষি। খয়-খইন জাতিকে বোয়াররা নাম দিয়েছিল 'হট্টেন্‌টট্'। শব্দটা অবজ্ঞাসূচক—ওলন্দাজ ভাষায় ওটার মানে 'তোত্‌লা'। এদের ভাষা ওলন্দাজদের কানে খুব উদ্ভট খট্‌মটে ঠেকেছিল নিশ্চয়ই, এবং এরা নিশ্চয়ই ওলন্দাজ

ভাষা উচ্চারণ করতে গেলে আটকে যেত। ওলন্দাজদের জ্ঞাতি ইংরেজদের মতে ওলন্দাজ ভাষা দুর্বোধ্য, এবং সাধারণ ইংরেজ এখনো কোন কথা দুর্বোধ্য মনে হলে তাকে 'ডাব্‌ল্‌-ডাচ্‌' আখ্যা দিয়ে থাকে। খয়-খইনরা ওলন্দাজদের ভাষা শুনে তাদের কি নাম দিয়েছিল তা জানা যায় না—তবে 'হট্টেন্‌টট্‌'-এর মতোই কিছু একটা শব্দ ব্যবহার করেছিল বোধহয়।

দুই ভিন্ন ভাষার জাতির যখন প্রথম সাক্ষাৎ হয় তখন পরস্পরের ভাষা সম্বন্ধে বিস্ময়মিশ্রিত অবজ্ঞার মনোভাব খুবই সাধারণ ব্যাপার। ঋগ্বেদের আর্যরা ভারতে এসে যাদের দেখা পেয়েছিলেন তাদের সম্বন্ধে অবজ্ঞাসূচক ও ভীতিসূচক নানা শব্দের প্রয়োগ করেছিলেন। তার মধ্যে একটা শব্দ ছিল 'মৃধ্রবাচাঃ'—কর্কশভাষী। আর্যরা জিতেছিলেন, তাই অনার্যরা তাঁদের ভাষা সম্বন্ধে কি বলেছিল ইতিহাসে তা লিপিবদ্ধ নেই। খয়-খইনরা 'হট্টেনটট' নামেই বহুদিন অভিহিত হল, কারণ ওলন্দাজরা জিতেছিল; ওলন্দাজদের সম্বন্ধে খয়-খইনদের দেওয়া অভিধা আমাদের অজানা রইল।

বোয়াররা অল্পকাল পরেই দেখল যে আদিবাসিন্দাদের গরু-মহিষ-ভেড়ার পাল প্রায় অগুণতি। পুঁতির মালা, রঙীন কাপড়ের টুকরো ইত্যাদি দিয়ে তার বিনিময়ে গরুমহিষভেড়া পাওয়া যায় বটে, কিন্তু বিনিময়ের চেয়ে কেড়ে লুটে নেওয়াই বোয়ারদের কাছে ভালো বলে মনে হতে লাগল। অজুহাতও পাওয়া যাচ্ছিল, রাতের অন্ধকারে নিঃশব্দ পায়ে কোন কোন বুশম্যান মাঝে মাঝে বোয়ারদের গোয়াল-ঘরে ঢুকে দু'চারটে গরুভেড়া নিয়ে পালাত। বেড়া-দিয়ে-ঘেরা জমি আর গোয়ালে-বন্দী গরুমহিষ বুশম্যানরা আগে দেখেনি, বোয়ারদের এই পশুপাল শিকারের উপযুক্ত লক্ষ্য বলে তাদের মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়। তাছাড়া, চোর-ডাকাত সব জাতেই থাকে।

গরুচুরির কথাটা যে অজুহাত, এবং আগন্তুক বোয়াররা যে

প্রায় প্রথম থেকেই আদিবাসিন্দাদের পশুসম্পদের ওপর নজর দিয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় বোয়ার-কলোনীর প্রধান ভ্যান রিয়েবীক্-এর ডায়েরী থেকে। প্রথম দিকে তিনি লিখলেন—"দশ হাজারের মতো গরুমহিষ দখল করে নেওয়া খুবই সহজে হবে, যদি উচিত বিবেচিত হয়।" কিছুদিন পরে লিখলেন—"মিত্রের পন্থায় যদি ওদের গরুমহিষগুলো পাওয়া না যায়, তবে ওরা যে আমাদের গরুমহিষ চুরি করছে তার প্রতিশোধ না নিয়ে সহ্য করা কেন? প্রতিশোধ নেওয়ার প্রয়োজন হবে মাত্র একবার, কারণ ১৫০ জন লোক নিয়ে আমরা বিনা বিপদে একচোটে ১০ হাজার থেকে ১২ হাজার গরুমহিষ দখল করে নিতে পারব; তাতে আমাদের কোনই বিপদের ঝুঁকি নেই, কারণ একটিও আঘাত না করে ওই জঙ্গলীদের অনেকগুলোকে ধরে ক্রীতদাস করে ভারতবর্ষে চালান দেওয়া যাবে; ওরা আমাদের কাছে সব সময়েই আসে নিরস্ত্রভাবে।" ১৬৫৮ সালে রিয়েবীক্ তাঁর ডায়েরীতে লিখলেন—"বিশ-ত্রিশজন ভালো সৈন্য পেলেই পনের-ষোল হাজার ভেড়া ও বলদ কেড়ে নেওয়া যায়, একটিও আঘাত না করে।"[৪]

রিয়েবীক্-এর ডায়েরীতেই দেখা যাচ্ছে গরুমহিষের পাল তো বটেই, আদিবাসী মানুষের পালের ওপরেও বোয়ারদের নজর পড়েছিল—ক্রীতদাস-চালানের কথা মনে উঁকিঝুঁকি মারছিল। তবে অল্পদিন পরে এ অঞ্চল থেকে ক্রীতদাস চালান দেওয়ার চেয়ে বেশি দরকারী হয়ে উঠল এ অঞ্চলেই দাসশ্রমিক খাটানো।

বোয়াররা বেশ বড় বড় জমি-জায়গা ঘিরে নিয়ে, গরুভেড়ার বৃহৎ পাল নিয়ে বসতি ফেঁদে বসেছিল। কিন্তু খাটুনী খাটার লোকজন তাদের কম ছিল। যারা জমি-জমার মালিক হল, তারা নিজেরা কায়িক শ্রম, বিশেষতঃ কিষান-রাখালের কায়িক শ্রম করতে স্বভাবতই অনিচ্ছুক। মালিকদের নিজেদের শ্রম দিয়ে এত বড়

বড় জমির চাষবাস পশুপালন হয়-ও না। অতএব, খাটুনির লোক দরকার। মালিকদের গৃহস্থালীর ঝি-চাকরও চাই।

॥ পাঁচ ॥

প্রথমদিকে বোয়াররা বাইরে থেকে ক্রীতদাস আমদানী করে এ সমস্যা মেটাবার চেষ্টা করেছিল। বোয়ার-বসতি শুরু হওয়ার পর দুই বছরের মধ্যেই, ১৬৫৪ সালে মাদাগাস্কার দ্বীপ থেকে ধরে-আনা বা কিনে-আনা ক্রীতদাসদের খাটুনীতে লাগানো হয়েছিল। ১৬৫৮ সালে আঙ্গোলা থেকে ৩৫৮ জন কম-বয়সী নিগ্রো ক্রীতদাস আমদানী করা হয়। আঙ্গোলার নিগ্রো দাসদের কিন্তু বোয়াররা তেমন পছন্দ করল না। বেশি পছন্দ হল ইন্দোনেশিয়া, মালয়, ভারত, সিংহল ও মাদাগাস্কার থেকে আমদানী ক্রীতদাস। তখনকার ভারতে বাঙলাদেশের ও কেরলের সমুদ্র-উপকূল ক্রীতদাস সংগ্রহের ক্ষেত্র ছিল—মানুষগুলোকে প্রথমে লুট করা হত, বন্দী করা হত, তারপর বিক্রী করা হত। দক্ষিণ আফ্রিকার বোয়ার-বসতির প্রথম-দিককার ইতিহাসে অন্ততঃ দুইজন বাঙালী ক্রীতদাসের নাম দেখা যাচ্ছে—অ্যান্টনী এবং টাইটাস। এদের খ্রীস্টধর্মে দীক্ষা দিয়ে খ্রীস্টান নাম দেওয়া হয়েছিল। প্রথমদিকে বোয়াররা কেউ কেউ মাঝে মাঝে ক্রীতদাসী বা ক্রীতদাস-কন্যা বিবাহ করত—সেরকম একটা বিবাহ হয়েছিল অ্যান্টনীর মেয়ে ক্যাথারিনের সঙ্গে ইয়ান ভাউটারের, ১৬৫৬ সালে।[৫] ১৭৩২ সালে টাইটাস নামে যে বাঙালী ক্রীতদাসটির খবর দেখা যাচ্ছে সে মানুষটি অন্যরকম। তার বোয়ার মালিক খুন হয়েছিল। টাইটাস নিজে খুন না করলেও, খুনের সঙ্গে জড়িত ছিল বলে তার প্রাণদণ্ড হয়। খোলা জায়গায় মাটিতে তার হাত পা বর্শা দিয়ে গেঁথে ফেলে রাখা হয়—শকুনের পাল প্রায়-জীবন্ত মানুষটাকে ছিঁড়ে খায়। প্রাণদণ্ডের এই পদ্ধতি নাকি সে আমলের বোয়ার-সমাজকেও শিউরে দিয়েছিল।[৬]

কিছুকালের মধ্যেই বোয়ার-বসতিতে শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের চেয়ে কালো-তামাটে-বাদামী ক্রীতদাসদের সংখ্যা বেশি হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু বাইরে থেকে ক্রীতদাস আমদানী করার চেয়ে স্থানীয় আদিবাসীদের ধরে ক্রীতদাস বানানো কম-খরচায় কাজ উদ্ধার করার সহজ রাস্তা; বিশেষতঃ, যখন সেই সঙ্গে কিছু জমি-জায়গা এবং গরুমহিষও দখল করা যায়, এবং আদিবাসীরা বাধা দিতে অক্ষম। অতএব, হট্টেনটট্ ও বুশম্যানকে শ্বেতাঙ্গ বোয়ারের দাসত্ব করতে হবে, এটাই পরম-কারুণিক ঈশ্বরের বিধান বলে বোয়ারদের খুব দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল। খ্রীস্টীয় ঈশ্বরে বিশ্বাসহীন এই অবাধ্য অসভ্য মানুষগুলোকে বোয়ারদের দাসত্বস্বীকারে বাধ্য করতে হলে প্রথমেই এদের জমিজায়গা-গরুমহিষ কেড়ে নিতে হয়। যে উৎসাহ নিয়ে বোয়াররা এই কর্ম শুরু করল, তাতে ধর্মীয় উগ্রতা মিশে ছিল।

ডাচ্ ইস্ট ইণ্ডিজ কোম্পানীর কর্তারা এবং বোয়ার উপনিবেশের ভারপ্রাপ্ত প্রধান কর্মচারীরা মাঝে মাঝে একটু মৃদু আপত্তি করেছিলেন এবং বাড়াবাড়ির বিরুদ্ধে উপদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু বোয়ারদের কথা অযৌক্তিক বলে তাঁদের মনে হয়নি। বোয়ার-আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত আদিবাসীরা যখন পাল্টা আক্রমণ করত তখন এঁরা অবশ্য বোয়ারদের রক্ষা করার জন্য ও আদিবাসীদের শায়েস্তা করার জন্য সৈন্যবাহিনী পাঠাতেন। লুটপাট, খণ্ডযুদ্ধ, ধরপাকড় চলল। ১৬৫৯ সালেই খয়-খইন জাতির বিরুদ্ধে বড় যুদ্ধ বাধানো হল—'প্রথম হট্টেনটট্ যুদ্ধ'। এক বছর ধরে লড়াই চালিয়ে বন্দুকের সামনে খয়-খইনরা হেরে গেল। সন্ধি হল,—অনেকখানি জায়গা-জমি ছেড়ে দিয়ে খয়-খইনদের সরে যেতে হল।

তারপর থেকে প্রায় দেড়শো বছর ধরে ক্রমাগত যুদ্ধের পর যুদ্ধ চালিয়ে, লুটপাট করে, গরুভেড়া কেড়ে নিয়ে, জমি-জায়গা কেড়ে নিয়ে, পাইকারী হারে হত্যা করে, বন্দীদাস করে, শিশুগুলোকে পর্যন্ত শেকলে-বাঁধা দাস করে, খয়-খইন আর বুশম্যানদের বাসভূমি

থেকে উৎখাত করে উৎসন্ন দেওয়া হল। জাহাজে চেপে বসন্তরোগের মহামারীও এল ১৭১৩ সালে, খয়-খইনরা পালে পালে মরল। কিছু পালিয়ে গেল কালাহারি মরু-অঞ্চলে, নামিব মরু-অঞ্চলে। অন্তরীপ অঞ্চলে যারা তার পরেও বেঁচে রইল, তারা শ্বেতাঙ্গদের ক্রীতদাস হয়ে রইল। শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের সঙ্গে, মালয়-ইন্দোনেশিয়া-ভারত-আঙ্গোলা-মোসাম্বিক থেকে আমদানী করা ক্রীতদাসদের সঙ্গে, জাহাজী নাবিকদের সঙ্গে এদের মেয়েদের সংস্রব থেকে যারা জন্মাল, তারা হল বর্তমান কালের দক্ষিণ আফ্রিকার মিশ্রবর্ণের পূর্বপুরুষ—'কালার্ড' বলে চিহ্নিত।

বুশম্যানরা মরতে মরতে আর পিছু হঠতে হঠতে যারা শেষ পর্যন্ত বেঁচে রইল, তারা অনেকে চলে গেল কালাহারি মরুভূমিতে। ওরা এখন লুপ্তপ্রায়।

॥ ছয় ॥

অন্তরীপ-অঞ্চল বোয়ারদের অঞ্চল হয়ে গেল। কিন্তু সীমানার মধ্যে গণ্ডীবদ্ধ থাকা বোয়ারদের পছন্দ হবার কথা নয়। যেখানে সীমানার পারে হাত বাড়ালেই পশুর পাল, ক্রীতদাসের পাল, আর জমি-জায়গা পাওয়া যায়, সেখানে সীমানার মধ্যে আটক থাকতে বলা অন্যায় জুলুম বলেই মনে হয়। অতএব, কখনো কখনো ডাচ্ ইস্ট ইণ্ডিজ কোম্পানীর কর্তাদের অনুমোদন ও সমর্থন নিয়ে, আর প্রায়শই কারু কোন অনুমতি-অনুমোদনের তোয়াক্কা না রেখে, বোয়াররা খয়-খইন এলাকা পার হয়েও পূর্বদিকে ও উত্তরদিকে নিজেদের এলাকা বাড়াতে থাকল।

বোয়ার-অঞ্চলে নির্বিচারে পাইকারী হারে পশুশিকার, পশুহত্যা ও পশুচালানের ফলে ওই অঞ্চলে পশুসম্পদ দ্রুত নিঃশেষিত হচ্ছিল। ১৬৮১ সাল নাগাদ দক্ষিণ প্রান্তে টেব্‌ল্ উপসাগর থেকে উত্তরদিকে অলিফান্টস্ নদী পর্যন্ত প্রায় ২০,০০০ বর্গমাইল এলাকা এভাবে পশু-

সম্পদহীন হয়ে গিয়েছিল।[৭] গৃহপালিত জন্তু ছাড়া আর জন্তু-জানোয়ার দেখা যাচ্ছিল না। হাতীর ও জেব্রার পাল অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল, পাখীর ঝাঁকও খুব কদাচিৎ দেখা যেত ; শিকারের প্রধান লক্ষ্য ছিল যে 'ঈলাণ্ড' হরিণ, সেই হরিণও অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। কিছুদিন পরপরই বোয়াররা নতুন এলাকার জন্য অধীর হয়ে উঠছিল। ১৭০২ সালে একটা দল অন্তরীপের বোয়ার শহর থেকে প্রায় ৫০০ মাইল পূর্বে চলে গিয়েছিল। সেখানে তারা হঠাৎ আরেক আফ্রিকান জাতির দেখা পেল। এরা কৃষ্ণকায়, খয়-খইনদের তুলনায় দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ যোদ্ধা জাতি। বাণ্টু জাতি-গোষ্ঠীর দক্ষিণ-শাখার খোশা জাতির সঙ্গে বোয়ারদের এই প্রথম মুখোমুখি।

'বাণ্টু' শব্দটা কোনো জাতির নাম নয়, একটা বিশাল ভাষা-গোষ্ঠীকে ভাষাবিজ্ঞানীরা এই নাম দিয়ে চিহ্নিত করেছেন। বিষুবরেখা অঞ্চল থেকে দক্ষিণে আফ্রিকার বিস্তৃত অঞ্চলে অনেকগুলি কৃষ্ণকায় জাতির বাস। তাদের ভাষাগুলোর মধ্যে কয়েকটা মৌলিক সাদৃশ্য আছে—যেমন ইটালীয়ান-স্পানিশ-পর্তুগীজ বা বাঙলা-বিহারী-অসমীয়া ভাষাগুলোর মধ্যে দেখা যায়। এই ভাষাগুলোর সমষ্টিগত-ভাবে নাম দেওয়া হয়েছে 'বাণ্টু' ভাষা। 'বাণ্টু' শব্দটার মানে 'মানুষ', বহুবচনে ; 'বা'—বহুবচনের চিহ্ন ; একজন মানুষ বোঝাতে 'ম্‌-ণ্টু' বলতে হবে।*

সপ্তদশ শতাব্দীতে, বা তারও অনেক আগে পূর্ব আফ্রিকায় ও মধ্য আফ্রিকায় আফ্রিকান জাতিগুলোর মধ্যে অনেকরকম ওলটপালট চলছিল। আরবদের হাত এড়াবার জন্যই হোক বা অন্য যে কোন কারণেই হোক, বাণ্টু-গোষ্ঠীর দক্ষিণ শাখার অনেকগুলো জাতি এ সময়ে পূর্বখণ্ডে উত্তর থেকে দক্ষিণে নেমে এসেছিল। খোশা জাতি

*ইউরোপীয়রা mntu শব্দটা উচ্চারণ করতে পারে না ; আফ্রিকান মানুষের প্রতি ঘৃণাসূচকভাবে তারা কেউ কেউ munt শব্দটা ব্যবহার করে,—ভদ্রসমাজে সে শব্দ অচল।

এভাবে দক্ষিণ আফ্রিকার পূর্বপ্রান্তে বসতি করেছিল, তাদের উত্তরের প্রতিবেশী হয়েছিল জুলু জাতি।

কৃষ্ণকায় এই জাতিগুলিকে আফ্রিকার পূর্ব-উপকূলের ইসলাম-ধর্মাবলম্বী আরব দাসব্যবসায়ীরা 'কাফের' বা বিধর্মী বলত; হয়তো তাতে দাসব্যবসায়ীদের বিবেককে ঘুম পাড়ানো যেত,—বিধর্মীদের ধরে ক্রীতদাস বানানো ধর্মবিরুদ্ধ কাজ বলে মনে হত না। মোম্বাসা-মোসাম্বিকে জাঞ্জিবারে পর্তুগীজরা আরবদের কাছ থেকে এই দরকারী শব্দটা নিয়েছিল, পর্তুগীজ ভাষায় শব্দটা হয়েছিল 'কাফ্রে' (cafre)। এই সূত্রে বাঙলা ভাষায় 'কাফ্রী' শব্দটা এসেছিল—কৃষ্ণকায় আফ্রিকান মাত্রেই সেসময় আমাদের কাছেও 'কাফ্রী' বলে গণ্য হতো।

বোয়াররা, পর্তুগীজদের কাছ থেকেই হোক আর আরব বণিকদের কাছ থেকেই হোক, শব্দটা শিখে খোশা-জাতিকেই 'কাফির' (kaffer) নাম দিল। পরে ইংরেজরাও 'কাফির' বলতে এদের বোঝাত।

খোশা জাতির সঙ্গে বোয়ারদের বড় ধরনের যুদ্ধ বাধল ১৭৭৯ সালে। অন্তরীপের প্রথম বোয়ার-বসতি থেকে প্রায় এক হাজার মাইল পূবে 'ফিশ্' নদীর অপর পারে খোশাদের তাড়িয়ে দেওয়া হল। বোয়ার ও ইংরেজের ইতিহাসে এ যুদ্ধের নাম দেওয়া হয়েছে 'প্রথম কাফির যুদ্ধ'। তারপর একশো বছরে এরকম আরো আটটা 'কাফির যুদ্ধ' চালানো হয়। ১৭৯৯ সালে 'তৃতীয় কাফির যুদ্ধ' চালায় বৃটিশ সরকার, ১৮৭৭ সালের নবম ও শেষ 'কাফির যুদ্ধ'ও চালায় বৃটিশ সরকার। ১৮৯৪ সালে খোশা জাতির শেষ এলাকাটুকু ('পণ্ডোল্যাণ্ড') বিনাযুদ্ধেই বৃটিশ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়। বর্তমানকালে 'পণ্ডোল্যাণ্ড' সহ আরো কয়েকটি ছোট ছোট অঞ্চল এক করে খোশা জাতির জন্য নির্দিষ্ট বাসভূমি 'ট্রান্সকেই' প্রদেশ গঠন করা হয়েছে। আজকের দক্ষিণ আফ্রিকার গণমুক্তি-সংগ্রামের কয়েকজন প্রধান নেতা—নেলসন মাণ্ডেলা, ওআল্টার সিস্‌লু, গোভান ম্‌বেকি—এই অঞ্চলের মানুষ।

॥ সাত ॥

বোয়ার-উপনিবেশের ইতিহাসে ইউরোপ থেকে আরেক ঢেউ এসে লাগল ১৭৯৫ সালে।

১৭৮৯-৯৩ সালের ফরাসী বিপ্লব ইউরোপে রাজতন্ত্র ও সামন্তবাদী অভিজাত-তন্ত্রের ভিত্ কাঁপিয়ে দিয়েছিল। হল্যাণ্ড ও তার সঙ্গে সংযুক্ত আরো ৬টি জনপদ এসময়ে একত্রে এক 'যুক্তপ্রদেশ' ছিল। বণিক-নাগরিকদের এই 'সাধারণতন্ত্রে' বণিক-নাগরিকদের প্রতিনিধিমণ্ডলী প্রশাসন চালাতেন। এখানে অরেঞ্জ-পরিবারের আধিপত্য ছিল ব্যাপক। অরেঞ্জ-বংশের উইলিয়ম এসময়ে রাষ্ট্র-প্রধান হয়ে উঠেছিলেন। অরেঞ্জ-বংশ ও তাঁদের সমর্থকরা রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দিকে ঝুঁকছিলেন; তাঁদের বিরোধীরা তাঁদের প্রতাপ খর্ব করার জন্য প্রচেষ্টা চালাচ্ছিলেন। হল্যাণ্ডেও সাধারণতন্ত্রী দল গড়ে উঠেছিল, অরেঞ্জ-বংশের বিরুদ্ধে ফরাসী বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁদের সহযোগিতার সম্পর্কও তৈরী হয়েছিল।

ফ্রান্সের বিপ্লবী সাধারণতান্ত্রিক রাষ্ট্র জন্মক্ষণ থেকেই ইউরোপের বিভিন্ন দেশের রাজতন্ত্রীদের চক্ষুশূল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ফ্রান্সে রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করার জন্য এসব রাষ্ট্রশক্তি ফরাসী রাজবংশ ও প্রতিবিপ্লবীদের সঙ্গে ব্যাপক ষড়যন্ত্র চালাচ্ছিল। ফ্রান্সের বিপ্লবী শক্তি এইসব চক্রান্ত নির্মূল করার জন্য অন্যান্য দেশের বিপ্লবী সাধারণতন্ত্রী শক্তিগুলিকে সাহায্য করা এবং যুদ্ধাভিযান চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। ১৭৯২ সালে ফ্রান্স অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, এবং প্রাশিয়া ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ১৭৯৩ সালে ফ্রান্স ইংল্যাণ্ড ও স্পেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ১৭৯৪ সালে ফরাসী বিপ্লবের আভ্যন্তরীণ বিপর্যয় শুরু হয়, এবং প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি ক্ষমতা দখল করে; কিন্তু বৈদেশিক যুদ্ধ তখন আরো ঘোরালো আকার ধারণ করে। ১৭৯৪ সালের ডিসেম্বর মাসে ফরাসী বাহিনী হল্যাণ্ড প্রবেশ করে; ওলন্দাজ নৌবহর ফরাসীরা

দখল করে নেয়। অরেঞ্জ বংশের উইলিয়ম হল্যাণ্ড থেকে পালিয়ে ইংল্যাণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বৃটিশ সরকারের সঙ্গে তাঁর চুক্তি হয়—সাগরপারের ওলন্দাজ ঘাঁটি ও উপনিবেশগুলি তিনি বৃটিশ সরকারের হাতে তুলে দেন। কথা ছিল, ফ্রান্সের সঙ্গে যতদিন যুদ্ধ চলবে ততদিন বৃটিশ সরকার এসব উপনিবেশ শাসন ও রক্ষণাবেক্ষণ করবে, যুদ্ধশেষে উইলিয়ম স্বরাজ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হলে তাঁকে এগুলো প্রত্যর্পণ করা হবে। এই চুক্তি অনুসারে দূরপ্রাচ্যে যেমন যবদ্বীপ ইত্যাদি বৃটিশ শাসনাধীনে আসে, দক্ষিণ আফ্রিকার অন্তরীপ অঞ্চলও তেমনি বৃটিশ দখলে আসে।

এই চুক্তিতে বৃটেনের গুরুতর স্বার্থ ছিল। সে সময়ে ভারতে বৃটিশ সাম্রাজ্য দ্রুত বিস্তৃত হচ্ছিল। সেখানে প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ফরাসীরা। দক্ষিণ আফ্রিকার অন্তরীপ অঞ্চল ফরাসীরা যদি দখল করে নেয়, তাহলে ভারত ও প্রাচ্যদেশে বৃটিশ বাণিজ্য ও সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব বিপন্ন হবে—এই হিসেবটা বৃটিশ সরকার পরিষ্কার বুঝেছিলেন।

১৭৯৫ সালের জুন মাসে সৈন্য-বোঝাই বৃটিশ যুদ্ধজাহাজ অন্তরীপ অঞ্চলের কূলে এসে নোঙর ফেলল। বোয়ার-উপনিবেশের গভর্ণর সামান্য প্রতিরোধ করার পর পরাস্ত হয়ে আত্মসমর্পণ করলেন। সেপ্টেম্বর মাসে বৃটিশ সৈন্যরা 'কেপ টাউন' শহর ও দুর্গ দখল করল। তখন বোয়ার-উপনিবেশের বাসিন্দা ১৪০০০ শ্বেতাঙ্গ নাগরিক (জমিজমার মালিক, ব্যবসাদার), ডাচ্ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ১৫০০ শ্বেতাঙ্গ কর্মচারী, এবং ১৭০০০ ক্রীতদাস।

এই সময়কার বৃটিশ শাসন ১৮০৩ সাল পর্যন্ত বহাল ছিল। এরই মধ্যে খোশা জাতির বিরুদ্ধে ১৭৯৯ সালে 'তৃতীয় কাফির যুদ্ধ' বৃটিশ-বোয়ারের মিলিত অভিযান।

১৮০২ সালে ফ্রান্সের সঙ্গে বৃটেনের যুদ্ধে একবার সন্ধিচুক্তি হল। তখন হল্যাণ্ডের 'বাটাভিয়া সাধারণতন্ত্রে'র হাতে দক্ষিণ আফ্রিকার

বোয়ার-উপনিবেশের কর্তৃত্ব ফিরিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু ১৮০৩ সালেই আবার ফ্রান্সের সঙ্গে বৃটেনের যুদ্ধ বাধল। ১৮০৫ সালে ট্রাফালগারের নৌযুদ্ধে ফরাসী নৌবহরকে বিধ্বস্ত করে বৃটেন সমুদ্রের অধিপতি হয়ে ওঠে। ১৮০৬ সালের জানুয়ারী মাসে বৃটিশ নৌবহর এসে বোয়ার-উপনিবেশ আবার দখল করে নিল, অন্তরীপ অঞ্চল বৃটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত 'বৃটিশ কেপ কলোনী' হয়ে গেল। ১৮১৪ সালের শান্তি-চুক্তিতে এটা পাকাপাকি হল।

॥ আট ॥

কেপ কলোনীর বোয়াররা ওলন্দাজ শাসনের সময়েই একধরনের 'স্বাধীনতা' ও 'পূর্ণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য' দাবী করত—তাদের যথেচ্ছাচারের ওপর কোন কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণ অপছন্দ করত। বিশেষতঃ অ-শ্বেতাঙ্গ আদিবাসিন্দাদের ওপর বোয়ার জমিদারদের যথেচ্ছাচার করার অবাধ অধিকারে কোন সীমা এরা মানতে চাইত না। ১৭৮৯ সালে 'দ্বিতীয় কাফির যুদ্ধ' যখন মীমাংসা হয়, খোশা-জাতিকে তখন অনেকখানি অঞ্চল ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল; কিন্তু সীমান্ত-এলাকার বোয়াররা তাতে সন্তুষ্ট হয়নি, তাদের দাবী ছিল আরো জমি, এবং আদিবাসিন্দাদের আক্রমণ করে বন্দীদাসে পরিণত করার আরো অবাধ অধিকার। উপনিবেশের প্রশাসন এবং হল্যাণ্ডে-স্থিত কর্মকর্তারা এতে বাধা দিচ্ছিলেন বলে বোয়াররা মনে করত। ১৭৯৫ সালে অসন্তুষ্ট বোয়াররা 'বিদ্রোহ' করে এবং সোয়েলেনডাম্ ও গ্রাফ-রেইনেট্ অঞ্চলে দুটো পৃথক 'স্বাধীন সাধারণতন্ত্র'ও প্রতিষ্ঠা করে। এই 'বিদ্রোহী'দের ঘোষণাপত্রে তাদের 'মৌলিক অধিকারে'র তালিকায় ছিল—"প্রত্যেক হটেনটট্ বুশম্যান ইত্যাদি মানুষ বোয়ার-মালিকদের আইন-মোতাবেক ব্যক্তিগত সম্পত্তি, এবং বংশানুক্রমে মালিকদের সেবা করে যেতে বাধ্য।"[৮] 'স্বাধীনতা' 'মৌলিক অধিকার' প্রভৃতি ভালো ভালো শব্দ যে কতরকম অর্থে ব্যবহার করা যায়, তার এটা একটা নমুনা।

১৭৯৫ সালের এই 'বিদ্রোহ' কিন্তু বেশী এগোতে পারল না। বৃটিশ নৌবহর এসে কেপ কলোনী দখল করে নেওয়ায় এই বিদ্রোহ অন্যান্য ঘটনাস্রোতের মধ্যে মিশে গিয়ে উবে গিয়েছিল।

১৮২০ সালে কেপ কলোনীতে নতুন ঔপনিবেশিক বাসিন্দা আসা শুরু হল বৃটেন থেকে। সেবছর ৫০০০ লোক এল। তারপর থেকে যখনই বৃটেনে বেকারসমস্যা, খাদ্যমূল্যবৃদ্ধি, খাদ্যাভাব ইত্যাদি দেখা গেছে তখনই অভাব-দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট ইংরেজ, স্কট, আইরিশরা দলে দলে দক্ষিণ আফ্রিকায় এসেছে। স্বভাবতই নব-আগন্তুক ইংরেজী-ভাষী বৃটিশ বাসিন্দাদের সঙ্গে আদি-আগন্তুক ওলন্দাজ-ভাষী বোয়ারদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও বিরোধের একটা ক্ষেত্রও তৈরী হচ্ছিল। কিন্তু কালো আফ্রিকানকে শ্বেতাঙ্গদের পায়ের তলায় রাখতে হবে এবং খাটিয়ে নিতে হবে—এ বিষয়ে দুই পক্ষের কোন মতবিরোধ ছিল না।

১৮০৯ সালে কেপ কলোনীর প্রথম বৃটিশ গভর্ণর আইন জারী করেছিলেন যে কেপ কলোনীর বাসিন্দা 'হট্রেনটট'দের অলস জীবন-যাপন ছেড়ে শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের কাজে নিযুক্ত হবার জন্য 'উৎসাহিত' করা হবে। 'উৎসাহিত' করার মানে হয়েছিল—এরা কোন জমিজমার মালিক হতে পারবে না, একটা নির্দিষ্ট বাসস্থানে এদের বাস করতে হবে, এবং কোন শ্বেতাঙ্গ প্রভুর কাজে যে সে নিযুক্ত সেই সার্টিফিকেট না দেখাতে পারলে কোন হট্রেনটট্ কোথাও যাতায়াত করতে পারবে না।[৯] এসব বিধিনিষেধ অমান্য করলে শাস্তি—কারাদণ্ড এবং বাধ্যকরীভাবে শ্বেতাঙ্গ প্রভুর কর্মে নিয়োগ।

আইন-আদালতের তোয়াক্কা না রেখে বোয়াররা গায়ের জোরে যা করত, বৃটিশ সরকার সেই পদ্ধতিকেই আইনের ছাপ দিয়ে দিল। ব্যাপারটা এত বিকট হয়ে দাঁড়াল, এবং এই আইনভঙ্গের অপরাধে এত মানুষকে জেলে পুরতে হল যে, বৃটিশ খ্রীস্টান মিশনারীদের এক অংশ প্রতিবাদে আলোড়ন করতে বাধ্য হলেন। মিশনারী ডক্টর জন ফিলিপ্ এই আলোড়নের সংগঠক ছিলেন। ১৮২৮ সালে প্রধানতঃ

ফিলিপের চেষ্টায় বৃটিশ সরকার এই আইনের খানিকটা পরিবর্তন করে হটেনটট ও বর্ণসঙ্করদের জমি কেনার আইনী অধিকার দিল।[১০] অবশ্য কার্যক্ষেত্রে সে সময়ে এই অধিকারের বিশেষ কোন মানে ছিল না। হটেনটটকে জমি বেচবে কে, এবং হটেনটট জমি কেনার টাকা পাবে কোথায়? কিন্তু আইন বদলানো হল—তাতেই বোয়াররা এবং অ-শ্বেতাঙ্গদের সম্বন্ধে বোয়ার-মনোভাবাপন্ন বৃটিশ বাসিন্দারাও কেউ কেউ বৃটিশ সরকারের ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংল্যাণ্ডে ক্রীতদাস-প্রথা ও ক্রীতদাস-ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন হচ্ছিল। মানবিক করুণা বা ধার্মিক দয়া দ্বারা উদ্বুদ্ধ কিছু মানুষ এ আন্দোলন চালাচ্ছিলেন। প্রথমদিকে এ আন্দোলন বিশেষ সাড়া জাগায়নি—বৃটেন সে সময়ে ক্রীতদাস-ব্যবসায়ে বেশ মুনাফা করছিল। পরবর্তী কালে ক্রীতদাস-ব্যবসায়ের প্রধান ব্যবসায়ীদের স্বার্থের সঙ্গে বৃটিশ ধনিকতন্ত্রের ও সাম্রাজ্যের স্বার্থের দ্বন্দ্ব দেখা দিল। সে সময়ে ক্রীতদাস-ব্যবসায় অবসান করার জন্য বৃটেনে প্রবল জনমত সৃষ্টি করা সম্ভব হল। ১৭৭৩ সালে ইংল্যাণ্ডে গৃহভৃত্য হিসাবে যে প্রায় ১৪০০০ নিগ্রো ক্রীতদাস ছিল, তাদের ক্রীতদাসত্ব মোচন করা হয়। অতঃপর ক্রীতদাস-ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে বৃটেনে প্রবল আন্দোলন হতে থাকে। ১৮৩৩ সালে বৃটিশ সাম্রাজ্যের সর্বত্র ক্রীতদাস-প্রথা ও ক্রীতদাস-ব্যবসায় অবসান করার আইন ঘোষিত হয়,—তখন ৮ লক্ষ ক্রীতদাসের বন্ধনমুক্তি ঘটার কথা। কেপ কলোনীতে তখন ক্রীতদাসের সংখ্যা প্রায় ৪০ হাজার। এদের বন্ধনমুক্তির জন্য এদের মালিকদের প্রতি ক্রীতদাস পিছু ৩২ পাউণ্ড করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। ক্রীতদাস-প্রথার অবসান বোয়ারদের অসন্তুষ্ট করেছিল, ক্ষতিপূরণের টাকার অঙ্কও তাদের বিবেচনায় খুব কম মনে হয়েছিল। বৃটিশ-শাসনের বিরুদ্ধে বোয়ারদের অসন্তোষের ভরা ছাপিয়ে উঠেছিল। তার ওপর, কেপ কলোনীর

আদালতে-ইস্কুলে ওলন্দাজ ভাষার বদলে ইংরেজী ভাষা বহাল করা হয়েছিল—বিক্ষোভের সে-ও একটা বড় কারণ।

বৃটিশ-শাসিত এলাকা ছেড়ে উত্তরে অন্যত্র চলে যাবার জন্য বোয়ারদের মধ্যে প্রবল তাগিদ তৈরী হয়েছিল। নতুন এলাকায় অফুরন্ত জমি-জায়গা, অবাধ দাস-শ্রমিকের জোগান এবং যথেচ্ছাচারের পূর্ণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য পাওয়া যাবে, এই আশা ও লোভের সঙ্গে মিশেছিল একধরনের বিকৃত সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবোধ, যে জাতীয়তাবোধের প্রথম সূত্র ছিল আফ্রিকান জাতিগুলোর জাতীয়তা বা মনুষ্যত্ব অস্বীকার করা।

॥ নয় ॥

১৮৩৫ সাল থেকেই কিছু কিছু বোয়ার-পরিবার ছোট ছোট দলে কেপ কলোনীর সীমানা ছেড়ে উত্তরপূর্ব দিকে চলে যাচ্ছিল। কালাহারি মরুভূমিকে পশ্চিমে রেখে এরা অরেঞ্জনদীর উত্তরদিকে যাত্রা করেছিল। ১৮৩৭ সালে প্রায় ২০০০ বোয়ার একত্রে অরেঞ্জ নদীর উত্তরে চলে যায়। বলদ বা মহিষের গাড়িতে বৌ-ছেলেমেয়ে এবং জিনিসপত্র চাপিয়ে, সামনে একপাল গরুমহিষভেড়া নিয়ে এবং সঙ্গে হটেনটট্ বা কৃষ্ণকায় বা বর্ণসঙ্কর দাস ও ভৃত্যদের দঙ্গল নিয়ে এদের এই যাত্রা। সেপ্টেম্বর মাস নাগাদ প্রায় দশ হাজার মানুষ এভাবে চলছিল।

এই যাত্রার উদ্দেশ্য ছিল নতুন বোয়ার-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। একসঙ্গে এতগুলো লোকও এর আগে এভাবে যাত্রা করেনি। বোয়ারদের ইতিহাসে এই অভিযান 'ফোর-ট্রেক্' [voortrek] বা 'গ্রেট-ট্রেক' নামে মহা-অভিযান বলে বিখ্যাত হয়ে আছে। আজও দক্ষিণ আফ্রিকায় বোয়ার-বংশধররা এই অভিযানকে দুর্গম যাত্রার সাহসিকতা রোমাঞ্চকর বীরত্ব ও দৃঢ়সংকল্প উদ্যমের এক অবিস্মরণীয় নিদর্শন বলে গণ্য করে থাকে। বোয়ার-জাতীয়তাবাদের লোককথায়

এই 'মহা-অভিযান' সর্বদা উল্লেখিত হয়। এই অভিযানে অংশগ্রহণকারীদের 'ফোর-ট্রেকার' (voortrekkers) আখ্যা দেওয়া হয়।

এই অভিযানের মূল লক্ষ্য ছিল জুলুজাতির বাসভূমি—বর্তমানের নাটাল প্রদেশ ও জুলুল্যাণ্ড অঞ্চল। নাটালের সমুদ্রতীর, বিস্তীর্ণ জনবিরল তৃণাচ্ছাদিত প্রান্তরভূমি ও পশুপাল সহ অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ, এবং আবহাওয়া বোয়ারদের আকর্ষণ করছিল। নাটাল বন্দরে ইতিমধ্যে একটা ছোটখাটো শ্বেতাঙ্গ-বসতি গড়ে উঠেছিল, সেখানে জাহাজ আসত,—সেটাও একটা বড় আকর্ষণ।

কিন্তু বোয়াররা সবাই নাটাল যেতে চায়নি। বৃটিশ সরকারের আওতা ছাড়িয়ে পর্তুগীজ এলাকার কাছাকাছি বসতিস্থাপনের উদ্দেশ্যে একদল চলে গিয়েছিল আরো উত্তরে। কোন কোন দল নাটালের উত্তর-পশ্চিমে মাটাবেলে জাতির বাসভূমি দখল করতে এগিয়েছিল। এরা যাত্রাপথে আদিবাসী গোষ্ঠীগুলোর সঙ্গে বারবার যুদ্ধ ও সাময়িক সন্ধি করতে করতে এগোচ্ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নাটাল-অভিযানের বাহিনীটিই প্রধান বাহিনী হয়ে ওঠে।

১৮৩৭ সালের অক্টোবর মাসে বোয়ার বাহিনীর অগ্রণী অংশ নাটাল বন্দরে [বর্তমান নাম ডারবান] গিয়ে পৌঁছয়, সেখান থেকে এক প্রতিনিধিদল যায় জুলু জাতির প্রধান ডিঙ্গান-এর দরবারে। ডিঙ্গান-এর কাছে এরা বসবাস করার জন্য জমিজায়গা চায়।

তার পরের ঘটনাগুলো ঠিক যে কি হয়েছিল তা বলা খুব শক্ত। এসব ব্যাপারে প্রচুর মিথ্যা, সত্য-গোপন ও শঠতার জাল ছিল। ঘটনার অনেক পরে শ্বেতাঙ্গ সরকারী দলিল বা ইতিহাস যাঁরা লিখেছেন, তাঁরাও পক্ষপাতদুষ্ট বিবরণ রচনা করেছেন।

বোয়ার-পক্ষের বক্তব্য ডিঙ্গান বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন। বোয়ার-প্রতিনিধিদের নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়ে তাদের তিনি নৃশংসভাবে হত্যা করেন, এবং তারপর বোয়ারদের শিবিরগুলো

আক্রমণ করেন। ২০০ বোয়ার এবং তাদের ৩০০ অশ্বেতাঙ্গ ভৃত্য নিহত হয়।

অন্ততঃ একজন ইতিহাস-লেখক অস্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ বোয়ারদের বিরুদ্ধে ডিঙ্গান করতে পারতেন। কথা ছিল, ডিঙ্গান অনুমতি দিলে তারপর বোয়াররা তাঁর এলাকায় শিবির স্থাপন ও পরে বসতি স্থাপন করবে। কিন্তু বোয়ার-প্রতিনিধিরা ডিঙ্গানের দরবারে যখন কথাবার্তা বলছে, তখনই ডিঙ্গানের অনুমতির অপেক্ষা না রেখে বোয়ারদের প্রধান বাহিনী ডিঙ্গানের এলাকায় ঢুকে পড়ে শিবির স্থাপনা করেছিল।[১১] অন্যান্য আফ্রিকান জাতির সঙ্গে শ্বেতাঙ্গদের বহু অসদাচরণ ও শঠতার খবরও ডিঙ্গান জানতেন। বোয়ার শিবিরের ওপর অতর্কিত আক্রমণ হয়তো তাঁর কাছে ন্যায্য যুদ্ধ-কৌশল বলে মনে হয়েছিল। কিন্তু এই অতর্কিত আক্রমণ ডিঙ্গানকে রক্ষা করতে পারল না। প্রথম আঘাতে তিনি জয়ী হলেন—১৮৩৮ সালের এপ্রিল মাস নাগাদ বোয়াররা প্রায় বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এই সময় একদিক থেকে কেপ কলোনীর বৃটিশ সরকার নাটাল বন্দর অধিকার করল, আরেকদিক থেকে বোয়ারদের অন্য বাহিনীগুলো এসে নাটালে প্রধান বাহিনীর সঙ্গে যোগ দিল।

১৮৩৮ সালের ১৬ই ডিসেম্বর ডিঙ্গানের রাজধানীর কাছে নদী-তীরে বোয়ার-বাহিনীর সঙ্গে জুলুদের যুদ্ধ হয়। বোয়াররা ঘোড়-সওয়ার, হাতে বন্দুক এবং সঙ্গে কামান; জুলুরা পদাতিক, হাতে ঢাল-তলোয়ার-বর্শা-বল্লম। তিন হাজারের ওপর জুলু যোদ্ধা নিহত হয়; বোয়ার-পক্ষে ক্ষতির পরিমাণ তিনজন আহত, নিহত—০। জুলুদের রক্তে নদী লাল হয়ে গিয়েছিল। বোয়াররা নদীটার নাম দেয় Bloedriver, 'রক্তনদী'।[১২]

জুলু জাতি এর পরে আরো অনেকদিন ধরে অনেকবার খণ্ডযুদ্ধ ও বিদ্রোহ করেছিল। কিন্তু তারা ঐক্যবদ্ধও ছিল না,

আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রও তাদের ছিল না। মাঝে মাঝে তাদের আক্রমণের ভয়ঙ্কর কাহিনী শ্বেতাঙ্গ-মহলে প্রচারিত হয়ে শ্বেতাঙ্গদের আতঙ্ক ও নৃশংসতা বাড়িয়েছে। জুলুদের মধ্য থেকে প্রায় সব সময়েই শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে সহযোগিতা করার মতো কোন না কোন গোষ্ঠী-পতিকে পাওয়া গেছে—উপজাতীয় বিবাদে দুর্বল পক্ষ শ্বেতাঙ্গদের আশ্রয় নিয়েছে।

১৮৩৯ সালের ডিসেম্বর মাসে বোয়াররা 'নাটাল সাধারণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠা করল। নাটাল অঞ্চলকে বৃটিশ-দখলে নিয়ে নেওয়ার কথা বিবেচনা করা হয়েছিল, কিন্তু বৃটিশ সরকার অর্থব্যয়ে সম্মত ছিলেন না, এবং বোয়ারদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে সম্মত ছিলেন না। ফলে, ১৮৩৯ সালের ডিসেম্বর মাসে বৃটিশ সৈন্যবাহিনী ও জাহাজ ডারবান [কেপ কলোনীর বৃটিশ গভর্ণরের নামে নাটাল বন্দরের এই নাম দেওয়া হয়েছিল] ছেড়ে চলে যায়।

নাটালের বোয়ার-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সময়, এবং তারপরে আরো কিছুকাল যাবৎ, ওদেশে বোয়ারদের বসতি এবং কার্যকরী শাসন বহাল ছিল অল্প কয়েকটি কেন্দ্রে। ১৮৪২ সাল নাগাদ নাটালে বোয়ারদের নারী-পুরুষ-শিশু মিলে সংখ্যা ৬ হাজারের মতো; আদি-বাসী আফ্রিকানদের সংখ্যা কত জানা যায় না, তবে বহুগুণ বেশি। বেশির ভাগ এলাকায় ইতস্ততঃ ছড়ানো আদিবাসীদের বসতি ছিল। এই আদিবাসীরা, জুলু বা বাণ্টু-ভাষাগোষ্ঠীর অন্যান্য শাখার মানুষ—এরা অধিকাংশই জানতো না যে এরা বোয়ার-রাজ্যের প্রজা হয়ে গেছে। এদের সঙ্গে বোয়ারদের ছোটখাটো সংঘর্ষ প্রায়ই হতো।

নাটালের বোয়ার-রাষ্ট্র সম্বন্ধে কি করা হবে তা নিয়ে বৃটিশ সরকার মনস্থির করতে পারছিল না। একদিকে যুদ্ধযাত্রার খরচ ও ঝামেলা, আরেকদিকে নাটালের গুরুত্ব। নাটাল ভারত মহাসাগরের তীরবর্তী দেশ, সামুদ্রিক বন্দরও রয়েছে সেখানে। বৃটেনের ভারত সাম্রাজ্যের পক্ষে তার গুরুত্ব ছিল, বৃটিশ বাণিজ্যের দিক থেকেও

তার গুরুত্ব ছিল। নাটাল বন্দরে ওলন্দাজ বা জার্মান বা মার্কিন জাহাজ যাতায়াত করলে এবং ওই পথে বাণিজ্যিক সামগ্রী আমদানী রপ্তানী হতে থাকলে কেপ কলোনীর বাণিজ্যিক অবনতি ঘটবে— এ আশঙ্কা ছিল। অতএব, নাটাল বৃটিশ শাসনভুক্ত হওয়া দরকার বলেই বৃটেনের মনে হচ্ছিল। একটা অজুহাতও পাওয়া গেল, বোয়ারদের অত্যাচার থেকে রক্ষা পাবার জন্য নাটালের এক আদি-বাসী গোষ্ঠীর প্রধান বৃটিশ সরকারের শরণাপন্ন হন। ১৮৪২ সালে বৃটিশ সৈন্যবাহিনী নাটালে প্রবেশ করল। ১৮৪৪ সালে নাটাল কেপ কলোনীর অধীন রাজ্য বলে ঘোষিত হল। ফোর-ট্রেকার বোয়াররা নাটাল ছেড়ে উত্তর-পশ্চিমে চলে গেল।

॥ দশ ॥

ফোর-ট্রেকার বোয়ারদের সবশুদ্ধ ছয়টি দল ছিল। তার মধ্যে ট্রিক্‌হার্ট ও ভ্যান রেন্সবার্গ-এর নেতৃত্বে দুটি দল ভাল্ নদী পার হয়ে অনেক উত্তরে লিম্পোপো নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে চলে গিয়েছিল। সেখানে দুই দলে বাদ-বিসংবাদ হয়ে রেন্সবার্গের দল আলাদা হয়ে গিয়ে পর্তুগীজ এলাকার দিকে রওনা হয়েছিল, কিন্তু মাঝপথে আদিবাসী জাতির দ্বারা আক্রান্ত হয়ে সম্পূর্ণ বিনাশপ্রাপ্ত হয়। ট্রিক্‌হার্টের দল সাউট্‌পান্‌স্‌বার্গ এলাকায় কিছুকাল কাটিয়ে শেষে বারুদ ফুরিয়ে যাওয়ায় পর্তুগীজ এলাকায় চলে যায় এবং লরেন্সো মার্কুয়েস্ বন্দর থেকে জাহাজে উঠে নাটাল ফিরে যায়। এদের অনেকেই পথশ্রমে নানাবিধ কষ্টে ও রোগের আক্রমণে মারা গিয়েছিল। মারিৎস, উইস্ ও রেটিয়েফ-এর নেতৃত্বে তিনটি দল নাটালে একত্রিত হয়েছিল। এদের অবশিষ্টাংশের সঙ্গে পরে প্রিটোরিয়াসের নেতৃত্বে আরেকটি নতুন দল এসে যোগ দেয়। ডিঙ্গানের বিরুদ্ধে রক্তনদীর যুদ্ধে প্রিটোরিয়াস এই বোয়ারদের নেতা ছিলেন।

ফোর-ট্রেকারদের ষষ্ঠ দলটির নেতা পট্‌গিয়েটার। এই দলটি নাটালে না এসে ভাল্ নদী পার হয়ে উত্তর-পশ্চিমে মাটাবেলে জাতির বাসভূমিতে চলে গিয়েছিল। ভাল্ নদীর অপর পার বলে এই অঞ্চলটাকে বোয়ার ও ইংরেজরা ট্রান্সভাল্ বলতো।

ট্রান্সভালে মাটাবেলে* জাতির সঙ্গে বোয়ারদের বহু সংঘর্ষ ও যুদ্ধের কাহিনী রয়েছে। ১৮৫৪ সালের একটা কাহিনী উল্লেখযোগ্য। আদিবাসীদের একটি গোষ্ঠী বোয়ারদের একটা ছোট দলকে আক্রমণ ক'রে সবাইকে হত্যা করে। বোয়ারদের এই দলটায় মোট ২৩ জন ছিল—১৩জন পুরুষ, বাকী ১০জন স্ত্রীলোক ও শিশু। আদিবাসী-গোষ্ঠীর প্রধান জানালেন যে এরা তাঁর লোকজনের মধ্য থেকে বাঁধা-গোলাম সংগ্রহ করার জন্য হামলা করতে গিয়েছিল। কথাটা সম্ভবতঃ সত্য। এরপর বোয়াররা সদলবলে ওই আদিবাসা-গোষ্ঠীকে আক্রমণ করে। তারা পালিয়ে গিয়ে এক বিশাল গুহার ভেতরে চলে যায়। যারা গুহার ভেতরে ঢুকতে পারেনি তাদের বোয়াররা হত্যা করে, সংখ্যা ৯০০। তারপর গুহার মুখ রোধ করে বোয়ার-বাহিনী বসে থাকে। ২৫ দিন পরে বোয়াররা ভেতরে ঢুকে ২০০০ আদিবাসীর মৃতদেহ দেখতে পায়। এরা জলের অভাবে তৃষ্ণায় ছটফট্ করে মরেছিল।[১৩]

১৮৪৪ সালে ট্রান্সভালে নূতন বোয়ার রাষ্ট্রের পত্তন হয়। ১৮৫২ সালে বৃটিশ সরকার এই অঞ্চলে হস্তক্ষেপ না করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে 'স্বাধীন বোয়ার সাধারণতন্ত্র'কে স্বীকৃত দিল।

ট্রান্সভাল ও কেপ কলোনীর মধ্যে আরেকটা অঞ্চল—তার দক্ষিণে অরেঞ্জ নদী, উত্তরে ভাল্ নদী, পূর্বে নাটাল আর পশ্চিমে কেপ কলোনী—এ সময়ে ট্রান্স-অরেঞ্জিয়া বলে উল্লেখিত হত। এই অঞ্চলটাতে বোয়ারদের ইতস্ততঃ-ছড়ানো ছোট ছোট অনেকগুলো বসতি গড়ে

---

*এ জাতির আফ্রিকান নাম 'ন্‌দেবেলে', বহুবচনে 'আমান্দেবেলে'; ইউরোপীয় উচ্চারণে 'মাটাবেলে' হয়েছে।

উঠেছিল। আবার এই অঞ্চলে আদিবাসীদেরও অনেকগুলো টুকরো টুকরো বসতি ছিল; এদের গোষ্ঠীপ্রধানদের সঙ্গে কেপ কলোনীর বৃটিশ সরকারের নানারকম চুক্তি হয়েছিল; কেপ সীমান্তে শান্তিরক্ষা সেসব চুক্তির উদ্দেশ্য; বোয়ারদের দ্বারা এরা আক্রান্ত হতে পারে, সেই আশঙ্কায় এরা বৃটিশ অভিভাবকত্ব মেনে নিয়েছিল। সে সময় বোয়ারদের তুলনায় বৃটিশ সরকার কম নৃশংস বলে মনে হয়েছিল এদের, বৃটিশ মিশনারীদের প্রচারও সেদিকে এদের প্রভাবিত করেছিল।

ট্রান্সভালের বোয়ারদের কিন্তু আশা ছিল যে কিছুদিনের মধ্যেই ট্রান্স-অরেঞ্জিয়ার বোয়ার বসতিগুলো ট্রান্সভালের বোয়ার রাষ্ট্রের
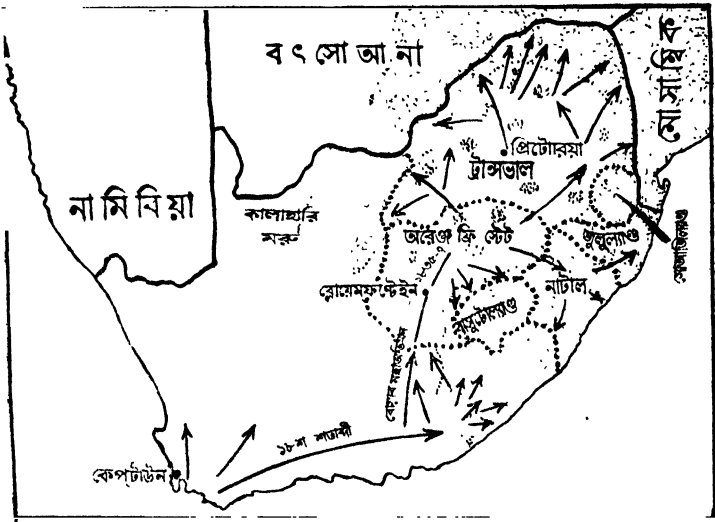
দক্ষিণ আফ্রিকা: ১৮শ—১৯শ শতাব্দী
শ্বেতাঙ্গ বসতির বিস্তার

অন্তর্গত হয়ে যাবে। ১৮৪৮ সালে বৃটিশ সরকার অকস্মাৎ এক হুকুম জারী করে গোটা অঞ্চলটাই বৃটিশ অধিকারভুক্ত করে নিলেন। প্রিটোরিয়াস ট্রান্সভাল থেকে ১০০০ লোক নিয়ে বৃটিশ কর্মচারীদের

বিতাড়ন করতে এগোলেন। বৃটিশ কর্মচারীদের তিনি তাড়ালেন বটে, কিন্তু তারপর বৃটিশ সৈন্যবাহিনী এসে প্রিটোরিয়াসকে তাড়াল। অঞ্চলটার নাম হল 'অরেঞ্জ রিভার সভ্‌রেন্‌টি'। শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত একটি পরিষদ মারফৎ একধরনের শ্বেতাঙ্গ স্বায়ত্তশাসন এই সময় চালু করা হয়। ফলে, ছয় বছর পরে এই অঞ্চলই 'অরেঞ্জ ফ্রি স্টেট' নাম ধারণ করে আরেকটা 'স্বাধীন বোয়ার সাধারণতন্ত্র' হয়ে গেল।

॥ এগার ॥

১৮৫০-১৮৬৭ সালের সময়টায় বৃটেন একদিকে বোয়ারদের সঙ্গে শান্তি-সমঝাওতা, আরেকদিকে আফ্রিকান জাতিগুলোকে বশীভূত অথবা বাধ্য করে বৃটিশ শাসনাধীনে আনার কৌশল নিয়ে চলছিল। কখনো কখনো আদিজাতি-বিদ্রোহের বিরুদ্ধে বোয়ারদের সমর্থন, কখনো কখনো বোয়ারদের বিরুদ্ধে আদিজাতির রক্ষাকর্তা হয়ে দাঁড়ানো, কখনো বা নিরাসক্ত মধ্যস্থ বা নিরপেক্ষ দর্শক, বৃটেনের ভূমিকায় সবগুলো উপাদানই ছিল। কোন কোন বৃটিশ মিশনারী আফ্রিকান মানুষদের জন্য কল্যাণকর্ম করছিলেন। তাঁদের কেউ কেউ বোয়ারদের বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা করছিলেন। তাঁদের কাজকর্ম ও প্রভাবের সঙ্গে বৃটিশ সরকারের ভূমিকা জড়িয়ে গিয়ে বৃটিশ আচরণ অনেক সময়েই দুর্বোধ্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

এসব জটিলতার মধ্য দিয়েও বৃটিশ সরকারের যে ঝোঁকটা স্পষ্ট হয়ে উঠছিল, তা হল বোয়ার-বৃটিশ সহযোগিতার ঝোঁক। বিশেষতঃ জুলু ও খোশা জাতির যুদ্ধক্ষমতা নিয়ে বৃটিশ সরকারী মহলে আতঙ্ক ছিল।

কেপ কলোনীর পূর্বপ্রান্তে কোণঠাসা-হয়ে-থাকা খোশা জাতির সঙ্গে ক্রমাগত যুদ্ধ করতে করতে বৃটিশ সরকার প্রায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। ১৮৪৬ সালে 'সপ্তম কাফির যুদ্ধ' বাধল একটা কুড়ুল-

চুরির ঘটনা উপলক্ষ করে। সেবার বৃটিশ সরকারকে খোশা জাতির বিরুদ্ধে ১৪০০০ সৈন্য নামাতে হয়েছিল। যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে খোশা জাতি আবার অনেকখানি জায়গা-জমি ছেড়ে হঠে যেতে বাধ্য হল—কেইস্‌কাম্মা ও কেই নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল 'বৃটিশ কাফ্‌রারিয়া' নামধারণ করে বৃটিশ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। ১৮৫০ সালে আবার যুদ্ধ বাধল—'অষ্টম কাফির যুদ্ধ', দীর্ঘতম 'কাফির যুদ্ধ'। শুধু সৈন্যবাহিনী দিয়ে বৃটিশ সরকার এ যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারেনি; কেপ কলোনীর বাসিন্দা শ্বেতাঙ্গ জমিদারদের শেষ পর্যন্ত ভয় দেখাতে হয়েছিল যে তারা সদলবলে যুদ্ধে না নামলে বৃটিশ সৈন্য সরিয়ে নিয়ে 'কাফির'দের হাতে জমি-জায়গা ছেড়ে দেওয়া হবে; সেইসঙ্গে লোভও দেখানো হয়েছিল, 'কাফির'দের গরু মহিষ ভেড়া লুট করা যাবে। শেষ পর্যন্ত এই বে-সামরিক শ্বেতাঙ্গ বাসিন্দারা যুদ্ধে নামে, ১০০০০ গরু মহিষ লুট করে, এবং যুদ্ধ শেষ হয় ১৮৫২ সালের অক্টোবর মাসে।[১৪] খোশা জাতি আবার পিছু হঠল।

খোশা জাতির ইতিহাসে এর পর এক মর্মন্তুদ ধ্বংসকাণ্ড এল ১৮৫৭ সালে। ভারতে সাঁওতাল বিদ্রোহের শেষ বৎসর, সিপাহী-বিদ্রোহের প্রথম বৎসর ১৮৫৭ সাল।

পরাজিত, বিধ্বস্ত, হতাশ্বাস খোশা জাতি অলৌকিক দৈবশক্তির স্বপ্ন দেখছিল, যা দিয়ে বিদেশী অত্যাচারী দস্যুদের পরাস্ত করা যাবে। একটি মেয়ে নাকি দৈবস্বপ্ন দেখেছিল,—খোশা জাতির মৃত বীর নায়করা তাকে বললেন, ১৮৫৭ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী মহা শুভদিন আসছে; সেদিন সমস্ত মৃত খোশা বীররা পুনরায় জীবিত হয়ে উঠে যুদ্ধে নামবে; রক্তাক্ত লাল সূর্য উঠবে সেদিন এবং পূর্বদিকেই অস্ত যাবে; প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড় এসে শাদা-চামড়াদের উড়িয়ে নিয়ে যাবে; বৃদ্ধরা নবযৌবন পেয়ে আবার বীর যোদ্ধা হয়ে দাঁড়াবে, মাটি ভেদ করে উঠে আসবে গরু মহিষ ভেড়ার বিশাল পাল, শস্যের সমুদ্র।

এই শুভদিনকে আনতে হলে তার আগে উপযুক্ত আত্মত্যাগ ও বলিদান দরকার। সমস্ত পশু হত্যা করে ফেলতে হবে, শস্য পুড়িয়ে ফেলতে হবে, জমির বুকে লাঙ্গল চালানো বন্ধ রাখতে হবে।

অন্ধবিশ্বাসের পিঞ্জরে আবদ্ধ, নিরুপায়, অবমানিত জাতি এই অলৌকিক আশ্বাসকে সমস্ত প্রাণমন দিয়ে বিশ্বাস করে আত্মধ্বংসের বিপুল যজ্ঞে মেতেছিল। নির্ধারিত দিনে কিন্তু কিছুই হল না— পরলোকগত বীরেরা এল না, ঝড় উঠল না, শস্য ও পশুর ভাণ্ডার শূন্য হয়েই রইল। সূর্যাস্তের পর অনাহার-জর্জরিত কুটীরগুলো থেকে কান্নার রোল উঠল। তখন ঘরে ঘরে মৃত্যুদূতের করাল কালো পাখার ঝাপ্‌টানি। ৩০ হাজারের ওপর মানুষ না খেয়ে মরল। অনেক মানুষ এরপর চলে গেল দূর-দূরান্তরে, তাদের হিসেব নেই। এক বৃটিশ কাফ্‌রারিয়াতেই খোশা জাতির লোকসংখ্যা ১ লক্ষ ৫ হাজার থেকে ৩৭ হাজারে নেমে এল। খোশা জাতির মেরুদণ্ড যেন ভেঙে গেল।[১৫] ১৮৭৭ সালে তারা আবার বিদ্রোহ করেছিল, কিন্তু সে বিদ্রোহ বৃটিশ সরকার খুব সহজেই দমন করে দিয়েছিল।

কিন্তু ১৮৫০-৫২ সালের 'অষ্টম কাফির যুদ্ধে' বৃটিশ সরকার খুব বেগ পেয়েছিল। যুদ্ধশেষে তারা দেখল যুদ্ধ চালাতে গিয়ে তাদের ২০ লক্ষ পাউণ্ড ঋণ করতে হয়েছে। বর্তমান কালের যুদ্ধযাত্রার ব্যয়ের অনুপাতে, এবং 'ঘাটতি বাজেট' ও ঋণ-ভিত্তিক অর্থনীতির দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এটা কিছুই নয়। কিন্তু তখনকার দিনে এ ব্যাপারগুলো সরকারের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীদের পক্ষে ভয়ানক উদ্বেগজনক ব্যাপার ছিল। দক্ষিণ আফ্রিকায় যুদ্ধের খরচ কমানোর জন্য বোয়ারদের সঙ্গে সমঝাওতা খুব দরকার বলে মনে হচ্ছিল।

১৮৫৭-৫৯ সালের ভারত-বিদ্রোহ বৃটিশ সরকারকে আরেক রকমে উদ্বিগ্ন করে তোলে। ভারতসাম্রাজ্য রক্ষার জন্যও দক্ষিণ আফ্রিকায় শান্তি ও সমঝাওতা প্রয়োজন হয়ে উঠেছিল। কয়েক বছর পরে অবশ্য ভারতসাম্রাজ্যের লোকবল ও অর্থবল আফ্রিকায়

বৃটিশ-সাম্রাজ্য বিস্তারে প্রভূত সাহায্য করেছিল। কিন্তু সে পরের কথা।

১৮৫২ সালে বৃটেন ট্রান্সভালের বোয়ার-রাষ্ট্রকে স্বাধীন রাষ্ট্র বলে স্বীকৃতি দেয়। ১৮৫৪ সালে 'অরেঞ্জ ফ্রি স্টেট'ও স্বাধীন রাষ্ট্র বলে স্বীকৃতি পেল। ১৮৫৬ সালে নাটাল রাজ্যে শ্বেতাঙ্গ বাসিন্দাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা স্থানীয় প্রাদেশিক সরকার গঠনের অধিকার দেওয়া হয়। কেপ কলোনীর শ্বেতাঙ্গ বাসিন্দাদের এ অধিকার দেওয়া হয়েছিল ১৮৫৩ সালে।

ট্রান্সভালের বোয়ার রাষ্ট্র ১৮৫৯ সালে 'দক্ষিণ আফ্রিকা সাধারণতন্ত্র' (সাউথ আফ্রিকান রিপাবলিক) নাম ধারণ করল। তখন ট্রান্সভাল ও অরেঞ্জ ফ্রি স্টেট-এর মিলনসাধন করে একটি বোয়ার রাষ্ট্রে পরিণত করার কথা হচ্ছিল। ট্রান্সভাল রাষ্ট্রের সরকারী তহবিলের অবস্থা ভালো ছিল না, অরেঞ্জ ফ্রি স্টেটের সরকারী তহবিলও সামান্য। আফ্রিকান জাতিগুলির সঙ্গে কলহ ও ছোটখাটো যুদ্ধ প্রায় নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপার। তার ওপর 'স্বাধীন' বোয়াররা নিজেদের স্বাধীন সরকার চাইলেও সেই সরকারকে ট্যাক্স দেওয়া মোটেই পছন্দ করত না।[১৬] বোয়ার নেতাদের মধ্যে প্রায়ই বিবাদ-বিসংবাদ হচ্ছিল। ধর্মীয় আচারের খুঁটিনাটি বিষয় নিয়েও বিবাদ হতো—একে অপরকে 'অখ্রীস্টান' 'অ-ধার্মিক' আখ্যা দিত, গোঁড়া উগ্র পিউরিটান-এর সঙ্গে অন্য প্রোটেস্টান্ট-এর বিবাদ হতো। আফ্রিকান বসতি আক্রমণ করার পর লুট-করা গরুমহিষের পালের ভাগ-বাঁটোয়ারা নিয়ে বিবাদ হতো। ট্রান্সভাল ও অরেঞ্জ ফ্রি স্টেটের সংযুক্তির প্রস্তাব নিয়েও মতভেদ ছিল।

আরেকদিক থেকে লণ্ডনের বৃটিশ সরকারী মহল কেপ কলোনী ও নাটালের নিত্যনূতন সমস্যা, ক্রমাগত যুদ্ধযাত্রা ও প্রশাসন বাবদে বর্ধমান ব্যয়ভার ইত্যাদির বোঝা নিজেদের ঘাড় থেকে খানিকটা নামাবার উদ্দেশ্যে চেষ্টা করছিল যাতে কেপ কলোনী, নাটাল,

অরেঞ্জ ফ্রি স্টেট ও ট্রান্সভাল একত্রে মিলিত হয়ে বৃটিশ প্রভাবাধীন একটা ফেডারেশন গঠন করে। ফেডারেশনের প্রস্তাব সে সময়ে সফল হয়নি।

॥ বার ॥

শ্রেণী-ভিত্তিক সমাজে ও রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক বন্দোবস্তের মূল কথাটা হল উদ্বৃত্ত সম্পদ উৎপাদনের উপায় নিয়ে। অল্প কিছু লোক অধিকাংশ মানুষকে কি উপায়ে খাটিয়ে নিয়ে তাদের ভরণ-পোষণের খরচার অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত মূল্য আদায় করে নেবে—এইটাই মূল প্রশ্ন।

আফ্রিকার দক্ষিণ ভাগে প্রথমদিকে প্রধান ব্যবস্থা ছিল দাস-ভিত্তিক। ১৮৬০-এর দশকেও ট্রান্সভাল ও অরেঞ্জ ফ্রি স্টেটে ক্রীতদাস-প্রথা এবং বন্দীদাস-প্রথা চালু ছিল। ক্রীতদাস-প্রথা সম্বন্ধে নিন্দাবাদ এড়ানোর একটা কৌশল ছিল 'অ্যাপ্রেন্টিস'-প্রথা। ১৭৭৫ সালে অন্তরীপ অঞ্চলে বোয়ার-রাজ্যে আইন করা হয়েছিল যে ক্রীতদাস পিতা ও হট্টেনটট্ মাতার সন্তান মাত্রেই ১৮ মাস বয়স থেকে ২৫ বছর বয়স পর্যন্ত বোয়ার জমিদারের ক্ষেত-খামারে বা গোয়ালে-খাটালে-ঘোড়াশালে-কামারশালে-যাঁতাশালে 'অ্যাপ্রেন্টিস' নামে বাঁধা-গোলাম হয়ে থাকতে বাধ্য। ১৮০৯ সালে বৃটিশ গভর্ণরের আইনেও 'ভবঘুরে' (ভেগ্রাণ্ট) বা 'কর্মহীন' আদিবাসীদের শ্বেতাঙ্গরা ধরে নিয়ে এসে 'অ্যাপ্রেন্টিস' করে রাখতে পারত। বুশম্যানদের বসতিতে হানা দিয়ে বয়স্কদের মেরে ফেলে বাচ্চাগুলোকে লুট করে এনে 'অ্যাপ্রেন্টিস' করে রাখা শ্বেতাঙ্গদের আইন-মোতাবেক অধিকার বলে গণ্য ছিল। এই 'অ্যাপ্রেন্টিস'-প্রথা অন্যান্য আফ্রিকান জাতি-গুলোর ওপরেও খাটানো হচ্ছিল।

১৮৫০, ১৮৬০-এর দশকে ট্রান্সভাল ও অরেঞ্জ ফ্রি স্টেটের বোয়াররা 'অ্যাপ্রেন্টিস' জোগাড় করতে যেত বন্দুক নিয়ে। ট্রান্সভালের উত্তর-অঞ্চলে হের্মানুস্ পট্‌গিয়েটার নামে এক বোয়ার

নেতার পদ্ধতি ছিল, মাঝে মাঝে আফ্রিকান বসতিতে গিয়ে তাদের কুটিরগুলোর সামনে একটা লোহার ডাণ্ডা বা শাবল পুঁতে দাঁড়িয়ে থাকা; এরপর আফ্রিকান পিতামাতাকে তাদের শিশুসন্তান নিয়ে এসে শ্বেতাঙ্গ দেবতার চরণে অর্পণ করে যেতে হত, নতুবা···।[১৭]

বৃটেনের লণ্ডন মিশনারী সোসাইটি বোয়ারদের এসব কাণ্ড-কারখানা পছন্দ করতেন না। মিশনারীদের মধ্যে ডেভিড লিভিং-স্টোনের মত মানুষ ছিলেন, যিনি সত্যসত্যই আফ্রিকানদেরও মানুষ মনে করতেন, এবং পর্তুগীজ-আরব দাসব্যবসায়ীদের হাত থেকে এবং বোয়ার-লুটেরাদের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য আফ্রিকানদের হাতে তাঁর সাধ্যমতো বন্দুক তুলে দিতেন। আবার কেউ কেউ ছিলেন যাঁরা ক্রীতদাস ও বাঁধা-গোলামের পরিবর্তে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার উপযোগী "স্বাধীন মজুর" নিয়োগ পছন্দ করতেন, দাসভিত্তিক শোষণব্যবস্থা ও সামন্ততান্ত্রিক শোষণব্যবস্থার বদলে ধনতান্ত্রিক শোষণব্যবস্থাকে সভ্য ও ন্যায়নীতিসঙ্গত বলে মনে করতেন। মোট কথা, বোয়ার-শাসনের বিরুদ্ধে লণ্ডন মিশনারী সোসাইটি একটা প্রতিবাদ চালু রেখেছিলেন।

আফ্রিকার এই অঞ্চলে শ্রমের আরেকটা উৎস ছিল দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত কয়েদী। ইউরোপীয় বসতিস্থাপনের প্রথম পর্বে কঠিন দণ্ডপ্রাপ্ত ও দুর্দান্ত ধরনের কয়েদীদের মাঝে মাঝে অন্তরীপ অঞ্চলে ও রবেন দ্বীপে পাঠানো হত—তাদের খাটিয়ে পথঘাট তৈরী করা হতো। ১৮৪০-এর দশকেও বৃটেন থেকে এবং ভারত ও অন্যান্য দেশ থেকে কয়েদী-শ্রমিক আমদানী করা হচ্ছিল।[১৮] কিন্তু এই ধরনের শ্বেতাঙ্গ কয়েদী-শ্রমিক শ্বেতাঙ্গ বাসিন্দাদের পছন্দ হত না, এদের সম্বন্ধে তাদের ভয়ও ছিল। ১৮৪৮ সালে আয়ার্ল্যাণ্ডের জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের বন্দী আইরিশদের কয়েদী-শ্রমিক করে পাঠানোর প্রস্তাবে শ্বেতাঙ্গ বাসিন্দারা তুমুল প্রতিবাদ জানায়।[১৯]

এর পরে নজর পড়ে ভারত থেকে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক [Indentured

Labour] আমদানীর ওপর। ভারত-মহাসাগরের মরিশাস দ্বীপে এবং আমেরিকার নিকটে ট্রিনিডাড্ বার্বাডস্ জ্যামেইকা প্রভৃতি ক্যারিবিয়ান দ্বীপে চুক্তিবদ্ধ ভারতীয় শ্রমিকদের শ্রমে প্রভূত সম্পদ উৎপন্ন হচ্ছিল। বিশেষতঃ আখ-চাষের কাজে শ্রমক্ষমতা ও দক্ষতায় তারা সেরা শ্রমিক বলে গণ্য হতো। মরিশাসের দেখাদেখি নাটালে এসময় শ্বেতাঙ্গ জমিদাররা আখ-চাষ শুরু করেছিল। আফ্রিকানদের ওপর কুটির-কর ('হাট্ ট্যাক্স') বসিয়ে এবং তাদের দিয়ে বেগার-খাটুনি খাটিয়ে কিছু মজুর জোগাড় হলেও তাদের দিয়ে আখ-চাষের চেষ্টায় বিশেষ ফল হল না। তখন ভারতের বৃটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী-সরকারের সঙ্গে কিছুটা দরাদরি করে শেষ পর্যন্ত ১৮৫৯ সালে ভারতবর্ষ থেকে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক আমদানী শুরু হল। এদের 'কুলী' বলা হত—ভারতেও চা-বাগানে ও অন্যত্র শ্রমিকদের সেই আখ্যা ছিল।

এদের প্রথম আনা হত তিন বৎসরের মেয়াদে। খোরাক ও আশ্রয় দেওয়া হত, এবং প্রথম বৎসর মাসে ১০ শিলিং হারে নগদ মজুরী দেওয়া হত; দ্বিতীয় বৎসরে নগদ মজুরী ১১ শিলিং, এবং তৃতীয় বৎসরে ১২ শিলিং। তিন বৎসর পরে 'কুলী' তার মনিবের সঙ্গে, অথবা নতুন কোন মনিবের সঙ্গে অন্ততঃ আরো এক বৎসর চুক্তি করতে বাধ্য। পাঁচ বৎসর 'চুক্তিবদ্ধ কুলী' হিসাবে খাটবার পর তার যেখানে খুশি মেহনৎ বিক্রী করার অধিকার হত, অর্থাৎ সে 'স্বাধীন মজুর' বলে গণ্য হত। দশ বৎসর পরে সে ইচ্ছা করলে দেশে ফিরে যেতে পারত, জাহাজের ভাড়া পেত; ইচ্ছা করলে ওই জাহাজ-ভাড়ার টাকার বদলে একটুকরো জমি নিয়ে সে নাটালের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যেতে পারত।[20] ১৮৬৫ সাল নাগাদ শর্তগুলো বদ্‌লে ন্যূনপক্ষে পাঁচ বৎসরের চুক্তি বাধ্যকরী করে দেওয়া হয়, এবং 'কুলী'র ওপর আরো কড়াকড়ি শোষণ চাপানো হয়। ততদিনে ৬৫০০. 'কুলা' আমদানী হয়েছে, এবং তাদের ঘামে, রক্তে, চোখের

জলে, দীর্ঘশ্বাসে নাটালের সমৃদ্ধির ভিত্তি নির্মাণ হয়েছে। ১৮৭২ সালে ভারতের বৃটিশ সরকার একবার 'কুলী'-রপ্তানী বন্ধ করে দিয়েছিল, ১৮৭৪ সালেই আবার শুরু করে দিল।

।। তের ।।

১৮৫৪ সালে বৃটেন যখন অরেঞ্জ ফ্রি স্টেটকে স্বাধীন রাষ্ট্র বলে স্বীকৃতি দেয়, তখন ওই রাজ্যের দক্ষিণ সীমান্তে পশ্চিমদিকে ছিল পশ্চিম গ্রিকোয়াল্যাণ্ড, এবং পূর্বদিকে ছিল পূর্ব গ্রিকোয়াল্যাণ্ড ও বাসুটোল্যাণ্ড। এই অঞ্চলগুলো বিভিন্ন আফ্রিকান গোষ্ঠীর বাসভূমি, এদের সীমানা-রেখা স্পষ্ট করে নির্দিষ্ট হয়নি। বাসুটোল্যাণ্ডের সোথো জাতির সঙ্গে সীমানা নিয়ে অরেঞ্জ ফ্রি স্টেটের বোয়ারদের প্রায়ই বিবাদ-সংঘর্ষ বাধত, কেপ কলোনীর বৃটিশ সরকার যেত মধ্যস্থতা করতে। ১৮৬৫ সালে অরেঞ্জ ফ্রি স্টেট বাসুটোল্যাণ্ড আক্রমণ করে। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে সোথো-প্রধান মশেশ্ বোয়ারদের কাছে আত্মসমর্পণ না করে বৃটিশ সরকারের শরণাপন্ন হলেন, এবং বৃটিশ-অধীনতা স্বীকার করে নিলেন। ১৮৬৮ সালে বৃটেন বাসুটোল্যাণ্ডকে বৃটিশ-অধিকারভুক্ত এলাকা বলে ঘোষণা করল।

পশ্চিম গ্রিকোয়াল্যাণ্ডে লণ্ডন মিশনারী সোসাইটির মিশনারীদের উদ্যোগে বর্ণসঙ্কর ও খয়-খইন ('হট্টেনটট্') মানুষদের বসতি স্থাপিত হয়েছিল। এদের প্রধান ছিলেন অ্যাডাম কক্, এবং ওয়াটারবোয়ার —দুই প্রধানের দুটো পৃথক্ এলাকা। একদিকে বৃটিশ সরকার, আরেকদিকে বোয়ার সরকার, আবার আরেকদিকে ভূ-সম্পত্তির সন্ধানে বা খনিজ সম্পদের সন্ধানে আগত বিভিন্ন শ্বেতাঙ্গ ভাগ্যান্বেষ —এদের সঙ্গে নানারকম চুক্তি, বাদ-বিসংবাদ, দর-কষাকষি চতুর বন্দোবস্ত বা নির্বোধ বন্দোবস্ত করে গ্রিকোয়াল্যাণ্ডের অস্তিত্ব কোনরকমে বজায় ছিল।

১৮৭১ সাল নাগাদ গ্রিকোয়াল্যাণ্ড অঞ্চলে এবং গোটা দক্ষিণ আফ্রিকায় অনেক কিছু ওলট-পালট শুরু হয়ে গেল। বৃটিশ-বোয়ার সম্পর্কও আবার ওলট-পালট হয়ে গেল। কারণ, হীরে এবং সোনা, এবং সেই সঙ্গে রেলওয়ে এবং টেলিগ্রাফ। আরেকটা কারণ আফ্রিকায় সাম্রাজ্য দখলের জন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির মধ্যে কাড়াকাড়ি ছুটোছুটি—কে কতটা দখল করে নিতে পারে তার জন্য ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়বাজি। আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের দুনিয়া-ভাগ-বাঁটোয়ারার খেলা শুরু হয়ে গিয়েছিল।

তৃতীয় অধ্যায়

হীরে, সোনা, রাজ্য

॥ এক ॥

আফ্রিকার এই দক্ষিণ খণ্ডে মাটির নীচে সঞ্চিত ছিল অতুলনীয় সম্পদ—সোনা, হীরে, তামা, লোহা, সীসে, কয়লা। এখনকার কালে আরো পাওয়া গেছে ক্রোম, অ্যাসবেস্টস, জিঙ্ক, ম্যাঙ্গানিজ,—এবং ইউরেনিয়াম।

এ অঞ্চলের আদিবাসিন্দারা লোহা ও সোনার খবর রাখত। ট্রান্সভালের লেইডেনবার্গ অঞ্চলে আদিবাসীরা লোহা তুলতো, লোহা গালাতো বহুকাল আগে থেকে। এখান থেকে, এবং আরেকটু উত্তরের অঞ্চলগুলো থেকে লোহা রপ্তানী হতো—সোফালা, জাঞ্জিবার হয়ে ভারতে চালান যেত। ১১৫৪ খ্রীস্টাব্দ নাগাদ আরব লেখক অল্‌-ইদ্রিসি লিখেছিলেন সোফালার লোহার কথা—ভারতে এই লোহার খুব চাহিদা, ভারতীয় কারিগররা এই লোহা থেকে চমৎকার ইস্পাত করে, দুনিয়ার সবচেয়ে সেরা তলোয়ার তৈরী করে।[১] তাছাড়া সোনার খনি ছিল, পলিমাটির সঙ্গে হীরের গুঁড়ো ভেসে আসত ভাল্ নদীর মোহানায়।

কিন্তু বোয়াররা এই বিশাল খনিজ সম্পদের কথা প্রথমদিকে খেয়াল করেনি। আফ্রিকানদের প্রাচীন খনিগুলো চোখে দেখেও তারা ওগুলোকে গুরুত্ব দেয়নি। জমি, পশুর পাল, ফলবাগিচা, অরণ্যের ফসল, চাষবাস আর দাসশ্রমিকের শ্রম—এই তাদের প্রায় একমাত্র লক্ষ্য ছিল। মাঝে মাঝে ভাগ্যান্বেষী ভবঘুরে-ধরনের লোকেরা, ভূ-পর্যটক, মিশনারী, বা খুদে সওদাগররা সোনা, রূপো, হীরের খবর আনত, কিন্তু সেই সূত্রে বিশেষ কোন বড় ধরনের ব্যাপার হয়ে ওঠেনি।

১৮৬৭ সালে অরেঞ্জ নদীর দক্ষিণতীরে কেপ কলোনীর হোপ-টাউনে একখণ্ড হীরে পাওয়া গেল। পরের বৎসর ট্রান্সভাল ও গ্রিকোয়াল্যাণ্ডের অনির্দিষ্ট সীমান্ত-অঞ্চলে ভাল্ নদীর তীরে ভিজে মাটির মধ্যে পাওয়া গেল আরেকখণ্ড হীরে। তারপর ১৮৭০ সালে ভাল্ নদীর তীরে পাওয়া গেল এক মস্ত বড় হীরে—'স্টার অব্ আফ্রিকা' নামে বিখ্যাত ; এই হীরকখণ্ডটি প্রথম বিক্রীর সময় দাম হয়েছিল ১১০০০ পাউণ্ড, দ্বিতীয়বার বিক্রীর সময় দাম হল ২৫০০০ পাউণ্ড।

১৮৭১ সালে অরেঞ্জ ফ্রি স্টেট ও গ্রিকোয়াল্যাণ্ডের ওই অনির্দিষ্ট সীমান্ত এলাকাতেই পৃথিবীর বৃহত্তম হীরকখনি অঞ্চল আবিষ্কৃত হল। সে সময়কার বৃটিশ সরকারের উপনিবেশ-দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী আর্ল অব্ কিম্বার্লি'র নামে এই হীরকখনি অঞ্চলের নাম হয়েছে 'কিম্বার্লি'। বোয়াররা নড়েচড়ে উঠবার আগেই তুনিয়া নড়ে উঠল। হীরের টুকরোর লোভে লোক ছুটে আসতে লাগল এইদিকে। বৃটেন, জার্মানী, হল্যাণ্ড থেকে তো বটেই, মার্কিন দেশ, অস্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাণ্ড থেকে শ্বেতাঙ্গ ভাগ্যান্বেষীরা ছুটে আসতে থাকল প্রায় দলে দলে। কেপ টাউন থেকে ভাগ্যান্বেষীর দল ছুটল উত্তরদিকে, ভাল্ নদীর তুই তীরে।

১৮৬৭ সালেই ট্রান্সভালের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে মাটাবেলে-মাশোনা জাতির এলাকায় টাটি-তে সোনার খনির সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল। কেপ কলোনী থেকে উত্তরদিকে কালাহারি মরুভূমির প্রান্তে অরেঞ্জ ফ্রি স্টেট ও ট্রান্সভালের সীমান্ত ঘেঁষে পথ ছিল—এই পথে মিশনারীরা যাতায়াত করতেন বলে এর নাম হয়েছিল 'মিশনারী রোড'। এই মিশনারী রোড দিয়ে এখন স্বুবর্ণসন্ধানীরা ছুটল টাটির দিকে। ট্রান্সভাল সরকার ১৮৬৮ সালের এপ্রিল মাসে টাটি এবং মিশনারী রোড-এর খানিকটা ট্রান্সভালের এলাকা বলে ঘোষণা করল।

ওদিকে কিম্বার্লির হীরকখনি অঞ্চলটাকে অরেঞ্জ ফ্রি স্টেট, কেপ কলোনী এবং গ্রিকোয়াল্যাণ্ড তিন রাজ্যই নিজের এলাকা বলে দাবী করছিল। ঝগড়া-বিবাদ, মামলা-মোকদ্দমা, নালিশ-সালিশ নানারকম হল। শেষ পর্যন্ত সালিশের রায় হল ওই অঞ্চলটা গ্রিকোয়াল্যাণ্ডের এলাকা। বৃটেন ১৮৭১ সালে অম্লানবদনে গোটা গ্রিকোয়াল্যাণ্ডটাই বৃটিশ এলাকার অন্তর্ভুক্ত করা হল বলে ঘোষণা করে কিম্বার্লি দখল করল। পরে আবার নতুন সালিশ হল, কিম্বার্লি গ্রিকোয়াল্যাণ্ডের এলাকা নয় বলে রায় হল। বৃটেন কর্ণপাত করল না।

১৮৭২ সালে ট্রান্সভালের পূর্ব অঞ্চলে পুরনো সোনার খনির সন্ধান পাওয়া গেল। হীরের খনি নিয়ে রেষারেষি ছাপিয়ে উঠল এবার সোনার খনির খবর। পঙ্গপালের মত লোক ছুটল উত্তরদিকে, আর নানা জায়গায় দৌড়ে গিয়ে পয়লা দখলের পিল্‌পেগাড়ি, খুঁটিগাড়ি করতে লাগল। এবার জমি দখল—ফসলের জন্য নয়, জমির ওপরে কোন কিছুর জন্য নয়, জমির তলায় কি পাওয়া যেতে পারে সেইজন্য। জমি দখল করা, বেদখল করা, স্বত্ব কেনা-বেচা, তালুক-মহল ইজারা বন্দোবস্ত, বিলিবন্দেজ নানারকম কাণ্ডকারখানা হতে থাকল। আদিবাসীদের গোষ্ঠীপ্রধানদের সঙ্গে কোথাও মারপিট যুদ্ধ করে, কোথাও ঘুষঘাষ দিয়ে, কোথাও মিতালী পাতিয়ে তাদের এলাকার জমিগুলো বেহাত করা হচ্ছিল। দরকার মতো আবার কাউকে গোষ্ঠী-প্রধান বলে জাহির ক'রে যে জমির ওপর তার কোনো স্বত্ব নেই সেই জমি তার কাছ থেকে লিখিয়ে নেওয়া—তাও হচ্ছিল। শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে জমি-কাড়াকাড়ি, ঠেলাঠেলি এবং দু-একটা খণ্ডযুদ্ধও হচ্ছিল। চতুর্দিকে কেবল গুজব—আরো বড় সোনার খনি আছে, আরো বড় হীরের খনি আছে, উত্তরে সোনার পাহাড় জমানো আছে। সোনা-হীরের সন্ধানীদের পিছু পিছু ছুটছিল সুযোগসন্ধানীরা ; মাটি খুঁড়ে সোনা-হীরে উদ্ধার করার মত সময় ধৈর্য বা মূলধন তাদের নেই,

তারা কোনক্রমে একটুকরো জমি দখল করে তারপর চড়া দরে সেটা বেচে দিয়ে খুব তাড়াতাড়ি বড়লোক হবার ধান্দায় ঘুরছে। ১৮৭১ সাল নাগাদ কিম্বার্লি এলাকায় ৯০০ বর্গফুট এরকম জমির টুকরো ৪০০০ পাউণ্ড পর্যন্ত দামে বিক্রী হচ্ছিল। যারা কিনছিল, তারা অনেকে ঠকছিল, মাটি খুঁড়ে কিছুই পাচ্ছিল না; কিন্তু অনেকে আবার দারুণ জিতে যাচ্ছিল—৫০ পাউণ্ড দামে একটুকরো জমি কিনে দুই মাসের খোঁড়াখুঁড়িতে ১৫ হাজার পাউণ্ড দামের হীরে উদ্ধার করেছিল একজন।[২]

এইসঙ্গে চলছিল অন্য ব্যবসা। চোর, ডাকাত, ঠগ, বেশ্যা, স্মাগ্‌লার, জুয়াড়ী; দোকানী, হোটেলওয়ালা, মদ্যব্যবসায়ী, পানশালার শুঁড়ী; দৌলতের গন্ধে ছুটে-আসা কাক-শকুন আর মাছির পাল। আর মাটিকাটার কাজে নিযুক্ত আফ্রিকান কুলী-কামিন—শ্বেতাঙ্গ গঞ্জের উপকণ্ঠে ঝুপ্‌ড়িতে গাছতলায় যাদের বাস, দু-চার মাস খাটনী খেটে কিছু নগদ পয়সা নিয়ে যাদের বিদায়।

সেইসঙ্গে রেলওয়ে টেলিগ্রাফ চালু হচ্ছিল, বন্দর বড় হয়ে উঠছিল, জাহাজ-চলাচল ও ডাক-চলাচল বাড়ছিল। ব্যাঙ্ক, বড় বড় কোম্পানীর অফিস, শেয়ার লেনদেনের কারবার, মহাজনী ব্যবসা সবই বাড়ছিল। এ সমস্ত অবশ্য শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে,—এবং শহর-বন্দরে। বড় বড় জমির মালিক শ্বেতাঙ্গ বোয়াররা, যারা বেশির ভাগ চাষবাস নিয়ে থাকত, তারা এই হঠাৎ-ছুটে-আসা আধুনিক অর্থনীতির চালচলন ও প্রচণ্ড গতিবেগের সঙ্গে তাল রাখতে পারছিল না, তাদের মনে এ নিয়ে অসন্তোষই দানা বাঁধছিল। ওদিকে লণ্ডন, প্যারিস, আমস্টার্ডাম, নিউইয়র্ক—সর্বত্র ব্যাঙ্ক ও শেয়ার-বাজার দক্ষিণ আফ্রিকা নিয়ে চঞ্চল; এদিকে বোয়ার তার বিশাল জমিদারী নিয়ে গজেন্দ্র গমনেই চলছে, কখনো বা অতিকায় কচ্ছপের মতো নিজের বর্মের মধ্যে ঢুকে থাকছে।

খনি, রেলওয়ে, ব্যাঙ্ক আর বাণিজ্য যে-নবাগতদের এ অঞ্চলে

টেনে আনছিল, তাদের অধিকাংশই ইংরেজী-ভাষী বৃটিশ। এই নবাগতদের বোয়াররা বলত 'বহিরাগত ভিন্‌দেশী' [Uitlanders]। ট্রান্সভালের বোয়াররা এদের মোটেই বরদাস্ত করতে পারছিল না। এইরকম ভিন্‌দেশীদের উৎপাতেই তারা বছর-চল্লিশেক আগে কেপ কলোনী ছেড়ে চলে এসে অনেক দুঃখকষ্ট করে নিজেদের রাজ্য গড়েছিল ; এখন আবার ভিনদেশীরা এখানেও ধাওয়া করে আসছে। ট্রান্সভালের সীমান্তে এরা ভীড় করছে, ট্রান্সভালের ভেতরেও এদের ভীড় বাড়ছে ; এরা আফ্রিকানদের নগদ মজুরী দিয়ে খাটাচ্ছে, উপজাতিগুলোর সঙ্গে বোয়ারদের বোঝাপড়া উল্টেপাল্টে দিচ্ছে ; এদের সঙ্গে আসছে ছুরিছোরা, বন্দুকপিস্তল, মদ, বেশ্যা ; বোয়ার-পল্লীর গম্ভীর গ্রাম্য-বাদশাহী চাল এরা নষ্ট করে দিচ্ছে— বোয়ারদের চোখে ব্যাপারটা খুবই খারাপ ঠেকছিল।

এই নবাগতরাও বোয়ারদের চালচলন পছন্দ করছিল না। বিশেষতঃ বোয়ারদের মধ্যযুগীয় জমিদারী অধিকার এরা মানতে পারছিল না। বোয়ারদের অধিকারের কোন সীমানা-সরহদ্দ আছে বলে বোয়াররা মনে করত না ; নবাগতরা মনে করত সেটা থাকা উচিত, নতুবা তারা জমি জায়গা পায় না, খাটুনি খাটার জন্য কালো মানুষও পায় না। বোয়াররা ক্রীতদাস-প্রথা চালাচ্ছে, বা যেভাবে দেশী মানুষদের খাটাচ্ছে তা ক্রীতদাস ব্যবস্থারই সামিল—এ অভিযোগ বৃটিশ মিশনারীরা করতেন ; বৃটিশ ব্যবসাদার ও খনিমালিকরাও অভিযোগটা তুলল। এরা চাইছিল ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার নগদ-মজুরী প্রথা,— যাতে শ্রমিককে কিছু নগদ পয়সা দিয়েই মালিক খালাস। তাছাড়া সমস্ত শ্রমিকই যদি বাঁধা গোলাম হয়ে থাকে, এবং তাদের সন্তান-সন্ততিও যদি বাঁধা থাকে, তাহলে নতুন নতুন খনিতে, কলকারখানায়, রেলওয়েতে, বন্দরে, হোটেলে, দোকানে খাটবার কুলীমজুর কোথা থেকে আসবে ? শ্রমিকদের যেরকম অবাধ ও অবিরাম সরবরাহ এবং নতুন জায়গায় খাটবার জন্য মজুত বেকার-বাহিনী ধনতান্ত্রিক

ব্যবস্থার প্রয়োজন, বোয়ার-তন্ত্রে তার রাস্তা ছিল না। নবাগতরা ট্রান্সভাল ও সব বোয়ার-এলাকাগুলো বৃটিশ দখলে নিয়ে নেওয়ার দাবী করছিল।

কেপ কলোনী থেকে উত্তরে যাবার পক্ষে খানিকটা নিরাপদ রাস্তা 'মিশনারী রোড'-এর কতক অংশের ওপর ট্রান্সভাল সরকার নিজেদের স্বত্ব-স্বামিত্ব জাহির করে কেপ কলোনীতে নবাগত ভাগ্যান্বেষীদের আরো চক্ষুশূল হয়ে উঠেছিল।

॥ দুই ॥

ট্রান্সভাল সরকারের আর্থিক অবস্থা এসময়ে বেশ খারাপ। বাণিজ্য-শুল্ক ছাড়া অন্য কোনরকম ট্যাক্স দিতে বোয়ারদের আপত্তি ছিল, অথচ সরকার চালাতে হবে এবং আদিবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধও চালাতে হবে। ১৮৬৯ সাল নাগাদ ট্রান্সভাল সরকারের ৭৪০০০ পাউণ্ড মূল্যের টাকার নোটের বাজারে দাম হয়েছিল, ১৮৫০০ পাউণ্ড; শতকরা ৭৫ ভাগ বাট্টা ছেড়ে দিতে হত। ট্রান্সভালের প্রেসিডেণ্ট সরকারী তহবিলের জন্য ৩০০ পাউণ্ড ঋণ জোগাড় করতে পারেননি। লেইডেনবার্গ অঞ্চলে সোনার সন্ধানের খবর শুনিয়ে ১৮৭২ সালে প্রেসিডেণ্ট বার্গার অবশ্য কেপ কমার্শিয়াল ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ৬৬০০০ পাউণ্ড ঋণ জোগাড় করেছিলেন খুব চড়া সুদে। ১৮৭৫ সালে বার্গার ইউরোপে গিয়ে হল্যাণ্ডের কাছ থেকে আরো চড়া সুদে অনেক টাকা ঋণ করলেন। সে সময়ে তিনি পর্তুগাল, জার্মানী ও বেলজিয়ামের সঙ্গেও কথাবার্তা চালাচ্ছিলেন—যাতে এই রাষ্ট্রগুলো একটা জোট বেঁধে ট্রান্সভালকে সাহায্য করে।[৩]

১৮৭৫ সালের শেষে বার্গার দেশে ফেরার পর নতুন সমস্যা দেখা দিল। ট্রান্সভালের উত্তরপূর্ব সীমান্ত এলাকায় এবং লেইডেনবার্গ অঞ্চলে 'বাপেদি' জাতির প্রধান সেকুকুনি তাঁর এলাকায় খনি-সন্ধানীদের প্রবেশ নিষেধ করে দিলেন এবং ট্রান্সভাল সরকারকে কর

দিতে অস্বীকার করলেন। প্রেসিডেন্ট বার্গার সৈন্যসামন্ত পাঠিয়ে সুবিধা করতে পারলেন না। যুদ্ধের খরচ চালাবার জন্য ট্যাক্স বসানো হল বটে, কিন্তু আদায় হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। কেপ কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক ঋণ শোধের জন্য চাপ দিতে থাকল। সরকারের পোস্টমাস্টার জেনারেলকে সে সময় ডাকটিকিট দিয়ে বেতন দেওয়া হয়েছিল, সার্ভেয়ার-জেনারেলকে বেতন দেওয়া হয়েছিল জমি দিয়ে, সৈন্যদের লুটের ভাগ দিয়ে।[৪]

বৃটিশ সরকারী মহলে খবর পৌঁছল যে সেকুকুনি গোপনে জুলুদের সঙ্গে কথাবার্তা চালাচ্ছেন, দক্ষিণ আফ্রিকার এই অঞ্চলটায় আফ্রিকান জাতিগুলির ঐক্যবদ্ধ অভ্যুত্থান আসন্ন, এবং ট্রান্সভাল সরকার শ্বেতকায়দের রক্ষা করতে অক্ষম। বৃটিশ সরকার এমন গুজবও শুনেছিলেন যে বোয়াররা বিভিন্ন জায়গায় সভা করে প্রস্তাব পাস করেছে, বৃটিশ সরকার ট্রান্সভাল দখল করুক।

অতএব, সবদিক বিবেচনা করে, বৃটিশ সরকার ১৮৭৭ সালে ট্রান্সভাল দখল করলেন। ১৮৭৬ সালে বৃটিশ পার্লামেণ্টে গৃহীত আইন অনুসারে ১৮৭৭ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতবর্ষের সম্রাজ্ঞী হয়েছিলেন। ১৮৭৭ সালের ১২ই এপ্রিল তারিখে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার জন্মদিনে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী ডিস্‌রেলি মহারাণীকে জন্মদিনের উপহার দিলেন আরেকটি রাজ্য— ট্রান্সভালের রাজধানী প্রিটোরিয়া শহরে বোয়ার-সাধারণতন্ত্রের পতাকা নামিয়ে দিয়ে বৃটিশ পতাকা 'ইউনিয়ন জ্যাক' উত্তোলন করা হল। যুদ্ধ করার প্রয়োজন হয়নি, বোয়ারদের বাধা দেবার ক্ষমতা ছিল না। বৃটিশ প্রতিনিধি শেপ্‌স্টোন প্রিটোরিয়ায় গিয়েছিলেন অল্প কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে, কিন্তু সীমান্তে আয়োজন ছিল ভালোরকম। সেখানে বৃটিশ সৈন্যবাহিনী দাঁড়িয়েছিল ; সেই সঙ্গে বোয়ারদের বিরুদ্ধে বৃটিশের মিত্র জুলু-রাজ সেচওয়াইও'র সেনা-বাহিনীকেও সেখানে মোতায়েন রাখা হয়েছিল ; এবং খুবই বিবেচনার

লক্ষণ,—বোয়ারদের অনেকের উত্তমর্ণ স্ট্যাণ্ডার্ড ব্যাঙ্কের একজন প্রতিনিধিও উপস্থিত ছিলেন।[৫]

ঋণগ্রস্ত, যুদ্ধক্লান্ত, আত্মকলহজর্জরিত বোয়াররা বৃটিশ শাসনকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে স্বাগত জানাবে, বৃটিশ মহলে সেইরকম একটা ধারণা হয়েছিল। তাছাড়া, তখন ট্রান্সভালে বাসিন্দা নবাগত বৃটিশদের সংখ্যাও কম নয়।

কিন্তু মহারাণী ভিক্টোরিয়া সেবার এই রাজ্য বেশিদিন ভোগ-দখল করতে পারেননি। ট্রান্সভাল দখল করার পর বৃটিশ শাসকদের মনে হল আফ্রিকান জাতিগুলোর বিরুদ্ধে বোয়ারদের যুদ্ধযাত্রার সপক্ষে অনেক ন্যায়সঙ্গত যুক্তি আছে। সেকুকুনি'র বিরুদ্ধে যুদ্ধের দায় বৃটিশ সরকার নিলেন। ওদিকে কেপ কলোনীর পূর্বপ্রান্তে খোশাজাতির বিরুদ্ধে 'নবম কাফির যুদ্ধ' চালানো হয়েছিল ১৮৭৭-৭৮ সালে। ১৮৭৯ সালে ট্রান্সভাল-সীমান্তে জুলুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু হল। ট্রান্সভাল বৃটিশ দখলে নেওয়ার সময় যে জুলুদের মিত্র হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছিল, দখল হয়ে যাবার পর সেই জুলুদের সামরিক শক্তি চিরকালের মতো ধ্বংস করে দেওয়া উচিত মনে হল। অজুহাতও অনেক পাওয়া গেল; জুলুরাজ সেচওয়াইও তাঁর জাতিকে কঠোরভাবে যোদ্ধাজাতি করে রেখেছিলেন, যুবকদের বিবাহ করতে দিতেন না, মেয়েদেরও সামরিক জীবন যাপন করতে বাধ্য করতেন, নির্দয় অত্যাচার করে নিজের স্বৈরশাসন বহাল রেখেছিলেন, ইত্যাদি অনেক কথাই ছিল। এ কথাগুলো হয়তো সবই সত্য। একথাও সত্য যে বৃটিশ সরকারের প্রতিনিধিরা জুলুরাজকে তাঁর শাসনপদ্ধতি সংস্কার করতে বলেছিল। কিন্তু একথাও সত্য যে সেইসঙ্গে তাঁর বন্দুক ও অন্য অস্ত্রশস্ত্র সমর্পণ করে গোটা জাতিকে নিরস্ত্র করে দিতে বলা হয়েছিল। সেচওয়াইও কোনটাই মানেননি।

১৮৭৯ সালের জানুয়ারী মাসে ৬০০০ বৃটিশ সৈন্য, ১২০০০ দেশীয় সহযোগী সেনা এবং ২০টি গ্যাট্‌লিং কামান নিয়ে জুলুদের ওপর

আক্রমণ শুরু হল। পরপর কয়েকটা খণ্ডযুদ্ধে জুলুরা জয়লাভ করল, তাদের অতর্কিত আক্রমণে বিধ্বস্ত বৃটিশ বাহিনী পিছু হঠে পালিয়ে এল। তিন মাস পরে বৃটিশ বাহিনী আবার এগোল—দ্রুতগতিতে জুলু রাজধানীতে পৌঁছে কামান চালিয়ে জুলু বাহিনীর শ্রেষ্ঠ অংশকে ধ্বংস করল। গ্যাট্‌লিং কামান খুব কাজ করেছিল।

এইসব যুদ্ধ চালাতে গিয়ে বৃটিশ-সরকারের সৈন্যক্ষয় সামান্যই হয়েছিল। কিন্তু অর্থব্যয় হচ্ছিল প্রচুর। ১৮৭৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসের ৩০শে তারিখ পর্যন্ত অর্থব্যয়ের একটা হিসেব পাওয়া যায়—জুলু-যুদ্ধে ৫১ লক্ষ ৩৭ হাজার ৮৭৮ পাউণ্ড, 'নবম কাফির' যুদ্ধে ৫ লক্ষ ৪৩ হাজার ৪৬৫ পাউণ্ড, সেকুকুনি'র বিরুদ্ধে যুদ্ধে ৩ লক্ষ ৮০ হাজার পাউণ্ড, এবং পশ্চিম গ্রিকোয়াল্যাণ্ডে বিদ্রোহ দমনে ২ লক্ষ ২২ হাজার পাউণ্ড।[৬] আজকের দিনের অর্থনীতিক অঙ্কে এ টাকা খুব বেশি না হলেও, তখনকার দিনে বৃটিশ পার্লামেণ্টের হিসেবে এই ব্যয়ভার আতঙ্কজনক। নবম কাফির যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত কেপ কলোনীর বৃটিশ সরকারের হিসেবে খরচের অঙ্ক দাঁড়িয়েছিল ১৭ লক্ষ ৫০ হাজার পাউণ্ড।[৭] বৃটিশ পার্লামেণ্ট বেশ ঘাবড়ে গিয়েছিল।

১৮৮০ সালের মে মাসে বৃটেনে ডিসরেলী'র জায়গায় প্রধানমন্ত্রী হলেন গ্ল্যাডস্টোন। ডিসরেলীর প্রধানমন্ত্রিত্বকালে বিরোধী পক্ষের নেতা গ্ল্যাডস্টোন ট্রান্সভাল-দখলের বিরোধিতা করেছিলেন। সরকারী ব্যয়সঙ্কোচ করার জন্যও তিনি ও তাঁর সহযোগীরা তুমুল প্রচার করেছিলেন।

সুযোগ বুঝে ট্রান্সভালের বোয়াররা ১৮৮০ সালের ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে বৃটিশ-শাসনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করল। অরেঞ্জ ফ্রি স্টেটের বোয়াররা তো বটেই, বৃটিশ খাসতালুক কেপ কলোনীতে ও নাটালে যে বোয়াররা এতদিন বৃটিশ শাসন মেনে চলছিল, তারা প্রায় সবাই ট্রান্সভালের বোয়ারদের পক্ষে সক্রিয় সহানুভূতি প্রদর্শন করতে

লাগল। বৃটিশ বাসিন্দা-মহলেও তখন আফ্রিকান জাতিগুলির বিরুদ্ধে আতঙ্কমিশ্রিত শত্রুতা, এবং তার ফলে বোয়ারদের সঙ্গে মৈত্রীর বাসনা প্রবল। কৃষ্ণকায় মানুষগুলোর চোখের সামনে শ্বেতাঙ্গ বৃটিশ শ্বেতাঙ্গ বোয়ারকে মারবে, তার জন্য আবার কৃষ্ণকায় সৈন্য লাগানো হবে, শ্বেতকায় জাতির মানমর্যাদা ও কৃষ্ণকায়দের ওপর প্রভাব-প্রতিপত্তি বিনষ্ট হয়ে যাবে—এসব ভাবনায় তারা বেশ ভাবিত হয়ে উঠেছিল।

ট্রান্সভালের বোয়ারদের বিরুদ্ধে বৃটিশ সরকার সেবার যুদ্ধ করেছিল নামমাত্র। যুদ্ধ কয়েক মাসেই শেষ, তার মধ্যেই বৃটিশ বাহিনী একাধিকবার পরাজিত। ১৮৮১ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারী মাজুবা পাহাড়ের যুদ্ধে বৃটিশ বাহিনীর পরাজয়ের পর যুদ্ধ শেষ। এ যুদ্ধে গ্যাট্‌লিং কামান আসেনি।

১৮৮১ সালের মার্চ মাসে যুদ্ধবিরতি হল, অগস্ট মাসে চুক্তি হল—কয়েকটি শর্তাধীনে বৃটেন ট্রান্সভালের বোয়ারদের "স্বাধীনতা" মেনে নিল। শর্ত হল, ট্রান্সভাল বৃটিশ ছত্রচ্ছায়ায় স্বাধীন রাষ্ট্র—অন্য কোন রাষ্ট্রের সঙ্গে তার সম্পর্ক বৃটিশ অনুমতিসাপেক্ষ। ট্রান্সভালে পুরনো বাসিন্দা শ্বেতাঙ্গ আর নবাগত শ্বেতাঙ্গের মধ্যে আইনগত ভেদাভেদ করা হবে না, ক্রীতদাস প্রথা থাকবে না, ইত্যাদি শর্তও রইল। কিন্তু নবাগত শ্বেতাঙ্গদের ভোটের কথাটা বৃটিশ তরফে অনবধানতাবশতঃ বাদ পড়ে গেল, সে সম্বন্ধে কোন শর্ত রইল না।

এ পর্যন্ত ট্রান্সভালে নবাগত শ্বেতাঙ্গরা এক বৎসর বসবাস করার পরেই ভোটার তালিকাভুক্ত হতে পারত। ১৮৮২ সালে ট্রান্সভাল সরকার আইন বদলে দিল। নতুন আইন হল, পাঁচ বৎসর বসবাস করার পরে ভোটার-তালিকাভুক্ত হবার অধিকার হবে, তার আগে নয়। এ ব্যাপারটা তখন খুব গুরুতর হয়ে ওঠেনি, কারণ নবাগতদের মধ্যে খুব কম লোকই ভোট নিয়ে মাথা ঘামাত। কিন্তু ওলন্দাজ ভাষা সরকারী ভাষা—তা নিয়ে ইংরেজীভাষী নবাগতদের আপত্তি ছিল, ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখার অসুবিধা নিয়ে বিক্ষোভ ছিল।

আরো গুরুতর বিক্ষোভ দানা বাঁধছিল বাণিজ্য-শুল্ক নিয়ে এবং খনির জন্য দরকারী ডিনামাইটের ব্যবসা নিয়ে। এইসব বিষয় নিয়ে বৃটিশ আর বোয়ারের মধ্যে অনেক আলোচনা বৈঠক ও তর্কবিতর্ক চলল ১৮৮৬ সাল পর্যন্ত। ১৮৮৬ সালে এল আরেক বিশাল আবর্ত, ট্রান্সভালের প্রায় মধ্য-অঞ্চলে ভিট্‌ভাটার্সরান্‌ড্* এলাকায় আবিষ্কৃত হল পৃথিবীর বৃহত্তম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ সোনার খনি। এ যেন এক অফুরন্ত সোনার ভাণ্ডার পাওয়া গেল।

এইবারে ভাগ্যান্বেষী নবাগত শ্বেতাঙ্গদের যে বিশাল জোয়ার ছুটে এল, ট্রান্সভাল তার ধাক্কায় টলমল করতে থাকল। নতুন সোনার খনি ট্রান্সভাল সরকারের আর্থিক দুর্দশা ঘুচিয়ে ধনী করে তুলল—১৮৮৩ সাল থেকে ১৮৯৩ সালের মধ্যে ট্রান্সভাল সরকারের আয় প্রায় বিশগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল।[৮] কিন্তু সেই সঙ্গে ট্রান্সভালে নবাগতদের সংখ্যাও হুড়হুড় করে বাড়তে থাকল। ১৮৭৩ সালে ট্রান্সভালে শ্বেতাঙ্গ বাসিন্দার সংখ্যা ছিল ৪০০০০; ১৮৯২ সাল নাগাদ এই সংখ্যা দাঁড়াল ১ লক্ষ ১৯ হাজার।[৯] ১৮৯৫ সাল নাগাদ ট্রান্সভালে শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে নবাগতের সংখ্যা শতকরা ৭০ জনের বেশি হয়ে উঠেছিল।[১০] আতঙ্কিত ট্রান্সভাল সরকার ১৮৯০ সালেই নবাগতদের ভোট দারুণভাবে কমিয়ে দিয়েছিল। খনি-এলাকার জন্য একটা নতুন আলাদা পরিষদ করা হয়েছিল সেখানকার স্থানীয় ব্যাপারের জন্য; সেই পরিষদের নির্বাচনে পুরনো ব্যবস্থাই মোটামুটি চালু রেখে আসল ক্ষমতা যে পরিষদের সেখানে নতুন আইন জারী করা হল—ট্রান্সভালে একটানা ১৪ বছর বসবাস করার আগে এই পরিষদের ভোটার তালিকাভুক্ত হওয়ার অধিকার হবে না।[১১] বৃটিশ-বোয়ার যুদ্ধের আবার একটা উপলক্ষ সৃষ্টি হল।

ভিট্‌ভাটার্সরান্‌ডে সোনার খনি আবিষ্কার হবার আগেই আর একটি বৃহৎ ব্যাপার শুরু হয়ে গিয়েছিল গোটা আফ্রিকা জুড়ে।

*Witwatersrand, 'white waters ridge' = সাদা জলের শৈলশ্রেণী।

১৮৭৫-৭৬ সালেই ইউরোপের রাষ্ট্রগুলো আফ্রিকা-দখলের দৌড়বাজি শুরু করে দিয়েছিল। মধ্য-আফ্রিকার গভীরে কঙ্গো নদী ও জাম্বেসি নদীর উপত্যকা অঞ্চলে লিভিংস্টোন ও স্ট্যানলীর ভ্রমণবৃত্তান্ত শোনার পর এদিকে অনেক শকুনের নজর পড়েছিল।

১৮৭৬ সালে বেলজিয়ামের রাজা লিওপোল্ড কঙ্গো গ্রাস করার উদ্দেশ্যে এক আন্তর্জাতিক কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮৭৮ সালে বার্লিনে ইউরোপের বৃহৎ শক্তি সম্মেলনে জার্মানীর বিস্‌মার্ক ও বৃটেনের ডিসরেলী উভয়েই ইউরোপীয়দের নিজেদের মধ্যে যুদ্ধবিবাদ না করে আফ্রিকা-গ্রাসে মনোযোগী হতে পরামর্শ দেন। ১৮৮২ সাল নাগাদ আফ্রিকায় বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মানী, ইটালী, পর্তুগাল, স্পেন যে যা পারে তাড়াতাড়ি দখল করে নেবার জন্য উর্ধ্বশ্বাস দৌড়বাজি করছিল। সোনার লোভে যেমন দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তি ও কোম্পানীগুলোর ঠেলাঠেলি-কামড়াকামড়ি চলছিল, সাম্রাজ্যের লোভে গোটা আফ্রিকা জুড়ে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলোর সেরকম ঠেলাঠেলি-কামড়াকামড়ি চলছিল।

এই পরিস্থিতিতে বৃটিশ-বোয়ার সম্পর্কে আরেকটা মোচড় লেগে নতুন যুদ্ধের ক্ষেত্র তৈরী হচ্ছিল। এ যুদ্ধ কিন্তু নতুন ধরনের, এর আন্তর্জাতিক পটভূমিকা বিশ্বব্যাপী। অতএব, দক্ষিণ আফ্রিকা প্রসঙ্গ একটু মুলতুবী রেখে ১৮৮০-১৯০০ সালের আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির দিকে আমাদের চোখ ফেরাতে হবে।

চতুর্থ অধ্যায়

বিশ্ব-সংঘাত

॥ এক ॥

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় অর্ধ এবং বিশেষ করে শেষ পঁচিশটা বছর সারা দুনিয়ার পাশ্চাত্ত্য সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলোর দখল-অভিযান ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন করার কাল। ইউরোপ থেকে এ অভিযান শুরু হয়েছিল অনেক আগে—ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম থেকেই স্পেন, পর্তুগাল, বৃটেন, হল্যাণ্ড এবং কিছু পরে ফ্রান্স এশিয়া-আফ্রিকা-আমেরিকায় উপনিবেশ ও রাজত্ব বিস্তার করছিল। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় অর্ধে এ অভিযান অত্যন্ত বেগবান ও ব্যাপক হয়ে ওঠে, ১৯০০ সাল নাগাদ গোটা দুনিয়ার ভাগ-বাঁটোয়ারা সম্পন্ন হয়ে যায়।

সাম্রাজ্যবাদের প্রকৃতিও এ সময়ে বদলে গিয়েছিল। সাম্রাজ্য এবং সাম্রাজ্যবাদ প্রাচীনকালেও ছিল, মধ্যযুগেও ছিল। সামন্ত-তান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সওদাগরী সাম্রাজ্যবাদ এসে মিশল মধ্যযুগের শেষে। ধনতন্ত্রের চূড়ান্ত রূপ যে আধুনিক সাম্রাজ্যবাদ—উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সেই আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের আকৃতি-প্রকৃতিই প্রধান হয়ে উঠেছিল। এ সাম্রাজ্যবাদের মূল চালকশক্তি আধুনিক যন্ত্রশিল্প। আধুনিক যন্ত্রশিল্পে উৎপাদনের পরিমাণ বিপুল। সেই বিপুলপরিমাণ উৎপন্ন-সামগ্রীর জন্য রপ্তানী-বাজার জোগাড় করার তাগিদ একটা বড় তাগিদ; আবার, এই উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচা মাল সস্তায় জোগাড় করতে হবে, সে তাগিদও কম নয়। কাঁচা মালের উৎস এবং তৈরী মালের বাজার হিসাবে এক-একটা দেশে নিজেদের একচেটিয়া ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা করা; পরবর্তী ধাপে ওসব দেশে সস্তা মজুর ও সস্তা কাঁচা মালের সুযোগে অতি-মুনাফার সন্ধানে মূলধন লগ্নী করা—আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের প্রধান

ঝোক এই দিকে। তার সঙ্গে আসে প্রতিদ্বন্দ্বিতার অনিবার্য ঝোঁক—প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যবসাদার অপর কোন রাষ্ট্র যাতে সুবিধা পেয়ে না যায়, কোন অঞ্চলে অন্য কেউ ঢুকবার আগে নিজেরাই যাতে ঢুকে পড়া যায়, সেসব দেখতে হয়। দখল-করা সাম্রাজ্যকে রক্ষা করার জন্য আরো জায়গা দখল করতে হয়, সে জায়গায় ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা না থাকলেও, আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করেও অনেক সময় সাম্রাজ্য বিস্তার করতে হয়। কখনো কখনো বাণিজ্যিক অর্থনীতিক হিসেবের চেয়ে সামরিক-কূটনীতিক হিসেব বেশি প্রাধান্য পায়। কখনো কখনো সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের শাসকশ্রেণীর ভেতরকার রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব দিয়ে বৈদেশিক নীতি নির্ধারিত হয়ে যায়—রাজা বা মন্ত্রীর বিশিষ্ট ব্যক্তিগত ঝোঁক সাম্রাজ্য-দখল বা বেহাতের উপলক্ষ হয়ে ওঠে। কখনো পুরনো সামন্ততান্ত্রিক যুগের অভ্যস্ত চিন্তা ও আচরণ প্রবল হয়ে ওঠে, কখনো বা তথাকথিত 'জাতীয় মর্যাদার প্রশ্ন' প্রধান হয়ে ওঠে। ধর্ম নিয়ে বিবাদ-বিসংবাদও কোথাও সাম্রাজ্য দখলের সূচনা করে, সভ্যতা বিস্তারের বাসনা বা মধ্যযুগীয় নৃশংস স্বৈরাচার ঘোচাবার উচ্চাভিলাষও কখনো সামনে বড় হয়ে ওঠে।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সাম্রাজ্যবাদের বিশ্ব-অভিযানের পেছনে প্রত্যক্ষ কারণ বা উদ্দেশ্য হিসাবে এ ধরনের নানারকম ব্যাপার ছিল। যেসব ব্যক্তিরা সাম্রাজ্য বিস্তার করছিলেন, বা একে অন্যের সাম্রাজ্য দখল-বেদখল করছিলেন, তাঁরা প্রত্যেকেই ব্যবসায়ে মুনাফার হিসেব করে কর্তব্য ঠিক করছিলেন বললে ভুল বলা হবে। তাঁদের মনোজগতে নানারকম অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্য কাজ করছিল। কিন্তু তাঁদের সমস্ত কাজকর্ম এবং সাম্রাজ্য-বিস্তার অভিযানের সামগ্রিক কাঠামোটা নির্ধারিত হচ্ছিল আধুনিক ধনতান্ত্রিক শিল্পের তাগিদ দিয়ে। এই আধুনিক যন্ত্রশিল্পই আবার সাম্রাজ্যবাদের এই অভিযানে বিপুল বেগ সঞ্চার করেছিল। রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, স্টীমশিপ্ দেশ-দেশান্তরে যাতায়াত ও সংবাদ আদানপ্রদানকে খুব

দ্রুত করে তুলেছিল—এক দেশ থেকে আরেক দেশে সৈন্যবাহিনীর দ্রুত চলাচলও সম্ভব করে তুলেছিল। আরেকদিকে আবার আধুনিক যন্ত্রবিজ্ঞান নতুন নতুন মারণাস্ত্র এবং বিধ্বংসী অস্ত্রও তৈরী করে দিচ্ছিল। রাইফেল, মেশিন-গান, নতুন ধরনের কার্তুজ ও গোলা-বারুদ, ডিনামাইট, যন্ত্রশক্তিচালিত কামান প্রভৃতি অস্ত্রে সজ্জিত আধুনিক সৈন্যবাহিনীর সামনে পুরনো জাতি ও দেশগুলো আর দাঁড়াতেই পারছিল না। এ যুগ রেলওয়ে-টেলিগ্রাফ-স্টীমশিপের যুগ, 'গানবোট'-'ম্যাক্সিম্‌গান্'-এরও যুগ। এসব মারণাস্ত্রের মুখে এশিয়ার প্রাচীন সভ্য দেশগুলো চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যাচ্ছিল, আফ্রিকার ও লাটিন আমেরিকার বিভিন্ন দেশে বীর্যবান আদিবাসী জাতির মানুষেরা অসহায় জন্তুজানোয়ারের মত পালে পালে প্রাণ দিচ্ছিল।

।। দুই ।।

এসময়কার প্রধান সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রশক্তি গ্রেট বৃটেন। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে গোটা ভারত-সাম্রাজ্য তার দখলে। ১৮৫৭ সালের ভারতে সিপাহী-বিদ্রোহ দমন করে ভারতের বিস্তৃত এলাকা জুড়ে নৃশংস হত্যাকাণ্ড ও বীভৎস সন্ত্রাস চালিয়ে বৃটিশ সরকার বেশ কিছুকালের জন্য ভারতবাসীকে সম্পূর্ণ পদানত নিরুদ্যম বৃটিশ-অনুচরে পরিণত করেছিল। অধিকৃত ভারত-সাম্রাজ্য বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিপুল শক্তির উৎসও হয়ে উঠেছিল। এখান থেকে শোষিত ও লুণ্ঠিত অর্থবল এবং এখান থেকে সংগৃহীত লোকবল দিয়ে এশিয়া-আফ্রিকায় আরো নতুন নতুন দেশ দখল করার কাজ সম্পন্ন করা হচ্ছিল। এ কর্মটা আগেই শুরু করা হয়েছিল—১৮৩৯ সালে এবং ১৮৫৬ সালে চীনে বৃটিশ যুদ্ধাভিযানে ভারতীয় সৈন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ১৮৫৬ সালে পারস্যে, ১৮৫৯ সালে আবার চীনে, ১৮৬৭ সালে আফ্রিকার ইথিওপিয়ায় ও মালয় দেশের সিঙ্গাপুরে, ১৮৭৮ সালে আফগানিস্তানে, ১৮৮২ সালে মিশরে, ১৮৮৫ সালে ব্রহ্মদেশে, ১৮৯৩

আফ্রিকায় ইউরোপের আগ্রাসী অভিযান
১৮৭৯—১৯১৪
০ ৮০০ ১৬০০
কিলোমিটার
আফ্রিকা
১৯১৪
পোর্তুগীজ
বৃটিশ
বৃটিশ-দখল
ফরাসী
বেলজিয়ান
জার্মান
স্প্যানিশ
ইটালিয়ান
আটলান্টিক মহাসাগর
ভারত মহাসাগর
ফরাসী পশ্চিম আফ্রিকা
ইঙ্গ মিশরীয় সুদান
ইথিওপিয়া
বৃটিশ পূর্ব আফ্রিকা
বেলজিয়ান কঙ্গো
জার্মান পূর্ব আফ্রিকা
আঙ্গোলা
দঃপঃ আফ্রিকা
উঃ রোডেশিয়া
বেচুয়ানাল্যাণ্ড
দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন
মাদাগাস্কার
লাইবেরিয়া
নাইজিরিয়া
২৩°পূঃ
০°

সালে আফ্রিকার নিয়াসাল্যাণ্ডে, ১৮৯৬ সালে আফ্রিকার সুদানে এবং উগাণ্ডায়—বৃটিশ-সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য ভারতীয় সৈন্য নিয়োগের বহু ঘটনার মধ্যে এগুলো কয়েকটা দৃষ্টান্ত। ১৮৮০ সালে ভারতীয় সৈন্য বাহিনীতে বৃটিশ সৈন্য ছিল ৬৬ হাজার, ভারতীয় সৈন্য ১ লক্ষ ৩০ হাজার ; তাছাড়া ভারতের দেশীয় রাজন্যবর্গের বেতনভোগী সৈন্য এবং সামন্ততান্ত্রিক-দায়বদ্ধ হুকুমে-হাজির সৈন্য ছিল প্রায় ৩ লক্ষ ৫০ হাজার, বৃটিশ রাজরাজেশ্বরের প্রয়োজনে এই সৈন্যদেরও পাওয়া যেত। ভারতবাসীর খরচায় এই বিশাল সৈন্যবাহিনী পোষা হত ; ভারতবর্ষকে বৃটিশ দখলে রাখার জন্য এবং অন্যান্য দেশকে বৃটিশ দখলে আনার জন্য এদের নিয়োগ করা হত—বৃটিশ করদাতাদের ওপর এজন্য কোন চাপ পড়ত না।[১]

বৃটেনের পরে এসময়ের ইউরোপে বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রশক্তি ফ্রান্স, রাশিয়া, জার্মানী এবং অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী। ইউরোপে ইটালী এবং এশিয়ায় জাপান এসময়ে উদীয়মান রাষ্ট্রশক্তি। পৃথিবীর আরেক গোলার্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এসময়ে অধিপতি—তার সুদীর্ঘ বাহু প্রশান্ত মহাসাগর পার হয়ে পূর্ব-গোলার্ধে চীন পর্যন্ত প্রসারিত।

পুরনো সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে স্পেন, পর্তুগাল ও হল্যাণ্ড এসময়ে পেছিয়ে পড়েছিল। সামন্ততান্ত্রিক-সওদাগরী সাম্রাজ্যবাদের স্তর পেরিয়ে এরা আধুনিক ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদের স্তর আয়ত্ত করার আগেই প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিগুলো এদের সঙ্কুচিত করে দিল।

স্পেনের প্রধান সাম্রাজ্য ছিল দক্ষিণ আমেরিকায়, কিউবায়, এবং প্রশান্ত মহাসাগরের ফিলিপাইন ও অন্যান্য দ্বীপে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ সেসব জায়গা থেকে স্পেনকে হঠিয়ে দিয়েছিল।

পর্তুগাল আফ্রিকার অনেকখানি জায়গা প্রথম চোটে দখল করে বসেছিল—পূর্ব-উপকূলে মোসাম্বিক এবং পশ্চিম-উপকূলে আঙ্গোলা তার মধ্যে প্রধান। এই দুই দেশের মধ্যবর্তী ভূভাগ (বর্তমান কালের

উত্তাল-

জাম্বিয়া ও রোডেশিয়া) দখল করে পূর্ব-পশ্চিম বরাবর এক অখণ্ড পর্তুগীজ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য পর্তুগাল উসখুস করেছিল, কিন্তু ১৮৯০ সালে এক চরমপত্র দিয়ে এবং মোসাম্বিকের দেলাগোয়া উপসাগরে 'গান-বোট' পাঠিয়ে বৃটেন আফ্রিকায় পর্তুগালের সাম্রাজ্য-বৃদ্ধির অভিলাষ শেষ করে দেয়। পর্তুগালের ভারতে গোয়া-দমন-দিউ এবং চীনে মাকাও বন্দর নিয়েই খুশী থাকতে হয়। দক্ষিণ আমেরিকাতে ব্রাজিল এককালে পর্তুগালের সাম্রাজ্য ছিল, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকেই (১৮২২ সালে) সে সাম্রাজ্য পর্তুগালের হস্তচ্যুত হয়ে গিয়েছিল।

সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে পর্তুগালকে সবচেয়ে বেশি আঘাত করেছিল হল্যাণ্ড। সে সময়ে দূরপ্রাচ্যে হল্যাণ্ড পর্তুগালের সাম্রাজ্য বেদখল করে নিয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে হল্যাণ্ড কিন্তু সাম্রাজ্য বৃদ্ধি করতে পারেনি—ইন্দোনেশিয়া, দক্ষিণ আমেরিকার উত্তর প্রান্তে ডাচ্ গায়না, আর কয়েকটা দ্বীপ নিয়েই হল্যাণ্ডকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছিল।

তুরস্কের প্রাচীন অটোমান সাম্রাজ্যের এসময়ে ভগ্নদশা। আফ্রিকার উত্তর উপকূলে মিশর থেকে মরক্কো পর্যন্ত বিস্তৃত তুরস্কের সাম্রাজ্য কাড়াকাড়ি করে নিজেদের দখলে নেওয়ার জন্য এসময়ে বৃটেন, ফ্রান্স ও স্পেনের মধ্যে দর-কষাকষি ও ঠেলাঠেলি চলছে। তেমনি আবার পূর্ব-ইউরোপে তুরস্কের অধীন বলকান-অঞ্চল, কন্‌স্তান্তিনোপল্ বন্দর এবং গ্রীসের কিছু অঞ্চল দখল করে নেওয়ার জন্য ঠেলাঠেলি চলছে রাশিয়া, অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী এবং বৃটেনের মধ্যে।

॥ তিন ॥

১৮৭৫-৭৬ সাল থেকে ধনতান্ত্রিক শিল্পবাণিজ্যে এবং যুদ্ধবিজ্ঞানে অগ্রসর রাষ্ট্রগুলোর সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য প্রবল তাগিদ শুরু হয় এবং ১৯০০ সাল নাগাদ এশিয়া, আফ্রিকা, লাটিন আমেরিকা,

এবং মহাসাগরীয় অঞ্চলগুলোর ভাগবাঁটোয়ারা সম্পন্ন হয়ে যায়। ১৯০০ সাল নাগাদ আফ্রিকায় একমাত্র স্বাধীন দেশ রইল ইথিওপিয়া, সে-ও কার্যতঃ বৃটেন ও ফ্রান্সের শরণাপন্ন ও রক্ষণাধীন। এশিয়ায় চীন নামে স্বাধীন, তার সমস্ত উপকূল বরাবর এবং বৃহৎ নদীপথের তীরবর্তী অঞ্চল বরাবর ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং জাপান যথেচ্ছাচার চালাচ্ছে; উত্তর-সীমান্ত বরাবর রুশ জারশাহী সাম্রাজ্যবাদ সর্বেসর্বা হবার চেষ্টা-চক্রান্ত চালাচ্ছে; দক্ষিণ-সীমান্তে ইয়ুনান প্রদেশে ফ্রান্স ঢুকে পড়বার চেষ্টা করছে ইন্দোচীন থেকে, আর বৃটেন ঢুকে পড়বার চেষ্টা করছে ব্রহ্মদেশ থেকে। ঋণ-জর্জরিত স্থবির তুরস্ক আর কতদিন স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসাবে মানচিত্রে ঠাঁই পাবে, সে প্রশ্ন নিয়ে জল্পনা-কল্পনা চলছে। তুরস্ক, পারস্য, আফগানিস্তান নামে স্বাধীন হয়ে টিকে আছে, বৃহৎ সাম্রাজ্য-বাদী রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও পরস্পরকে বাধা দেওয়ার সুযোগ নিয়ে। দক্ষিণ আমেরিকা এবং প্রশান্ত মহাসাগরের অনেকখানি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এলাকা, সেখানে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলো বেশি কিছু করতে পারে না।

১৮৭৬-১৯০০ সালের পঁচিশ বছরে সাম্রাজ্যবাদের দখল বৃদ্ধির একটা ছবি পাওয়া যায় নীচের হিসেব থেকে ঃ—

মহাদেশ	মোট এলাকার শতকরা কত ভাগ ইউরোপীয় ও মার্কিন দখলে	
	১৮৭৬	১৯০০
আমেরিকা ...	২৭'৫	২৭'২
আফ্রিকা ...	১০'৮	৯০'৪
পলিনেশিয়া ...	৫৬'৮	৯৮'৯
এশিয়া ...	৫১'৫	৫৬'৬
অস্ট্রেলিয়া ...	১০০'০	১০০'০

এই হিসেব লেনিন উল্লেখ করেছিলেন সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে তাঁর ১৯১৭ সালের বিখ্যাত পুস্তিকায়।[২] এই হিসেবের মধ্যে দক্ষিণ আমেরিকা, পানামা, মেক্সিকোয় মার্কিন আধিপত্যের বিষয় ধরা হয়নি ; চীন, আফগানিস্তান, পারস্য, তুরস্ক প্রভৃতি দেশগুলোয় বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদের কার্যকরী দখলের হিসেবও এর মধ্যে ধরা হয়নি। এ শুধু সাম্রাজ্যবাদের খাস-তালুকের হিসেব। পলিনেশিয়া বলতে প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্বাঞ্চলের দ্বীপগুলোকে বোঝায়। আমেরিকায় সাম্রাজ্যবাদী দখল কিঞ্চিৎ হ্রাস দেখা যাচ্ছে কারণ প্রত্যক্ষ বৈদেশিক শাসনের এলাকা কমে গিয়ে সে জায়গায় মার্কিন আধিপত্যে নামে-স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। আফ্রিকায় বৈদেশিক দখল বৃদ্ধির পরিমাণটা এখানে সবচেয়ে লক্ষণীয়।

লেনিনের ওই পুস্তিকায় আরেকটি হিসেবও দেখা যায়—১৮৬০ সাল থেকে ১৮৯৯ সাল পর্যন্ত চল্লিশ বছরে বৃটেন, ফ্রান্স ও জার্মানী কর্তৃক সাম্রাজ্যবিস্তারের হিসেব[৩] :—

তিনটি বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রের দখলীকৃত সাম্রাজ্যের আয়তন ও জনসংখ্যা। আয়তন লক্ষ বর্গমাইলের হিসেবে, জনসংখ্যা লক্ষের হিসেবে।

	গ্রেট বৃটেন		ফ্রান্স		জার্মানী	
খ্রীস্টাব্দ	আয়তন	জনসংখ্যা	আয়তন	জনসংখ্যা	আয়তন	জনসংখ্যা
১৮৬০	২৫	১৪৫১	২	৩৪	—	—
১৮৮০	৭৭	২৬৭৯	৭	৭৫	—	—
১৮৯৯	৯৩	৩০৯০	৩৭	৫৬৪	১০	১৪৭

এই দ্বিতীয় হিসেবটা থেকে স্পষ্ট দেখা যায় যে ১৯০০ সাল নাগাদ সাম্রাজ্যবাদের দুনিয়া-বাঁটোয়ারা যখন সম্পন্ন হল, তখন জার্মানী সবেমাত্র সাম্রাজ্য গ্রাস শুরু করেছে। তার ক্ষুধা জাগ্রত হওয়ার

সঙ্গে সঙ্গেই ভোজ্যবণ্টন সমাধা হয়ে গেল, তাতে তার সন্তুষ্ট হবার কথা নয়। একই রকম অতৃপ্তি জাপানের, ইটালীর, রাশিয়ার, আরো অনেকের। দুনিয়া-বাঁটোয়ারা সম্পন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সেই বাঁটোয়ারা বাতিল করে আবার নতুন বাঁটোয়ারার তাগিদ প্রবল হয়ে উঠল। পরিণামে ১৯১৪-১৮ সালের প্রথম বিশ্বযুদ্ধ।

। চার ॥

রাশিয়ার পুরনো সাম্রাজ্য ছিল পোল্যাণ্ড, ফিনল্যাণ্ড এবং ককেশাস অঞ্চলের জর্জিয়া আর্মেনিয়া প্রভৃতি দেশে। রাশিয়ার সমুদ্রবন্দর বলতে একটি, নৌবহর বলতেও বিশেষ কিছু ছিল না; সমুদ্রপথে আফ্রিকায় বা দক্ষিণ আমেরিকায় বা দক্ষিণ এশিয়ায় গিয়ে সাম্রাজ্যবিস্তার করা তার সাধ্য ছিল না। রাশিয়ায় ধনতন্ত্রের বিকাশও শুরু হয় অনেক পরে, ১৮৯০-এর দশকেই রুশ ধনতন্ত্র ভ্রূণাবস্থা ছেড়ে একটা অবয়বসম্পন্ন আকৃতি নিল বলা যায়। স্বভাবতই রাশিয়ার সাম্রাজ্যবাদী ঝোঁকের চরিত্রটা ছিল সামন্ততান্ত্রিক, তার সওদাগরী ধনতান্ত্রিক তাগিদ এল ১৯০০ সালের কাছাকাছি।

নিজের সাম্রাজ্যের সীমান্ত বরাবর আরো নতুন সাম্রাজ্য দখল করার তাগিদে রাশিয়া পশ্চিমদিকে ও পূর্বদিকে হাত বাড়িয়েছিল। পশ্চিমদিকে জার্মানী ও অস্ট্রিয়া শক্তিশালী রাষ্ট্র, সেদিকে বেশি এগোনো যায় না। অতএব, দক্ষিণ-পশ্চিমে বলকান অঞ্চলের দেশগুলো, দক্ষিণে তুরস্ক ও পারস্য, দক্ষিণ-পূর্বে মধ্য-এশিয়ার স মরখন্দ-বুখারা-আফগানিস্তান, এবং পূর্বদিকে চীন ও কোরিয়ার ওপর রাশিয়ার নজর পড়েছিল।

জার্মানী এসময়ে রাশিয়াকে মিত্র হিসেবে রাখতে চাইছিল। ফ্রান্সের সঙ্গে জার্মানীর যুদ্ধ বাধলে সেইসময় রাশিয়া যদি জার্মানীকে পূর্বদিকে আক্রমণ করে তাহলে জার্মানীর বিনাশ অবশ্যম্ভাবী বিবেচনা করে জার্মান সরকার রাশিয়ার মৈত্রীকে খুব মূল্য দিত। অস্ট্রিয়া-

হাঙ্গেরী জার্মানীর মিত্র ছিল, রাশিয়ার সঙ্গে অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর যাতে বিবাদ না বাধে জার্মানীকে সেদিকে খেয়াল রাখতে হত। নানা হিসেব করে জার্মানী রাশিয়াকে ক্রমাগত পূর্বদিকে এগোতে উৎসাহ দিচ্ছিল। 'কোরিয়া তো তোমার ঈশ্বরদত্ত সামগ্রী' বলে জার্মান সম্রাট রুশ সম্রাটকে চিঠিপত্র লিখেছিলেন।

কিন্তু বৃটেন চাইছিল, রাশিয়ার নজর যেন ইউরোপেই আটকে থাকে। চীনে-কোরিয়ায় বা মধ্য এশিয়ায় রুশ সাম্রাজ্যের বিস্তার বৃটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষে অস্বস্তিকর তো বটেই, বিপজ্জনকও হতে পারে বলে বৃটেন মনে করছিল।

আসলে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির প্রত্যেকেই অপর সকলের বিরুদ্ধে, এবং যে কোন একটি বৃহৎ শক্তির বিরুদ্ধে অন্যরা একজোট হবার চেষ্টা করে। ফলে নানারকম পরস্পরবিরোধী গোপন চুক্তি, জোটবন্ধন ও শলা-পরামর্শ হচ্ছিল। এই জটিল দ্বন্দ্ব-মিলন, চক্রের ভেতর চক্র, এবং তার নানারকম কূট-কৌশল এসময়কার গোপন কূটনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য।

রাশিয়ার বরাবর ঝোঁক ছিল কৃষ্ণসাগর-তীরে তুরস্কের এলাকা-গুলো দখল করে দার্দানেল্স্ প্রণালী দিয়ে রুশ সামুদ্রিক জাহাজ চলাচলের রাস্তা করে নিতে হবে। রাশিয়ার এই সাধে ক্রমাগত বাধা দিত বৃটেন ; ১৮৫৩-৫৬ সালে ক্রাইমিয়ার যুদ্ধে রাশিয়ার প্রধান শত্রু ছিল বৃটেন।

জার্মানী, অস্ট্রিয়া ও ইটালী ভূমধ্যসাগরে ফ্রান্সকে কোণঠাসা করার মতলবে এক গোপন চুক্তি ক'রে ১৮৮৭ সালে বৃটেনকে সে চুক্তির সহযোগী করে নেয়। রাশিয়া এতে খুব ক্রুদ্ধ হয়েছিল, এবং ফ্রান্সের দিকে ঝুঁকেছিল। ফ্রান্সও সাগ্রহে রাশিয়াকে ঋণ ও সাহায্য দিতে এগোয়। জার্মানীর সঙ্গে রাশিয়ার মৈত্রী এসময়ে একটু চিড় খেয়েছিল।

১৮৯০-এর দশকে দূরপ্রাচ্যে, ভূমধ্যসাগরে এবং আফ্রিকায়

বৃটেন ও ফ্রান্সের মধ্যে স্বার্থের দ্বন্দ্ব বেশ প্রবল হয়ে উঠেছিল। তাতে জার্মানী উৎসাহ পেয়েছিল। দূরপ্রাচ্যে ১৮৬৭-১৮৮৭ সালের মধ্যে ফ্রান্স ইন্দোচীন দখল সম্পন্ন ক'রে ১৮৯২ সালে শ্যামদেশের রাজার কাছে মেকং নদীর পূর্বতীরবর্তী অঞ্চলটা দাবী করে; ফ্রান্সের উদ্দেশ্য ছিল, এই জায়গা দিয়ে ভিয়েৎনামের হাইফঙ বন্দর থেকে রেললাইন চালিয়ে চীনের দক্ষিণে ইয়ুনান প্রদেশে ঢোকার রাস্তা করা হবে। বৃটেন ব্রহ্মদেশ থেকে একই মতলব করছিল। কাজেই স্বার্থের দ্বন্দ্ব প্রবল। বৃটেনের সঙ্গে ফ্রান্সের যুদ্ধ বাধার অবস্থা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত বৃটেন পিছু হঠল। যুদ্ধ হল না দেখে জার্মান সম্রাট বৃটেনের ওপর অসন্তুষ্ট হলেন।[৪]

আফ্রিকায় মিশর, সুদান ও নীলনদের উপত্যকা-অঞ্চল নিয়ে ১৮৯০-এর দশকে বৃটেন, ফ্রান্স, বেলজিয়ম, ইটালী প্রভৃতির মধ্যে নানারকম ধাক্কাধাক্কি চলছিল। আইনতঃ মিশর সে সময়ে তুরস্ক-সাম্রাজ্যের অধান, তুর্কী সুলতানের প্রতিনিধি হিসেবে খেদিব রাজ্য-শাসন করতেন। ১৮৬৯ সালে সুয়েজ খাল খোলার পর খেদিবের সরকারকে ঋণ দেবার জন্য বৃটেন ফ্রান্স জার্মানী প্রভৃতি সব দেশেরই ধনিকরা ছুটে আসছিল। এই ঋণ নিয়ে মিশরের দুর্দশা ঘোচেনি, দেদার দুর্নীতি ও অপব্যয় বেড়েছিল। ১৮৭৬ সালে প্রায়-দেউলিয়া খেদিবের সরকারের অর্থদপ্তরের তদারকী-নিয়ন্ত্রণের ভার নিল বৃহৎ ধনিক দেশগুলির এক আন্তর্জাতিক তহবিল-সংস্থা, Caisse de la Dette Publique। এই সংস্থার মধ্যে বৃটিশ সরকার ও ফরাসী সরকারের আধিপত্য প্রায় সমান সমান, প্রতিদ্বন্দ্বিতাও প্রবল। বৃটেন আর ফ্রান্সের মধ্যে মতভেদ হলে অন্য অংশীদারদের ওজন বাড়ত, তাদের ভোট পাওয়ার জন্য কিছু সুবিধা দিতে হত।

১৮৭৯-৮২ সালে মিশরী সেনাবাহিনীর একটা বড় অংশ আরাবি পাশা'র নেতৃত্বে তুর্কো-বৃটিশ কুশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। সেই বিদ্রোহ দমন করার অজুহাতে বৃটিশ সৈন্যবাহিনী এসে মিশর দখল

করে বসল ১৮৮২ সালে—ফ্রান্স বা অন্য কারু সম্মতির অপেক্ষা না করে। মিশরে একটা 'আধুনিক দক্ষ প্রশাসন' প্রতিষ্ঠা করে দিয়ে বৃটিশ বাহিনী ফিরে যাবে, এই স্তোকবাক্য দিয়ে বৃটেন মিশর দখল করে বসে রইল।

সুদান মিশরের শাসনাধীন এলাকা বলে গণ্য হত। বাস্তবে সুদানের ওপর মিশরের কর্তৃত্ব কোনদিনই মজবুত হয়ে বসেনি। মিশরের ভেতরে গোলমাল, দুর্নীতি, অব্যবস্থা ও প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলার ফলেও সুদানে এক ধরনের নৈরাজ্য চলছিল। মিশরে যখন আরাবি পাশা'র নেতৃত্বে সামরিক বিদ্রোহ চলছিল, সেই সময়ে সুদানে মাহ্‌দি-রাষ্ট্রের অভ্যুত্থান হয়। এ বিদ্রোহের আওয়াজগুলো ছিল ধর্মীয়। বিদ্রোহের নায়ক মুহম্মদ আহ্‌মদ্-ইবন্ আব্‌দাল্লাহ্ দাবী করছিলেন যে তিনি ঈশ্বরপ্রেরিত উদ্ধারকর্তা 'মাহ্‌দি', ইসলামের অনুশাসন প্রতিষ্ঠা করা তাঁর ব্রত। ধর্মীয় বিশ্বাসের প্রেরণাতেই হোক আর নিদারুণ দুর্দশার চাপেই হোক, মাহ্‌দির বাহিনীতে যারা যোগ দিয়েছিল তারা মরিয়া-ধরনের দুর্ধর্ষ যোদ্ধা হয়ে উঠেছিল। আলখাল্লার মতো সাদা পোশাক পরা, আরব পাগড়ী মাথায়, এই ঘোড়সওয়ার যোদ্ধাদের 'দরবেশ' বলা হতো, ইংরেজী উচ্চারণে হয়েছিল Dervish। ১৮৯৬ সালের মার্চ মাসে লর্ড কিচেনারের পরিচালিত বৃটিশ সৈন্যবাহিনী (তাদের অধিকাংশই ভারতীয়) মিশর থেকে সুদানে ঢুকল। এই সৈন্যবাহিনী বরাবর রেললাইন বসাতে বসাতে এগোচ্ছিল। 'দরবেশ'-বাহিনীর সঙ্গে এদের প্রথম বড় যুদ্ধ হল ১৮৯৮ সালের এপ্রিল মাসে আত্‌বারা নদীর তীরে। তারপরে ১লা সেপ্টেম্বর খার্তুমের কাছে ওমদুরমান-এর যুদ্ধ 'দরবেশ'-বাহিনীর শেষ যুদ্ধ; এ যুদ্ধে মাহ্‌দি-রাষ্ট্র ধ্বংস হয়ে গেল।

এই দুটো যুদ্ধের উল্লেখ করা প্রয়োজন 'ম্যাক্‌সিম্-গান্'-এর মহিমা বোঝার জন্য। মাহ্‌দি-বাহিনীর হাতে ছিল তলোয়ার, বর্শা, কিছু পুরনো ধরনের গাদা বন্দুক, আর কয়েকটা কামান। তারা

অসাধারণ ভালো ঘোড়সওয়ার ছিল—এ দক্ষতা আফ্রিকা-দক্ষিণে আফ্রিকান জাতিগুলির ছিল না। ঘোড়সওয়ারী দক্ষতা দিয়েই তারা এ পর্যন্ত শ্বেতাঙ্গমহলে ত্রাসের সঞ্চার করেছিল। কিন্তু কিচেনার-এর বৃটিশ বাহিনীর সঙ্গে ছিল আধুনিক রাইফেল, যার পাল্লা প্রায় ৪০০০ গজ ; আর ছিল, ম্যাক্সিম্-এর উন্নত-সংস্করণ মেশিনগান। দুটো যুদ্ধে উভয়পক্ষের হতাহতের হিসেব দেখলেই আধুনিক মারণাস্ত্রের যোগ্যতা বোঝা যাবে। আত্বারায় একদিনের যুদ্ধে দরবেশ-বাহিনীর নিহত ৩০০০, আহত ৪০০০ ; বৃটিশ-তরফে নিহত ৮১ জন, আহত ৪৮৭ জন। ওমদুরমানের যুদ্ধের হিসেব আরো চমকপ্রদ, সেখানে দরবেশ-বাহিনীর নিহত ১১ হাজার, আহত ১৬ হাজার ; বৃটিশ-তরফে নিহত ৪৯ জন, আহত ৩৮২ জন।[৫]

খার্তুম দখল করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বৃটিশ সরকার খবর পেলেন সুদানের দক্ষিণে নীলনদের পশ্চিমতীরে 'ফাশোদা' নামে এক গুরুত্ব-পূর্ণ জায়গায় এক ফরাসী সেনাবাহিনী এসে ঘাঁটি গেড়ে বসেছে। কিচেনার যখন মিশর থেকে দক্ষিণ দিকে সুদান দখল করতে রওনা হন, প্রায় সেই সময়েই ফরাসী-অধিকৃত কঙ্গোদেশ থেকে পূর্বমুখে এই ফরাসী বাহিনী সুদান যাত্রা করেছিল। কিচেনার দক্ষিণে ছুটলেন। ফাশোদায় দুই বাহিনী মুখোমুখি হল ১৮৯৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। দুই দেশের সংবাদপত্রগুলো প্রচণ্ড হুঙ্কার ছাড়তে থাকল, যুদ্ধ বাধে বাধে। শ্যামদেশে ইংরেজরা পিছিয়ে গিয়েছিল, এবার ফরাসীরা পিছিয়ে গেল।

বৃটিশবাহিনী সুদানে গিয়েছিল মিশর-সরকারের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে। দখল হবার পর কিন্তু সুদান মিশরের একার এলাকা থাকল না, বৃটেন ও মিশরের যৌথ রাজ্য হয়ে গেল, তার নামই হল 'অ্যাংলো-ইজিপ্সিয়ান সুদান'। 'যৌথ' কথাটারও বিশেষ মানে হয় না। কারণ মিশর সরকার তো বৃটিশ সরকারের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছিল।

বৃটেন, জার্মানী, পর্তুগাল

ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের যখন এইসব ঠেলাঠেলি ধাক্কাধাক্কি চলছিল, তখন অল্প কিছুদিনের জন্য জার্মানীর সঙ্গে বৃটেনের মিতালীর ঝোঁক হয়। ১৮৯৮ সালের অগস্ট মাসে (ফাশোদার ঘটনা সেপ্টেম্বরে ঘটেছিল) জার্মানীর সঙ্গে বৃটেনের এক গোপন চুক্তি হল—আফ্রিকায় পর্তুগালের সাম্রাজ্য এই দুই ভাগীদারের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেবার মতলবে। পর্তুগাল সরকারের সে সময়ে আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ, তারা বৃটেনের কাছে মোটা টাকা ঋণ চেয়েছিল। জার্মানরা এই ঋণের খানিকটা অংশ জোগাতে আগ্রহী হয়েছিল। তাদের আন্দাজ ছিল যে পর্তুগাল ঋণ শোধ করতে পারবে না, সুদের কিস্তি দিতেও খেলাপ করবে ; তখন পাওনাদার হিসাবে বৃটেন আর জার্মানী পর্তুগালের আঙ্গোলা ও মোসাম্বিক সাম্রাজ্য নিজেদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নেবে।

বৃটেনের সঙ্গে জার্মানীর গোপন চুক্তি হল বটে, কিন্তু জার্মানীর মতলব হাসিল হল না। ফ্রান্সের বাজারে ঋণপত্র বিক্রী করে পর্তুগাল টাকা জোগাড় করে ফেলল, বৃটিশ-জার্মান ঋণ গ্রহণ করতে অস্বীকার করল। ফরাসী সরকার ও ফরাসী ধনিকরা এ ব্যাপারে পর্তুগালকে খুব সাহায্য করেছিল, সেটা স্বাভাবিক। কিন্তু বৃটিশ সরকার এবং বৃটিশ ধনিকরাও এ ব্যাপারে গোপনে ফরাসীদের উৎসাহিত করেছিল। জার্মানী সেটা টের পেয়ে গিয়েছিল। পরের বছর, ১৮৯৯ সালে, পর্তুগালের সঙ্গে বৃটেনের পুরনো চুক্তির মধ্যে এক গোপন নতুন ধারা যোগ হল, তাতে বৃটেন পর্তুগীজ সাম্রাজ্যের সমগ্রতা ও অখণ্ডতা রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিল। জার্মানীর সঙ্গে বৃটেনের যে চুক্তি হয়েছিল, এই বৃটিশ-পর্তুগীজ চুক্তি তার বিরোধী। এটা জানতে পেরে, স্বভাবতই, জার্মানী বৃটেনকে ঘোর বিশ্বাসঘাতক ফেরেব্বাজ বলে গণ্য করেছিল।[৬]

১৮৯৮-৯৯ সালে বৃটেনের এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় বাসিন্দা বৃটিশদের উচ্চমহলে একটা বড় দুশ্চিন্তা ছিল পর্তুগীজ পূর্ব আফ্রিকায় (মোসাম্বিকে) দেলাগোআ উপসাগর ও উপসাগর-কূলবর্তী বন্দর লরেন্সো মার্কোয়েস্ নিয়ে। এই উপসাগরে ও বন্দরে জার্মান বা অন্য ইউরোপীয় জাতির জাহাজ-চলাচল, তাদের সঙ্গে ট্রান্সভাল বোয়ার-রাষ্ট্রের সংযোগ, অস্ত্রশস্ত্র ও বাণিজ্যিক সামগ্রীর আমদানী বৃটিশ সাম্রাজ্যের পক্ষে এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় বৃটিশ বাণিজ্যের পক্ষেও অস্বস্তিকর ছিল। ইতিপূর্বে ১৮৯০ সালে দেলাগোআ উপসাগরে গানবোট পাঠিয়ে বৃটেন পর্তুগালকে শাসানি দিয়েছিল। কিন্তু শাসানির সঙ্গে কিছু মিত্রবৎ আচরণও কূটকৌশলের অবশ্যপ্রয়োজনীয় উপাদান। পর্তুগালকে অসন্তুষ্ট বিক্ষুব্ধ শত্রুভাবাপন্ন করে রাখা, তাকে শত্রুপক্ষে ঠেলে দেওয়া, অপর কোন ইউরোপীয় রাষ্ট্রের শরণাপন্ন হতে তাকে বাধ্য করা, এবং এইভাবে বা অন্যভাবে দেলাগোআ উপসাগরে অপর কোন ইউরোপীয় শক্তির প্রবেশের পথ করে দেওয়া বৃটেনের পক্ষে যুক্তিযুক্ত মনে হয়নি। তার পরিবর্তে পর্তুগালকে বৃটেনের বশে রাখা বেশি যুক্তিযুক্ত কৌশল বিবেচনা করা হয়েছিল।

১৮৯৯ সালে ট্রান্সভালের বোয়ার-রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে বৃটেনের যুদ্ধযাত্রা যখন আসন্ন হয়ে উঠল, তখন পর্তুগালকে বশে রাখা খুবই দরকার হয়ে উঠেছিল। সে সময়ে জার্মানীকে অসন্তুষ্ট করে পর্তুগালকে ভরসা দেওয়ার এটা একটা বড় কারণ।

এই আন্তর্জাতিক পটভূমিতে ১৮৯৯ সালে বোয়ার-যুদ্ধ শুরু হল।

পঞ্চম অধ্যায়

সিসিল রোড্‌স্‌, বোয়ার-যুদ্ধ

॥ এক ॥

১৮৮৬ সালে ট্রান্সভালের ভিট্‌ভাটার্সরান্‌ডে সোনার খনি আবিষ্কৃত হবার পর থেকে ট্রান্সভালে খনিশিল্পে এবং আনুষঙ্গিক শিল্প-বাণিজ্যে প্রচুর মূলধন লগ্নী হচ্ছিল। এই মূলধনের প্রায় সবটাই আসছিল ইউরোপ থেকে, এবং অধিকাংশটা ছিল বৃটিশ। ১৮৯৫-৯৬ সাল নাগাদ ভিটভাটার্সরান্‌ড্‌ এলাকার খনিগুলোয় ৫ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড বৃটিশ মূলধন ঢালা হয়েছিল।[১]

এই মূলধনের অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করছিলেন সিসিল জন রোড্‌স্‌। ১৮৭১ সালের শেষের দিকে ১৮ বছর বয়সে সিসিল রোড্‌স্‌ নাটালের ডারবান শহর থেকে বলদের গাড়ি চড়ে কিম্বার্লি হীরকখনি অঞ্চলে প্রথম আসেন। এখান থেকে তাঁর উত্থান শুরু। ১৮৮০ সালে কিম্বার্লি হীরকখনি অঞ্চলের বৃহৎ কোম্পানী 'ডি বীয়ার্স' প্রতিষ্ঠা হল—রোড্‌স্‌ তার প্রধান মালিক ও পরিচালক। তিনি আরো একাধিক কোম্পানী চালাচ্ছিলেন, কিন্তু 'ডি বীয়ার্স' তাঁর ঐশ্বর্যের প্রধান উৎস। ১৮৮৫ সালের শেষে তাঁর বার্ষিক উপার্জন ছিল প্রায় ৫০ হাজার পাউণ্ড।[২] ১৮৮৭ সালে তিনি পৃথিবীর বৃহত্তম ধনপতিদের মহলে যাতায়াত করছেন, এবং ওই বৎসরেই কিম্বার্লির হীরকখনিগুলোর প্রায় একচেটিয়া কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য রথস্‌চাইল্ডের কাছে ৭ লক্ষ ৫০ হাজার পাউণ্ড ঋণ করছেন।[৩] সেই বছরেই তিনি তাঁর প্রধান অংশীদার-বন্ধুদের নিয়ে ট্রান্সভালে স্বর্ণখনি এলাকায় 'গোল্ড ফীল্ডস্‌ অব সাউথ আফ্রিকা' কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করছেন ১ লক্ষ ২৫ হাজার পাউণ্ড মূলধন নিয়ে; ১৮৯২ সালে এ কোম্পানীর যখন নাম হল 'কনসলিডেটেড গোল্ড ফীল্ডস্‌ অব সাউথ আফ্রিকা', তখন তার মূলধন ১২ লক্ষ ৫০ হাজার পাউণ্ড। ১৮৯৪-৯৫ সালে এই কোম্পানী অংশীদারদের ৫০% ডিভিডেণ্ড বিতরণ করেছিল।[৪]

রোড্‌স্‌ দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী অন্য কোম্পানীগুলোকে কিনে নিয়ে বা কোণঠাসা করে বা অন্য প্রক্রিয়ায় গ্রাস করে শিল্প-বাণিজ্যের প্রায় একচ্ছত্র সম্রাট হয়ে উঠেছিলেন। কোম্পানীর পর কোম্পানী তৈরী করা, একাধিক কোম্পানী জড়ো করে 'অ্যামালগামেশন' করানো, 'কনসলিডেটেড্‌ কোম্পানী' 'সিণ্ডিকেট' তৈরী করা, এক কোম্পানীর মূলধন দিয়ে আরেক কোম্পানী চালু করা, সরকারী লোক বা প্রভাবশালী লোককে ঘুষ দিয়ে হাত করা, শেয়ার-বাজারে উঠতিপড়তির কলকাঠি নাড়া,—খনি, রেলওয়ে, ব্যাঙ্ক, শেয়ার-মার্কেট, সংবাদপত্র, সরকার, সৈন্যবাহিনী সব জড়িয়ে আধুনিক ফিনান্স-ক্যাপিটালিজমের ভেলকিবাজি দেখাচ্ছিলেন রোড্‌স্‌। অনেকের মাথা ঘুরে গিয়েছিল। ধনতন্ত্রের সাবেকী চাল পাল্টে গিয়েছিল, দক্ষিণ আফ্রিকায় এবং বৃটেনে হাল আমলের ধনতন্ত্রের চোখ-ধাঁধানো হঠাৎ-নবাব প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন সিসিল রোড্‌স্‌।

রোড্‌স্‌ একাই ফুলে ফেঁপে ওঠেননি; তাঁর সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকার অন্য কোম্পানীগুলোও ফুলে উঠছিল। বিশেষতঃ লণ্ডনের শেয়ার-বাজারে তোলপাড় হচ্ছিল। যেসব কোম্পানী কোন লাভ দেখাতে পারছিল না, ভবিষ্যতে লাভ হবে এই কল্পনা বা গুজবের ওপরেই তাদেরও শেয়ারের বাজারদর বাড়ছিল। ১৮৯৫ সাল নাগাদ এ ধরনের কোম্পানীগুলোর মোট ২ কোটি ৮০ লক্ষ পাউণ্ড দামের শেয়ারের বাজারদর হয়েছিল ১১ কোটি ৩০ লক্ষ পাউণ্ড।[৫]

রোড্‌সের বাতিক ছিল বৃটিশসাম্রাজ্য বিস্তার। ১৮৭৬-৭৮ সালে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-অবস্থায় (সেই সময়েই তিনি কিম্বার্লিতে হীরকখনির মালিক) তিনি বৃটিশ পত্রপত্রিকায় আফ্রিকার উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত বিস্তৃত বৃটিশ সাম্রাজ্য গঠিত হওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে জল্পনা-কল্পনা করেছিলেন। এই কল্পনা রোড্‌স্‌কে ভূতে পাওয়ার মতো পেয়ে বসেছিল। কেপ থেকে কাইরো পর্যন্ত বিস্তৃত একটানা বৃটিশ সাম্রাজ্য চাই এবং তার মধ্য দিয়ে কেপ থেকে কাইরো

পর্যন্ত রেললাইন চাই। ১৮৮২ সালে বৃটেন মিশর দখল করার পর এই কল্পনা জোরাল হয়ে ওঠে।

১৮৮১ সালে রোড্‌স্‌ কেপ্‌ কলোনীর পার্লামেন্টে কিম্বার্লি এলাকা থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধি হয়ে আসেন। কেপ্‌ থেকে উত্তর দিকে বৃটিশ কর্তৃত্ব প্রসারের জন্য তিনি জোর তদ্বির-তাগাদা শুরু করেন। প্রধানতঃ তাঁরই তাগাদায় ১৮৮৫ সালে কেপ্‌ থেকে কিম্বার্লি পর্যন্ত রেলপথ চালু হয়। কেপ্‌ কলোনী, অরেঞ্জ ফ্রি স্টেট ও নাটালের মধ্যবর্তী বাসুটোল্যাণ্ড বৃটিশ সরকারের খাস-উপনিবেশ ('ক্রাউন কলোনী') হল ১৮৮৪ সালে, রোড্‌স্‌ সে ব্যাপারে প্রধান উদ্যোক্তা ও পরামর্শদাতা ছিলেন। রোড্‌সের তাগিদেই ১৮৮৫ সালে বেচুয়ানা দেশটা বৃটিশ-রক্ষণাধীন ('প্রোটেক্টরেট') বলে ঘোষণা করা হয়।

১৮৮৯ সালের ২৯শে অক্টোবর রোড্‌সের প্রতিষ্ঠিত 'বৃটিশ সাউথ আফ্রিকা কোম্পানী' মহারাণীর সনদ ('চার্টার') পেল—বেচুয়ানাল্যাণ্ড থেকে আরো উত্তরদিকে অগ্রসর হয়ে সোনার খনি ও অন্যান্য শিল্প-বাণিজ্যের সন্ধান করা, খনি খনন করা, বসতি স্থাপন করা, শিল্প-বাণিজ্য বিস্তার করা, কোম্পানীর অঞ্চলে শান্তিরক্ষা করা ও প্রশাসন চালানো ইত্যাদি সব অধিকার এই সনদে ছিল। এই সনদ পাওয়ার জন্য রোড্‌স্‌ তাঁর নতুন কোম্পানীর বোর্ডে একাধিক ডিউক ও অভিজাত-বংশীয়দের আসন দিয়েছিলেন এবং প্রচুর মুনাফার লোভ দেখিয়েছিলেন। 'টাইম্‌স্‌' সংবাদপত্রকেও তিনি হাত করেছিলেন।[৬] বেচুয়ানাল্যাণ্ডের উত্তরে মাটাবেলে-রাজ লোবেঙ্গুলার এলাকা এই চার্টার্ড কোম্পানীর শিকারক্ষেত্র। কোম্পানীর নির্ধারিত মূলধন ছিল ১০ লক্ষ পাউণ্ড, ১ পাউণ্ড দামের ১০ লক্ষ শেয়ার। সাতজন ডিরেক্টর এবং তাঁদের বন্ধু-স্বজন ৫ লক্ষ শেয়ার ধরে রাখলেন, প্রতি শেয়ারে ৩ শিলিং নগদ মূল্য দিয়ে। ২ লক্ষ শেয়ার কিনল রোড্‌সের 'ডি বীয়ার্স' কোম্পানী। ৯০ হাজার শেয়ার দেওয়া হল রোড্‌সের

'ইউনাইটেড কন্‌সেসন্‌স্‌ কোম্পানী'-কে, লোবেঙ্গুলার কাছ থেকে তাঁরা খনি-খননের ও জমি-দখলের যেসব অনুমতিপত্র (কন্‌সেসন্‌) সংগ্রহ করেছিলেন তার জন্য ; পরে আবিষ্কার হয় যে এগুলোর মধ্যে আসল অনুমতিপত্রটাই নেই ; সেটার জন্য আবার 'কন্‌সেসন্‌ কোম্পানী'কে আরো ১০ লক্ষ পাউণ্ড দিতে হয় চার্টার্ড কোম্পানীর তহবিল থেকে।[৭]

॥ দুই ॥

চার্টার-প্রাপ্তির সাত মাস পরে ১৮৯০ সালের ২৭শে মে বৃটিশ সাউথ আফ্রিকা কোম্পানীর প্রথম অভিযাত্রী দল রওনা হল মাটাবেলে-রাজের উত্তরদেশ দখল করতে। মাটাবেলে জাতি জুলু জাতির একটা শাখা। ঊনবিংশ শতকের প্রথম বিশ বছরের মধ্যে কোন সময় জুলু-রাজ শাকা-র সঙ্গে এই শাখার অধিপতি ম্‌জিলিকাজি-র কলহ হয়, তিনি নাটালের জুলু রাজ্য ছেড়ে উত্তর-পশ্চিমে চলে আসেন। এ অঞ্চলে তখন মাশোনা জাতির বাস। মাটাবেলেরা মাশোনাদের উৎখাত করে দক্ষিণাঞ্চলে নিজেদের রাজ্য স্থাপন করে। রোড্‌সের সময়ে ম্‌জিলিকাজি-র পুত্র লোবেঙ্গুলা মাটাবেলে-রাজ, এবং মাশোনাদেরও অধিপতি। কিন্তু উত্তরাঞ্চলে মাশোনাদের এলাকায় মাটাবেলেদের নিত্য যাতায়াত ছিল না ; সে অঞ্চলে জনশূন্য বিশাল প্রান্তরও পড়ে ছিল। লোবেঙ্গুলার অজ্ঞাতে এই মাশোনা অঞ্চল দখল করে নেওয়াই ছিল বৃটিশ সাউথ আফ্রিকা কোম্পানীর অভিযাত্রী দলের প্রথম লক্ষ্য।

এই অভিযাত্রীদলে প্রায় ১০০০ লোক ছিল। তার মধ্যে ১৮৪ জনকে নেওয়া হয়েছিল ওই অঞ্চলে প্রথম শ্বেতাঙ্গ বসতি স্থাপন করার জন্য। নূতন বসতিতে এদের প্রত্যেককে প্রায় ৬০০০ একর জমি ও ১৫টা করে স্বর্ণখনির জমির টুকরো দেওয়া হবে বলা হয়েছিল। এদের হাতে দেওয়া হয়েছিল রাইফেল এবং ওয়েব্‌লি রিভলভার।

প্রায় মাস-খানেক ধরে এদের লড়াইয়ের কায়দা-কৌশল শেখানো হয়।[৮] এরা অবশ্য সম্পূর্ণ বিনা বাধায় লক্ষ্যস্থলে পৌঁছেছিল।

১১ই সেপ্টেম্বর তারিখে এরা একটা পাহাড়ের কাছে পৌঁছে সেখানে ফোর্ট সল্স্বেরি নামে এক দুর্গ নির্মাণ করে অভিযান সমাপ্ত করল। বেচুয়ানাল্যাণ্ড সীমান্ত থেকে ৪৫০ মাইল দূরে এই দুর্গ প্রতিষ্ঠা বর্তমান রোডেশিয়া রাষ্ট্রের সূত্রপাত বলা যেতে পারে। দুর্গের নামকরণ হয়েছিল তদানীন্তন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর নামে।

এরপর কিছুদিন এই অঞ্চলে বৃটিশ সাউথ আফ্রিকা কোম্পানীর সঙ্গে যা কিছু ধাক্কাধাক্কি তা করছিল পূর্ব আফ্রিকার পর্তুগীজরা এবং ট্রান্সভালের বোয়াররা। মাটাবেলে বা মাশোনা জাতি তখনো ব্যাপারটা কি হচ্ছে তা বুঝে উঠতে পারেনি। মাটাবেলে-রাজ লোবেঙ্গুলা তাঁর বৃটিশ মিশনারী পরামর্শদাতাদের ওপরে এবং বৃটিশ মহারানীর প্রদত্ত আশ্বাসের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। এরা সবাই তাঁকে ঠকিয়েছিল। ১৮৮৮-৮৯ সালে বেচুয়ানাল্যাণ্ডের বৃটিশ কমিশনার ছিলেন সিডনী শিপার্ড; রোড্সের বহু কুকর্মের তিনি সহায়ক ছিলেন, এবং পরে বৃটিশ সাউথ আফ্রিকা কোম্পানীর চেয়ারম্যানের পদ পেয়েছিলেন; মাটাবেলেরা এঁর নাম দিয়েছিল 'মারানা মাকা',—'মিথ্যার জনক'।[৯] কিন্তু শিপার্ড একাই 'মিথ্যার জনক' ছিলেন না। যে ব্যবস্থায় নিত্য নূতন কোম্পানী আর কোম্পানীর শেয়ার গজাচ্ছিল, সাম্রাজ্য বিস্তৃত হচ্ছিল, সেই ব্যবস্থায় ঝুড়ি ঝুড়ি মিথ্যা কথা, শঠতা আর ভণ্ডামির জন্মও হচ্ছিল দ্রুতহারে। শিপার্ড এ ব্যবস্থার অনেক অংশীদারদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন।

চার বছরের মধ্যে লোবেঙ্গুলার রাজ্য লোপ পেল। ম্যাক্সিম্গান খুব কাজ করেছিল। ১৮৯৩ সালের অক্টোবর-নভেম্বর মাসে যুদ্ধের শেষে রোড্সের বিশ্বস্ত অনুচর ডক্টর জেম্সনের নেতৃত্বে বৃটিশ সাউথ আফ্রিকা কোম্পানীর সৈন্যবাহিনী যখন লোবেঙ্গুলার রাজধানী বুলাওয়াইওতে প্রবেশ করল, তখনো রাজধানীর ধ্বংসস্তূপে আগুনের

শেষ রক্তাক্ত আভা দেখা যাচ্ছিল। সেই দিন পর্যন্ত এ যুদ্ধে বৃটিশ পক্ষে নিহত পাঁচজন, আহত জনা-বারো ; মাটাবেলেদের নিহত পাঁচ হাজার, আহত বারো হাজার।[১০] যুদ্ধে পরাস্ত পলাতক লোবেঙ্গুলা কিছুদিন আত্মগোপন করে থাকার পর ১৮৯৪ সালে জাম্বেসি নদীর তীরে এক অজ্ঞাত কুটিরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। মাটাবেলে ও মাশোনা জাতির দেশ বৃটিশ সাউথ আফ্রিকা কোম্পানীর খাসতালুক হয়ে গেল। আরো চার বছর পরে বৃটিশ সরকার ওদেশের ললাটে রোড্‌সের নাম দেগে দিয়ে ওকে 'রোডেশিয়া' করলেন।

১৮৯০ সালেই আরো উত্তরে বারোৎসে জাতির প্রধানকে ঠকিয়ে ২ লক্ষ বর্গমাইল ব্যাপী বারোৎসেল্যাণ্ড কোম্পানীর এলাকা করে নেওয়া হয়েছিল। ১৮৯৪ সালের মধ্যে বেম্বা, আঙ্গনি, লুন্‌ডা প্রভৃতি জাতির বাসভূমিগুলোও কোম্পানীর এলাকা হয়ে গেল। এ সব নিয়ে তৈরী হল বৃটিশ উত্তর রোডেশিয়া। টাঙ্গানিকা হ্রদ থেকে নিয়াসা হ্রদ পর্যন্ত লাইন-বরাবর জার্মান পূর্ব আফ্রিকার সঙ্গে এই বৃটিশ মধ্য আফ্রিকার মুখোমুখি সাক্ষাৎ হল।

॥ তিন ॥

বৃটিশ সাউথ আফ্রিকা কোম্পানীর মাশোনাল্যাণ্ড অভিযান রওনা হয়েছিল ১৮৯০ সালের ২৭শে মে। সে অভিযান যখন মাঝপথে চলছে সেই সময় ১৬ই জুলাই তারিখে রোড্‌স্‌ কেপ্‌ কলোনীর প্রধানমন্ত্রী হলেন। ১৮৯৬ সালের ১২ই জানুয়ারী পর্যন্ত রোড্‌স্‌ প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। একই সময়ে তিনি বৃটিশ সাউথ আফ্রিকা কোম্পানীর ডিরেক্টর ও সর্বেসর্বা ছিলেন। একসঙ্গে এই দুটি পদে বহাল থাকা অসঙ্গত বা নীতিবর্জিত বলে কারু কারু মনে হলেও এ নিয়ে বিশেষ আপত্তি কেউ করেনি।

রোড্‌স্‌ সাড়ে পাঁচ বছর কেপ্‌ কলোনীর প্রধানমন্ত্রী ছিলেন।

এই সাড়ে পাঁচ বছরে তিনি অনেক কাজ করেছিলেন—তার মধ্যে এখানে উল্লেখযোগ্য চারটি।

প্রথম কাজটি হল, কেপ্ কলোনীর ভোটার তালিকায় আফ্রিকানদের সংখ্যা কমানো। বৃটিশ সরকার তাঁদের আইনের কেতাবে বর্ণবৈষম্য-নীতির প্রকাশ্য ঘোষণা যতটা পারা যায় এড়িয়ে চলা পছন্দ করতেন ; আইনতঃ বৃটিশ-রাজ্য কেপ্ কলোনীতে আফ্রিকান বা অন্যান্য অ-শ্বেতাঙ্গরা ভোটার হতে পারত, চামড়ার রঙ বা জন্ম-সুবাদে তাদের ভোটার হবার অযোগ্য বলা হয়নি। কিন্তু ভোটার হবার ন্যূনতম যোগ্যতা ছিল বার্ষিক অন্ততঃ নগদ ২৫ পাউণ্ড উপার্জন, বা ২৫ পাউণ্ড মূল্যের ভূসম্পত্তি। খুব কম কৃষ্ণাঙ্গের এই যোগ্যতা ছিল। দাস, মজুর বা ঘরের চাকর হয়ে থাকাই যাদের জন্য বন্দোবস্ত, তারা এই উপার্জন বা সম্পত্তি কোথা থেকে পাবে ? তবুও, ১৮৮৭ সাল পর্যন্ত জমি দেখিয়ে অনেক আফ্রিকান ভোটার হতে পারত। কিন্তু ভোট নিয়ে আফ্রিকানরা মাথা ঘামাত খুব কম। ফলে আফ্রিকানদের সংখ্যার অনুপাতে ভোটারের সংখ্যা খুব সামান্যই ছিল।

কিন্তু আফ্রিকানদের সংখ্যাই এত বেশি যে আনুপাতিক হার সামান্য হলেও শ্বেতাঙ্গ ভোটারের সংখ্যার তুলনায় আফ্রিকান ভোটারের সংখ্যা খুব কম ছিল না। ১৮৮২ সালে কেপ্ কলোনীর ভোটার-তালিকায় শতকরা ১৪ জন আফ্রিকান ছিল। কেই নদীর দুই তীরে খোশা জাতির এলাকাগুলো কেপ্ কলোনীর অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়ার পর আফ্রিকান জনসংখ্যা ১০ লক্ষ বৃদ্ধি পেল, এবং ১৮৮৭ সালে কেপ্ কলোনীর ভোটার তালিকায় আফ্রিকানদের সংখ্যা দাঁড়াল শতকরা ৪৭ জন।[১১]

শ্বেতাঙ্গরা আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিল। 'কম্বল-সম্বল কাফির'দের ('blanket-kaffirs') ভোটার-তালিকায় প্রবেশ রোধ করা অবশ্য-কর্তব্য হয়ে উঠেছিল।[১২] ১৮৮৭ সালে আইন হল, আফ্রিকানরা

যে গোষ্ঠী-মালিকানার যৌথ ভূসম্পত্তি দেখিয়ে ভোটার হয়, তা আর চলবে না, ব্যক্তিমালিকানার জমি দেখাতে হবে। ৩০ হাজার আফ্রিকান ভোটার-তালিকা থেকে বাদ গেল।[১৩] কিন্তু তাতেও আতঙ্ক ঘুচল না। ট্রান্সভালের বোয়ার রাষ্ট্রে ভোটার তালিকায় কৃষ্ণাঙ্গদের একদম কোন ঠাঁই ছিল না, কেপ্ কলোনীর বোয়ার ও বৃটিশরা অনেকে ওই ব্যবস্থাটাই আদর্শ বলে প্রচার করছিল। রোড্স্ নিজে বোয়ার-বৃটিশ ঐক্যের উৎসাহী প্রচারক ছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার কেপ্ কলোনী, নাটাল, অরেঞ্জ ফ্রি স্টেট ও ট্রান্সভালকে একত্রিত করে একটি বৃটিশ ফেডারেশন গঠন তাঁর লক্ষ্য ছিল। বোয়াররা যাতে সেটা গ্রহণ করে, সেজন্য অ-শ্বেতাঙ্গদের বিষয়ে ট্রান্সভালের আইন ও কেপ্ কলোনীর আইনের মধ্যে পার্থক্য কমানো তাঁর সঙ্গত মনে হচ্ছিল। অতএব, ১৮৯২ সালে তিনি ভোট সম্বন্ধে নতুন আইন পাস করলেন। নতুন আইনে বলা হল, ভোটার হতে হলে বছরে অন্ততঃ ৫০ পাউণ্ড নগদ উপার্জন থাকা চাই, নতুবা ব্যক্তিগত মালিকানায় জমি ও সেই জমির ওপর বাড়ির মোট দাম ৭৫ পাউণ্ড হওয়া চাই ; এবং নিজের নাম ঠিকানা ও জীবিকা লিখে দেবার মত শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকা চাই।[১৪]

আফ্রিকানদের ভোটার হবার পথ প্রায় রুদ্ধ হল, ধনী বোয়ার ও বৃটিশ সন্তুষ্ট হল। বর্ণসঙ্করর‍াও অনেকে ভোটার-তালিকা থেকে বাদ গেল। অতি-দরিদ্র শ্বেতাঙ্গরাও বাদ গেল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে কেপ্ কলোনীতে শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীদের মধ্যে শ্রেণীভেদ প্রকট হয়ে উঠেছিল, অতি-দরিদ্র শ্বেতাঙ্গদের সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছিল।[১৫] দারিদ্র্য মানুষকে সব সময়ে মহৎ করে না, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই হীনতা, নীচতা ও ক্ষুদ্রতার পাঁকে ডোবায়। এই অতি-দরিদ্র শ্বেতাঙ্গরা কৃষ্ণকায় মানুষের মিত্র হয়নি, ভয়ঙ্কর শত্রুই হয়ে উঠেছিল। কৃষ্ণকায়-বিদ্বেষ ও বীভৎস হিংসাবৃত্তির একটা বড় ভাণ্ডার এখানে সঞ্চিত হচ্ছিল। আফ্রিকায় দরিদ্র শ্বেতাঙ্গ প্রায়

সর্বদাই দরিদ্র কৃষ্ণকায় মানুষের শত্রুতা করেছে, শোষণ-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বা অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তাদের কদাচিৎ দেখা গেছে। শোষিত বা দরিদ্র হলেই কেউ আপনা-আপনি ন্যায়ের জন্য সংগ্রামী হয়ে ওঠে না; রাজনৈতিক চিন্তা ও আদর্শের স্পর্শ না পেলে, মনুষ্যত্বের ধারণা সঞ্চারিত না হলে, প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার প্রভাবই কাজ করে—মানুষ অ-মানুষ হয়ে থাকে। এর ব্যতিক্রম আছে। কিন্তু সেগুলো ব্যতিক্রমই।

॥ চার ॥

প্রধানমন্ত্রী হিসাবে রোড্‌সের দ্বিতীয় কীর্তি ১৮৯৪ সালের 'গ্লেন গ্রে' আইন। কেই নদীর দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে খোশা জাতির বাসভূমি 'বৃটিশ কাফ্‌রারিয়া' হয়ে গিয়েছিল ১৮৪৭ সালে, ১৮৬০ সালে হয়েছিল লণ্ডনস্থ সরকারের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন অঞ্চল 'বৃটিশ ক্রাউন কলোনী'; ১৮৬৫ সালে কেপ্‌ কলোনীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে এ অঞ্চল স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হারায়, এর নাম হয় 'সিস্‌-কেই' অঞ্চল। এই অঞ্চলে এক জেলার নাম দেওয়া হয়েছিল 'গ্লেন গ্রে'। এই অঞ্চলের বাসিন্দা খোশাদের তখনো শাসকমহলে 'কাফির' বলেই উল্লেখ করা হত। ১৮৯৪ সালের আইনে ব্যবস্থা হল—(১) এখানে 'কাফির'দের জমি বন্দোবস্ত দেওয়া হবে ব্যক্তিগত স্বত্বে, খাজনার বিনিময়ে; জমি জরীপ ও দলিলপত্র হবে ইউরোপীয় পদ্ধতিতে; সরকারের অনুমতি ছাড়া জমি বিক্রী করা বা বন্ধক দেওয়া চলবে না। এই আইন প্রথমে গ্লেন গ্রে জেলায় প্রবর্তিত হয়েছিল, পরে কেই নদীর দুই তীরেই 'সিস-কেই' এবং 'ট্রান্স-কেই' অঞ্চলের প্রায় সর্বত্র প্রযুক্ত হয়। ভাব দেখানো হয়েছিল যে এই ব্যবস্থা 'কাফির'দের কল্যাণার্থেই করা হচ্ছে। কিন্তু শ্বেতাঙ্গ মালিকরা ও সরকার আফ্রিকানদের জমিগুলো গ্রাস করার পরে যেটুকু জমি পড়েছিল তা এত সামান্য যে ব্যক্তিগত স্বত্বে ৪ একরের বেশি জমি কোন 'কাফির'কে

দেওয়া যায়নি।[১৬] স্মরণ রাখা উচিত যে রোড্‌সের মাশোনাল্যাণ্ড অভিযাত্রীদলের প্রত্যেককে ৬০০০ একর জমি দেওয়া হয়েছিল, এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গ কৃষিকরদের প্রায় প্রত্যেকেই ৬০০০-৮০০০ একর জমির মালিক ছিল।

আফ্রিকানদের জন্য জমি যথেষ্ট ছিল না শুধু তাই নয়। জমি বন্দোবস্ত নিতে হলে জরীপ ও দলিলপত্রের যে খরচা দিতে হত, তা অনেক আফ্রিকানের সাধ্যের অতীত ছিল। জমি বন্দোবস্ত নিয়েও চাষবাস করার সঙ্গতি ছিল খুব কম লোকের। আইনের উদ্দেশ্য এটা ছিল না যে এই অঞ্চলে আফ্রিকানরা চাষবাস করে স্বনির্ভর হয়ে উঠবে। ওই আইনেই একটি ধারা ছিল ভূমিহীন আফ্রিকান যদি বৎসরে অন্ততঃ তিন মাস অন্যত্র (শ্বেতাঙ্গ এলাকায়) কাজ না করে তাহলে তাকে ১০ শিলিঙ 'লেবার-ট্যাক্স' দিতে হবে। আফ্রিকানরা 'অলসভাবে ঘরে বসে' না থেকে যাতে পরিশ্রম করে সেজন্য, তাদের কল্যাণার্থেই নাকি, এই আইন হয়েছিল। জমি যারা পেল, তাদের অবশ্য ভোটের অধিকার হল না।[১৭] সরকারের মনোনীত প্রতিনিধি, সরকারের মনোনীত উপজাতীয় গোষ্ঠীপ্রধান, এবং সবার উপরে সরকারের 'নেটিভ্‌ কমিশনার' কর্তৃক পরিচালিত স্থানীয় পরিষদের ('বুঙ্গা') ব্যবস্থাও এই আইনে ছিল। ১৯৭০-এর দশকে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার যে 'বান্টুস্তান'-পরিকল্পনা নিয়ে চলছে, রোড্‌সের এই 'গ্লেন গ্রে' আইন তার একটি ভিত্তি-প্রস্তর বলা চলে।[১৮]

প্রধানমন্ত্রী রোড্‌সের তৃতীয় কীর্তি পণ্ডোল্যাণ্ড দখল। ট্রান্স-কেই অঞ্চলের উত্তরে কেপ্‌ কলোনী ও নাটালের সীমানার মাঝে এই জায়গাটুকু ছিল খোশা জাতির শেষ স্বাধীন গোষ্ঠীপ্রধানের এলাকা। কার্যতঃ পণ্ডোল্যাণ্ড বৃটিশ কর্তৃত্বের অধীনই ছিল। কিন্তু ওরকম নাম মাত্র স্বাধীনতাও শ্বেতাঙ্গরা বরদাস্ত করতে পারছিল না।

প্রশ্ন হচ্ছিল, এ অঞ্চলটা গ্রাস করবে কোন্‌ রাজ্য—নাটাল অথবা

কেপ্ কলোনী? রোড্স্ করিতকর্মা ব্যক্তি ছিলেন, ১৮৯৩ সালে একটু অজুহাত পাওয়া মাত্রই ছোঁ মেরে পণ্ডোল্যাণ্ড কেপ্ কলোনীর অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন। অজুহাত ছিল, বৃটিশ হাইকমিশনার হেনরী লক্ যখন ওই অঞ্চল পরিভ্রমণ করছিলেন, তখন একজন আফ্রিকান গোষ্ঠীপ্রধান তাঁকে অপমান করেছে। লক্ নাকি এঁর সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন, তিনদিন অপেক্ষা করার পর তবে লক্ এঁর দেখা পান। ১৮৯৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রোড্স্ ১০০ ঘোড়সওয়ার সশস্ত্র পুলিস ও 'ম্যাক্সিম গান' নিয়ে পণ্ডোল্যাণ্ডে ঢুকলেন, ঘোষণা করলেন এই এলাকা কেপ্ কলোনীর সরকারের এলাকা, এবং তারপর ওই অপরাধী গোষ্ঠীপ্রধানকে তলব করলেন। কাহিনী শোনা যায় যে তাঁকে তিনদিন অপেক্ষা করানোর পর রোড্স্ তাঁকে তাঁরই শস্যক্ষেত্রে নিয়ে গিয়ে পাকা ফসলের ওপর ম্যাক্সিম গান চালিয়ে দেখালেন, কেমন মুহূর্তের মধ্যে মাথা-কাটা হয়ে চারাগাছগুলো শুয়ে পড়ল। তারপর রোড্স্ বললেন, "যদি আমাদের বিরক্ত কর তাহলে তুমি এবং তোমার জাতি এইরকম কাটা পড়বে।"[১৯]

॥ পাঁচ ॥

প্রধানমন্ত্রী রোড্সের চতুর্থ কীর্তি কালা-চামড়া মানুষদের নিয়ে নয়, ট্রান্সভালের শাদা-চামড়া বোয়ারদের নিয়ে। রোড্স্ এটায় সফল হননি। এ নিয়ে প্রচণ্ড হৈচৈ হয়েছিল, আন্তর্জাতিক গোলযোগ হয়েছিল। "জেম্সন্-হামলা" নামে চিহ্নিত এই কাণ্ডটি রোড্সের অনুরাগী লেখকরাও ঠিক মনোহর রূপে সাজাতে পারেননি। বিপরীতপক্ষে, এই ব্যাপারে যেসব লেখক রোড্সের প্রতি ঘৃণা বা উষ্মাপ্রকাশ করেছেন—মাটাবেলে, মাশোনা, পণ্ডোঘটিত ব্যাপারে তাঁরা অনেকেই নির্বিকার।

১৮৯০-এর দশকের শুরু থেকেই ট্রান্সভালে ওলন্দাজ-ভাষী বোয়ারদের সঙ্গে ইংরেজী-ভাষী নবাগতদের কলহ দানা বাঁধছিল।

১৮৯০ সালে ট্রান্সভাল সরকার ভোটার-তালিকা থেকে নবাগতদের বাদ রাখার জন্য যে ১৪ বৎসর বসবাসের আইন করেছিল, তা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি।* ১৮৯৪ সালে রোড্সের বৃটিশ সাউথ আফ্রিকা কোম্পানী মাটাবেলেল্যাণ্ড-মাশোনাল্যাণ্ড দখল করার পর ট্রান্সভাল কার্যতঃ তিনদিকে ঘেরা হয়ে গিয়েছিল। পূর্বদিকে পর্তুগীজ পূর্ব আফ্রিকার দেলাগোআ উপসাগর দিয়ে ট্রান্সভাল স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারত। কেপ্ কলোনীর মধ্য দিয়ে যাতায়াত ও সংযোগ রক্ষার পরিবর্তে ট্রান্সভাল সরকার এই দিকেই আগ্রহী হয়েছিল।

স্টেফানুস য়োহানেস্ পাউলুস ক্রুগার—ইংরেজী সংক্ষেপ-উল্লেখে পল ক্রুগার—ট্রান্সভাল সাধারণতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন ১৮৮৩ সালের মে মাসে। ১৯০২ সালের ৩১শে মে বোয়ার-যুদ্ধের অবসান পর্যন্ত পল ক্রুগার ট্রান্সভালের প্রেসিডেন্ট ছিলেন।

বোয়াররা রেললাইন পছন্দ করত না। রেললাইন তাদের কৃষি-অর্থনীতিকে এলোমেলো করে দেবে সে ভাবনা ছিল। তাদের যান-বাহন ছিল ঘোড়ার গাড়ি, বলদ-গাড়ি। সোনার খনি এলাকায় জন-সমাগম ও জিনিসপত্রের চলাচল প্রচুর বৃদ্ধি পাওয়ায় ঘোড়ার গাড়ি, বলদ-গাড়ির মালিক ও চালক বোয়াররা ভালো ব্যবসা করছিল—রেলগাড়ি তাদের সে ব্যবসায়ের মারাত্মক প্রতিদ্বন্দ্বী।[20] তার ওপর, রেললাইন যদি বৃটিশ এলাকা থেকে আসে, এবং ট্রান্সভালের আমদানী-রপ্তানী যদি সেই বৃটিশ রেললাইনের ওপরে নির্ভরশীল হয়ে পড়ে, তাহলে ট্রান্সভাল বোয়ারদের স্বাধীনতা আবার বিপন্ন হয়ে পড়বে, একথা বোয়াররা বুঝতো। ক্রুগার-এর নিজস্ব মনোভাব সাধারণ বোয়ারদের মতোই ছিল।

কিন্তু রেললাইন যে শেষ পর্যন্ত ঠেকিয়ে রাখা যাবে না, তাও

*তৃতীয় অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ২, পৃঃ ৭৬ দ্রষ্টব্য।

বোয়াররা বুঝতো। কেপ্ কলোনী থেকে ট্রান্সভালে স্বর্ণখনি-শহর জোহানেসবার্গ পর্যন্ত রেললাইন বসানোর অনুমতি দেওয়ার আগে পর্তুগীজ পূর্ব আফ্রিকার দেলাগোআ উপসাগরের তীর থেকে প্রিটোরিয়া বা জোহানেসবার্গ পর্যন্ত রেললাইন চালু করে দিতে হবে, —শেষ পর্যন্ত বোয়াররা এটার ওপরেই ঝোঁক দিচ্ছিল। ১৮৭২ সালে ট্রান্সভালের প্রেসিডেন্ট বার্গার দেলাগোআ রেললাইনের জন্য ঋণ চেয়ে পাননি। ১৮৭৬ সালে ইউরোপে গিয়ে হল্যাণ্ডের ধনিকদের কাছ থেকে বার্গার চড়া সুদে ঋণ সংগ্রহ করলেও রেললাইন বসানোর কাজ শুরু করা যায়নি। ১৮৭৭ থেকে ১৮৮০ পর্যন্ত ট্রান্সভাল তো বৃটিশ দখলেই ছিল, এই রেললাইনের কথা তখন ধামাচাপা ছিল। ১৮৮৩ সালে ক্রুগারের সরকার পরিকল্পনাটিকে জরুরী বিবেচনা করে হল্যাণ্ড ও পর্তুগালের কাছে তদ্বির-তাগাদা শুরু করে দিয়েছিল। ১৮৮৩ সালে কেপ্ কলোনী থেকে দ্রুত উত্তর যাত্রার জন্য সিসিল রোড্সের চিৎকার বোয়াররা শুনতে পেয়েছিল।

ট্রান্সভাল-সরকারের প্রতিনিধিরা ১৮৮৩ সালে পর্তুগালের রাজধানী লিসবন্ গিয়ে খবর পেল যে দেলাগোআ উপসাগরের তীর থেকে ট্রান্সভাল-সীমান্ত পর্যন্ত পর্তুগীজ এলাকায় একটা রেললাইন বসাবার জন্য কর্নেল ম্যাক্মুর্ডো নামে এক মার্কিন ভাগ্যান্বেষীকে 'কন্‌সেসন্' বা কণ্ট্রাক্ট দেওয়া হয়েছে। সীমান্ত থেকে প্রিটোরিয়া পর্যন্ত ট্রান্সভালের এলাকায় ২৫০ মাইল রেললাইন বসালেই দেলাগোআ-প্রিটোরিয়া রেলপথ সম্পূর্ণ হবে। ট্রান্সভালের প্রতিনিধিরা হল্যাণ্ডে গিয়ে ট্রান্সভালের ভেতরে এই রেললাইন এবং প্রিটোরিয়া থেকে জোহানেস্‌বার্গ পর্যন্ত রেললাইন বসানোর জন্য ওলন্দাজ ও জার্মান ধনিকদের এক কোম্পানী বানাবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে থাকল। 'নীদারল্যাণ্ডস সাউথ আফ্রিকান রেলওয়ে কোম্পানী' তৈরী হল ১৮৮৭ সালে—ট্রান্সভালে রেললাইন বসানো ও রেলগাড়ি চালানোর যাবতীয় ব্যাপারে একচেটিয়া অধিকার এই কোম্পানীকে দেওয়া হয়।[২১]

ওদিকে কর্নেল ম্যাক্‌মুর্ডো তাঁর রেললাইন বসানোর জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন জোগাড় করতে পারছিলেন না। কোন কোন লেখকের মতে রেললাইন বসানোর কোন মতলবই তাঁর ছিল না, তাঁর কনট্রাক্ট বা 'কনসেসন'-টি অন্যের কাছে চড়া দামে বেচে দিয়ে চটপট কিছু নগদ মুনাফা করে নেওয়াই তাঁর আসল অভিপ্রায় ছিল। ১৮৮৯ সাল পর্যন্ত তাঁর রেললাইন বসানোর কাজ ঠিকমতো শুরু না হওয়ায় পর্তুগীজ সরকার তাঁর সঙ্গে চুক্তি বাতিল করে দিয়ে নিজেরাই রেল-লাইন বসাতে শুরু করে। এ নিয়ে মামলা-মোকদ্দমা হল, ম্যাক্‌মুর্ডো মোটা টাকা ক্ষতিপূরণ দাবী করলেন। নানা ঝামেলার মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত ১৮৯৫ সালে দেলাগোআ থেকে প্রিটোরিয়া হয়ে জোহানেস্‌বার্গ পর্যন্ত রেললাইন সম্পূর্ণ হয়েছিল।

সিসিল রোড্‌স্‌ এই দেলাগোআ রেললাইন বসানোর ব্যাপারে যত রকমে পারা যায় বাধা দিচ্ছিলেন। আরেকদিকে তিনি আবার পর্তুগীজদের কাছ থেকে গোটা দেলাগোআ অঞ্চলটাই কিনে নেবার চেষ্টাও করছিলেন। ম্যাকমুর্ডোর মামলাতেও তিনি নাক ঢুকিয়েছিলেন, এবং ১৮৮৯ সালে ম্যাক্‌মুর্ডোর মৃত্যুর পর তাঁর বিধবা স্ত্রীর তরফে যিনি মামলার তদ্বির করছিলেন তাঁকে ৩০০০ পাউণ্ড ঘুষও দিয়েছিলেন।[২২] কিন্তু ট্রান্সভাল ও দেলাগোআর মধু ইতিমধ্যে জার্মানদের আকৃষ্ট করেছিল। রোড্‌সের এসব কাজকর্মে জার্মান সরকার বৃটিশ সরকারের কাছে তীব্র আপত্তি জানায়। ১৮৯৪ সালে পর্তুগীজ এলাকায় একটা জায়গায় আদিবাসীরা বিদ্রোহ করে। জার্মানদের সন্দেহ হয়েছিল এই বিদ্রোহ রোড্‌স্‌ বাধিয়েছেন এবং বৃটিশ সরকার তাঁর পেছনে রয়েছে। বৃটিশ বাসিন্দাদের রক্ষা করার অছিলায় বৃটিশ সরকার দেলাগোআ উপসাগরে একটি 'গানবোট' পাঠালে, জার্মান সরকার দুটি 'গানবোট' পাঠিয়ে বৃটিশ সরকারকে জবাব দিল। সে সময়ে বৃটেন জার্মানীকে চটাতে পারছিল না।

রোড্‌স্‌কে সংযত হতে হল।[২৩] এই নিয়ে রোড্‌স্‌ লণ্ডনের সরকারী কর্তাদের ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন।

ইতিপূর্বেও বৃটিশ সরকারের জার্মানী-তোষণ-নীতির বিরুদ্ধে রোড্‌সের তীব্র অসন্তোষ ব্যক্ত হয়েছিল। ১৮৮৪ সালে বৃটিশ সরকার জার্মানদের দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা দখল করতে দিয়েছিল। ১৮৯০ সালে বৃটিশ-জার্মান চুক্তির সময় জার্মান দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার উত্তর-পূর্ব কোণে সাপের গলা ও মাথার আকৃতির একটা ফালি জায়গা জার্মান এলাকা বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল। তদানীন্তন জার্মান চান্সেলরের নামে এই ফালিটার নাম হয়েছিল 'কাপ্রিভি ফালি' (জার্মান ভাষায় 'কাপ্রিভি ৎসিপ্‌ফেল্‌', ইংরেজীতে 'কাপ্রিভি স্ট্রিপ্‌')। এই জায়গাটা দিয়ে জার্মানরা সরাসরি উত্তর রোডেশিয়ার দক্ষিণে জাম্বেসি নদী পর্যন্ত পৌঁছেছিল। বেচুয়ানাল্যাণ্ড থেকে সোজা উত্তর-দিকে যাত্রাপথের মাঝখানে এই জার্মান এলাকা রোড্‌সের চোখে একটা বিষাক্ত সরীসৃপের দীর্ঘ-প্রসারিত জিহ্বার মতো দেখাচ্ছিল। কেপ্‌ কলোনীর প্রধানমন্ত্রী হিসাবে রোড্‌স্‌ লণ্ডনে এই নিয়ে প্রচণ্ড প্রতিবাদ করেছিলেন। জার্মানরা ওদিকে পূর্ব-আফ্রিকায় টাঙ্গানিকাও দখল করেছিল ১৮৮৪ সালে। সেখান থেকে উত্তরে ও পশ্চিমে উগাণ্ডা ও কঙ্গোর দিকে তারা যেমন এগোবার চেষ্টা করছিল, তেমনি দক্ষিণদিকে উত্তর রোডেশিয়া নিয়াসাল্যাণ্ড অভিমুখেও তারা এগোবার চেষ্টা করছিল। দেলাগোআ উপসাগর দিয়ে পর্তুগীজ পূর্ব-আফ্রিকায় অনুপ্রবেশ এবং সেখান থেকে ট্রান্সভালে প্রবেশ করার কল্পনাও তাদের ছিল। ট্রান্সভালের বোয়াররা জার্মানদের স্বজাতি মনে করত, এবং বৃটিশের বিরুদ্ধে জার্মানদের সাহায্য সমর্থন চাইত।

ট্রান্সভালে জার্মান ব্যবসাদার, সওদাগর, ব্যাঙ্কার ও শিল্পপতিদের আনাগোনা হচ্ছিল খুব। ট্রান্সভালের ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক জার্মানরা নিয়ন্ত্রণ করত। খনিশিল্পের জন্য ডিনামাইট দরকার—ট্রান্সভাল সরকার ডিনামাইট-ব্যবসার একচেটিয়া অধিকার জার্মানদের দিয়ে

দিয়েছিল। খনি ও আধুনিক শিল্পের সঙ্গে মদের ব্যবসা প্রায় অবিচ্ছেদ্য—ট্রান্সভালে হুইস্‌কি'র ব্যবসাও জার্মানদের একচেটিয়া ছিল। সোনার খনি এলাকার শহর জোহানেস্‌বার্গে কয়েক হাজার জার্মান ঘোরাঘুরি করছিল। ক্রুপ্‌স্‌, সীমেন্স প্রভৃতি বড় বড় জার্মান কোম্পানী জোহানেস্‌বার্গে অফিস খুলে বসেছিল। ১৮৮৯ থেকে ১৮৯৪ সালের পাঁচ বছরের মধ্যে জার্মানী থেকে ট্রান্সভালে রপ্তানী-বাণিজ্য পাঁচগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ১৮৯৫ সাল নাগাদ ট্রান্সভালে লগ্নী বিদেশী মূলধনের অধিকাংশটা বৃটিশ হলেও, পাঁচভাগের একভাগ ছিল জার্মান।[২৪] প্রেসিডেন্ট ক্রুগার সরকারী উচ্চপদে ক্রমাগত জার্মান ও ওলন্দাজদের নিয়োগ করছিলেন। ইংরেজদের পক্ষে ক্রুগার-রাজ অসহ্য মনে হচ্ছিল।

। ছয় ।

রোড্‌স্‌ চাইছিলেন বৃটিশ-সরকার ট্রান্সভাল দখল করুক। বৃটিশ সরকার চাইছিলেন ট্রান্সভাল বৃটিশ অধিকারে আসুক, কিন্তু সেজন্য বৃটিশ সেনাবাহিনী যেন পাঠাতে না হয়, সরকারী তহবিল থেকে যেন অর্থব্যয় করতে না হয়, এবং জার্মানরা যেন আপত্তি করার ভিত্তি খুঁজে না পায়। ১৮৯৫ সালের জানুয়ারী মাসে জার্মান সম্রাটের জন্মদিনে প্রিটোরিয়ার জার্মান বাসিন্দাদের এক সভায় প্রেসিডেন্ট ক্রুগার যে বক্তৃতা দিলেন, তাতে জার্মানীর সঙ্গে ট্রান্সভালের আরো ঘনিষ্ঠ সংযোগের আশা ব্যক্ত করা হল। বৃটিশ সরকারের ধারণা হল যে ট্রান্সভাল শীঘ্রই জার্মান রক্ষণাধীন অঞ্চল (প্রোটেক্টোরেট) বলে ঘোষিত হবে। বৃটিশ সংবাদপত্রগুলোয় ক্রুগারের বক্তৃতা নিয়ে উত্তেজিত অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়। বৃটিশ সরকার জার্মান সরকারকে মৃদুভাবে জানাল যে ট্রান্সভাল বৃটিশ ছত্রচ্ছায়াধীন রাষ্ট্র, বৃটিশ সরকারের অনুমতি ছাড়া অপর কোন রাষ্ট্রের সঙ্গে কোন কূটনৈতিক বন্দোবস্ত করার অধিকার তার নেই। জার্মানরা বলল, বৃটেন

যদি ট্রান্সভালকে গ্রাস করার চেষ্টা করে তাহলে জার্মানী বাধা দেবে।

ট্রান্সভালের ভেতরে রোড্‌স্ 'ন্যাশনাল ইউনিয়ন' নামে ইংরেজী-ভাষী নবাগতদের এক সংগঠন বানিয়েছিলেন। এরা ট্রান্সভাল সরকারের বিরুদ্ধে একাধিকবার বিক্ষোভ প্রদর্শন করে; প্রেসিডেন্ট ক্রুগার এদের হাতে দুইবার লাঞ্ছিত হন। রোড্‌স্-এর পরিকল্পনা ছিল ট্রান্সভালে এদের দিয়ে গোলমাল বাধিয়ে বৃটিশ সরকার কর্তৃক হস্তক্ষেপের ক্ষেত্র তৈরী করা। কিন্তু বৃটিশ সরকার ওভাবে প্রকাশ্য ও প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে নারাজ দেখে তাঁকে অন্য পরিকল্পনা করতে হল। তাঁর বিশ্বস্ত অনুচর ডক্টর জেমসন ১৮৯৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জানালেন যে রোড্‌স্ অবিলম্বে কিছু একটা ব্যবস্থা না করলে 'নবাগত'রা নিজেরাই নিজেদের ব্যবস্থা করে নেবে বলছে।[২৫]

এবার যা পরিকল্পনা হল, তাকে ষড়যন্ত্র বলাই উচিত। ব্যবস্থা হল, ট্রান্সভালের ভেতরে নবাগতদের ন্যাশনাল ইউনিয়ন ক্রুগার-সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভ্যুত্থান করবে; তাদের সাহায্য করার জন্য, খনি-এলাকায় শান্তি রক্ষার অজুহাতে ডক্টর জেমসন বৃটিশ সাউথ আফ্রিকা কোম্পানীর সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে জোহানেস্‌বার্গে ঢুকে পড়বেন। ইতিমধ্যে লণ্ডনে দরবার করে রোড্‌স্ বেচুয়ানাল্যাণ্ডকে বৃটিশ সাউথ আফ্রিকা কোম্পানীর এলাকা করে নিয়েছিলেন, এবং জেমসনকে বেচুয়ানাল্যাণ্ডের প্রশাসক নিয়োগ করেছিলেন। জেমসন ট্রান্সভালে ঢুকবার জন্য বেচুয়ানাল্যাণ্ড-ট্রান্সভাল সীমান্তে সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। জোহানেস্‌বার্গে 'নবাগত'দের জন্য ৩০০০ রাইফেল ও কার্তুজ পাঠানো হয়েছিল।

'নবাগত'দের অভ্যুত্থান কিন্তু কেবলই মুলতুবী রাখা হচ্ছিল। ওদিকে জেমসনের বাহিনীর খবর ট্রান্সভাল সরকার এবং আরো অনেকে জেনে ফেলেছিল। ২৯শে ডিসেম্বর তারিখে ডক্টর জেমসন আর অপেক্ষা না করে ট্রান্সভালে ঢুকে পড়ে জোহানেস্‌বার্গের

দিকে এগোতে থাকেন। রোড্স্ ২৮শে ডিসেম্বর তাঁকে টেলিগ্রাম করেছিলেন—পরিকল্পনা বাতিল বলে। সে টেলিগ্রাম পৌঁছবার আগেই জেমসন রওনা হয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর সঙ্গে প্রায় এক হাজার লোক, রাইফেল, একটা কামান, ছয়টা ম্যাক্সিম-গান।

জোহানেস্বার্গে নবাগতদের অভ্যুত্থান হল না—বাক্সবন্দী অবস্থাতেই ৩০০০ রাইফেল সরকার কেড়ে নিল। জোহানেস্বার্গ থেকে বিশ মাইল দূরে জেমসনের বাহিনীকে বোয়ার-বাহিনী ঘিরে ফেলল। সামান্য একটু ধাক্কাধাক্কির পর ১৮৯৬ সালের ২রা জানুয়ারী জেমসনের বাহিনী বোয়ারদের কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হল। তাদের বন্দী করে প্রিটোরিয়া জেলে নিয়ে যাওয়া হল।

ইতিমধ্যে লণ্ডন-প্যারিস-বার্লিন-আমস্টার্ডাম সর্বত্র প্রচণ্ড তোলপাড় হচ্ছিল। বৃটিশ সরকারের লজ্জা ঢাকার জায়গা রইল না। রোড্সের সমস্ত প্রভাব-প্রতিপত্তি চূর্ণবিচূর্ণ। কেপ্ কলোনীর মন্ত্রিসভার ও পার্লামেণ্টের বোয়ার সদস্যদের চাপে রোড্স্ ৩১শে ডিসেম্বর তারিখেই কেপ্ কলোনীর প্রধানমন্ত্রীর পদে ইস্তফা দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিছুদিন পরে তাঁকে বৃটিশ সাউথ আফ্রিকা কোম্পানীর বোর্ড অব্ ডিরেক্টরস্ থেকেও পদত্যাগ করতে হয়, যদিও কোম্পানীর পরিচালনা-ভার কার্যতঃ তাঁর হাতেই রয়ে গেল। কিন্তু কেপ্ কলোনী-ট্রান্সভালে রোড্সের খেলা শেষ হয়ে গেল। কার্যতঃ তিনি রোডেশিয়াবাসী হয়ে গেলেন। সেখানে ১৮৯৭ সালে মাটাবেলে ও মাশোনাদের আবার অভ্যুত্থান হয়েছিল। এই বিদ্রোহের মীমাংসা করে রোড্স্ তাঁর হৃত মর্যাদা আবার অনেকটা উদ্ধার করেছিলেন। তবুও, জেমসন-হামলা রোড্সের কাল হয়েছিল।

॥ সাত ॥

জেমসন-হামলার ব্যাপারে বৃটিশ সরকার দায়িত্ব অস্বীকার করলেও, এবং জেমসন ও তাঁর সহযোগীদের নিন্দা করলেও, সমস্ত

ব্যাপারটা বৃটিশ সরকারের জ্ঞাতসারে ও গোপন সমর্থনেই হয়েছিল। জার্মানী, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, সর্বত্র বৃটিশ সরকারের প্রচুর নিন্দাবাদ হচ্ছিল। প্রিটোরিয়ার জার্মানরা জেমসন-অভিযানের শুরুতেই ট্রান্সভালের রক্ষার্থে জার্মানীর হস্তক্ষেপের জন্য আবেদন জানিয়েছিল, এবং জার্মান সরকার দেলাগোআ উপসাগরে এক যুদ্ধজাহাজও রওনা করিয়ে দিয়েছিলেন। জেমসন-বাহিনীর আত্মসমর্পণের সংবাদ পেয়ে জার্মান সম্রাট প্রেসিডেণ্ট ক্রুগার-এর কাছে এক টেলিগ্রাম পাঠিয়ে অভিনন্দন জানিয়ে বললেন--অপর কোন রাষ্ট্রের সাহায্য ছাড়াই ট্রান্সভাল আক্রমণকারীদের এত শীঘ্র পরাস্ত করেছে সেটা খুব আনন্দের বিষয়; ট্রান্সভালকে সাহায্য করার মতো রাষ্ট্র প্রস্তুত ছিল।

জার্মান সম্রাটের এই টেলিগ্রাম বৃটেনের সংবাদপত্রগুলোয় ও সরকারী মহলে প্রচণ্ড বিক্ষোভ সৃষ্টি করেছিল। বৃটিশ উপনিবেশ দপ্তরের মন্ত্রী জোসেফ চেম্বারলেন প্রধানমন্ত্রী লর্ড সলসবেরিকে লিখলেন, আর সহ্য হয় না, "আমাদের বহু শত্রুর মধ্যে যে কোন একটাকে—সে যেটাই হোক্—রুখে দাঁড়ান উচিত।"[২৬] ফেব্রুয়ারী মাসে 'স্যাটারডে রিভিউ' পত্রিকায় এক প্রবন্ধের শেষে লেখা হল "Germania est Delenda"—'জার্মানীর ধ্বংসসাধন অবশ্যকর্তব্য'। প্রাচীন কার্থেজ-এর বিরুদ্ধে প্রাচীন রোম সাম্রাজ্যের প্রবক্তা কেটো প্রায়ই বলতেন "Delenda est Carthago", "কার্থেজের ধ্বংসসাধন অবশ্যকর্তব্য", সেই বহুশ্রুত উক্তির আধুনিক সংস্করণ হল এটা।

জার্মানী বৃটেনের বিরুদ্ধে রাশিয়া ও ফ্রান্সকে টেনে নিয়ে এক 'কন্টিনেন্টাল লীগ' গঠনের প্রস্তাব করছিল। বৃটেন জার্মানীর বিরুদ্ধে ফ্রান্স ও রাশিয়াকে একজোট করার চেষ্টা করছিল। এসব কূটনীতির খেলার মধ্যে জেমসন-হামলা একটা অন্যতম উপলক্ষ হয়েছিল। আসলে বৃটেন বা জার্মানী কোন পক্ষই যুদ্ধ চাইছিল না, পরস্পরের ওপর চাপ এবং পাল্টা চাপ সৃষ্টির খেলা চলছিল। তবুও কয়েকটা দিন খুব উত্তেজনা এবং উদ্বেগ সৃষ্টি হয়েছিল। ইথিওপিয়ায় ইটালীর

অভিযান এ সময়ে দারুণ মার খাচ্ছিল, ইটালীকে সাহায্য করার জন্য জার্মানী বৃটেনের সঙ্গে খাতির পুনরুদ্ধার করতে বাধ্য হল। বৃটিশবিরোধী কন্টিনেন্টাল লীগ গঠনের চেষ্টা শেষ হল।[২৭]

জেমসনের হামলা পরাস্ত করে ট্রান্সভাল শান্তি পেল না। 'নবাগত'রা প্রথমটা দমে গেলেও অল্পকালের মধ্যেই তাদের অসন্তোষ আবার গুরুতর আকার ধারণ করল। ১৮৯৫ সালেই তারা ট্রান্সভালে খনি-অঞ্চলে শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীদের শতকরা ৭০ ভাগের বেশি। এতগুলো মানুষের অসন্তোষ নিয়ে কোন রাষ্ট্রই শান্তি পায় না।

১৮৯৮ সালে বৃটিশ-জার্মান চুক্তি অনুসারে পর্তুগীজ সাম্রাজ্যের ভাগ পাবার আশায় জার্মানী ট্রান্সভাল ও দেলাগোআ উপসাগর অঞ্চলকে বৃটিশ প্রভাবাধীন এলাকা বলে স্বীকার করে নিয়েছিল। এ অঞ্চলে বৃটেনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মতো আর কোন রাষ্ট্র ছিল না। ফলে, ট্রান্সভাল বৃটেনের মুখে সহায়হীন শিকারের মতো পড়েছিল।

১৮৯৯ সালের এপ্রিল মাসে ট্রান্সভালের কয়েক সহস্র ইংরেজী-ভাষী নবাগতের স্বাক্ষর করা এক গণদরখাস্ত বৃটিশ সরকারের কাছে পৌঁছল। বোয়ারদের অত্যাচার, নবাগতদের বিরুদ্ধে অন্যায় বৈষম্য-মূলক ব্যবস্থা, বৃটিশ আমদানী সামগ্রীর ওপর চড়া শুল্ক, ওলন্দাজ ভাষা ব্যবহারের বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা ইত্যাদি অনেক অভিযোগ জানিয়ে বৃটিশ সরকারের হস্তক্ষেপ প্রার্থনা করা হয়েছিল। ক্রুগারের সঙ্গে কয়েক মাস ধরে দর-কষাকষির পর সেপ্টেম্বর মাসে বৃটিশ সরকার কার্যতঃ এক চরমপত্র দিলেন, সৈন্য সমাবেশ শুরু করলেন। ক্রুগার সীমান্ত থেকে বৃটিশ সৈন্য সরিয়ে নিতে বলে চরমপত্র দিলেন ৯ই অক্টোবর। বৃটিশ সরকারও একটা চরমপত্র রচনা করছিলেন, কিন্তু সেটা আর পাঠাতে হল না। ট্রান্সভাল-সরকার বৃটিশ আক্রমণের অপেক্ষায় না থেকে ১১ই অক্টোবর নাটাল-সীমান্ত অতিক্রম করে যুদ্ধ শুরু করল।[২৮] বোয়ার-যুদ্ধ শুরু হল। বৃটেনের এটা

'দ্বিতীয় বোয়ার যুদ্ধ', কিন্তু ইতিহাসে 'বোয়ার-যুদ্ধ' নামে এটাই পরিচিত হয়ে আছে।

প্রথম আক্রমণ করে বোয়াররা সুবিধা পেয়ে গিয়েছিল। বৃটেনের সামরিক শক্তি বিপুল হলেও যুদ্ধের প্রথম দিকে বৃটিশপক্ষে মোট ২৫ হাজারের মতো সৈন্য প্রস্তুত ছিল, তার মধ্যে অর্ধেকই কেপ্ কলোনী ও নাটাল থেকে সংগৃহীত স্বেচ্ছা-সৈন্য। শেষ পর্যন্ত বৃটিশ সরকার ২ লক্ষ সৈন্য নামিয়েছিল, এবং সবরকম লোক নিয়ে বৃটিশ বাহিনীর মোট সংখ্যা হয়েছিল ৪ লক্ষ ৪৮ হাজার। বোয়ার-পক্ষে ৮০ হাজার সশস্ত্র লোক ছিল, এবং ৫০ হাজার লোক প্রথম থেকেই যুদ্ধ-ক্ষেত্রে নামানো হয়েছিল। বোয়ার-পক্ষে ২০০০ ইউরোপীয় স্বেচ্ছা সৈন্য বা ভাড়াটে সৈন্যও ছিল।[২৯]

বোয়াররা প্রথমদিকে পরপর কয়েকটা যুদ্ধে জয়লাভ করে। বৃটিশ বাহিনী ক্রমাগত হারছিল। তখন ইউরোপে এবং অন্যান্য দেশে বৃটিশ সামরিক শক্তিকে অনেকে 'তুয়ো' দিচ্ছিল। ক্ষুদ্র বোয়ার জাতির কাছে অতিকায় বৃটিশ শক্তির পরাজয়ে উৎফুল্ল হয়েছিল অনেকে, বোয়াররা খুব বাহবা পাচ্ছিল। বৃটিশ বাহিনী পুরোপুরি যুদ্ধে নামার পর অবশ্য বোয়ারদের পরাজয়ের পালা শুরু হল। ১৯০০ সালের গোড়াতে বৃটিশ বাহিনীর অধিনায়ক হয়ে এলেন লর্ড রবার্টস এবং তাঁর সহকারী হয়ে এলেন খার্তুম-বিজয়ী লর্ড কিচেনার, শিখ বাহিনীর অধিনায়ক হিসাবে যিনি ইতিমধ্যে 'সর্দার' আখ্যা লাভ করেছিলেন। ১৯০০ সালের মে মাসে অরেঞ্জ ফ্রি স্টেট ও জোহানেস্-বার্গ দখল করে লর্ড রবার্টস জুন মাসের ৫ই তারিখে প্রিটোরিয়া প্রবেশ করেন। অগস্ট মাসে প্রেসিডেন্ট ক্রুগার ট্রান্সভাল ছেড়ে লরেন্সো মার্কোয়েস-এর পর্তুগীজ বন্দর থেকে ইউরোপ রওনা হয়ে গেলেন সাহায্য প্রার্থনা করতে। কেউ সাহায্য করল না, যুদ্ধ-বিরতির জন্য আলোচনাই হতে থাকল। সেপ্টেম্বর মাসে গোটা ট্রান্সভাল বৃটিশ রাজ্য বলে ঘোষিত হল।

এইখানে যুদ্ধ শেষ হবার কথা। কিন্তু তা হয়নি। ১৯০২ সালের ৩১শে মে তারিখ পর্যন্ত বোয়ারদের খণ্ড খণ্ড দলগুলো এক ধরনের গ্যেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে যায়। পাহাড়-জঙ্গলের আশ্রয়ে থেকে অতর্কিত আক্রমণের এই ধরনের যুদ্ধে যেসব বোয়ার জেনারেলরা খ্যাতি অর্জন করেন তাঁদের মধ্যে বোথা, ডি ভেট্, ডি লা রেই, হার্টৎসগ্ এবং স্মাট্স্ উল্লেখযোগ্য।

১৯০০ সালের অক্টোবর মাসে ট্রান্সভালের প্রধান শহরগুলি ও রেললাইন দখল করার পর লর্ড রবার্টস যুদ্ধ কার্যতঃ শেষ হয়েছে বিবেচনা করে দেশে ফিরে গিয়েছিলেন। বোয়ার গ্যেরিলাদের সঙ্গে মোকাবিলা করার ভার পড়েছিল লর্ড কিচেনার-এর ওপর। বোয়ারদের অতর্কিত আক্রমণে বৃটিশ-বাহিনী বারবার নাজেহাল হবার পর ১৯০১ সালের গোড়ার দিকে লর্ড কিচেনার যুদ্ধ ও প্রশাসনের কায়দা বদলালেন। যেসব বিস্তীর্ণ প্রান্তর দিয়ে বোয়ারদের চলাচল ছিল সেগুলোতে কাঁটা তারের বেড়া দেওয়া হল, কিছুদূর পরপর সামরিক গুমটি বা সশস্ত্র ফাঁড়ি বসানো হল; শেষ পর্যন্ত প্রতি ২০০ গজ অন্তর এরকম একটা ফাঁড়ি বসানো হয়। বোয়ার গ্যেরিলারা বোয়ার-খামারবাড়িতে আশ্রয় ও রসদ পেত বলে এরপর বোয়ার খামারবাড়িগুলো জ্বালিয়ে দেওয়া হয় এবং সমস্ত গরু মহিষ ভেড়া এবং খাদ্যসামগ্রী ও শস্য বাজেয়াপ্ত করা হয়। খামারবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়ার পর নিরাশ্রয় বোয়ার মেয়েদের ও শিশুদের আশ্রয়শিবিরে নিয়ে যাওয়া হয়। বোয়াররা এই আশ্রয়শিবিরগুলোকে বন্দীশিবির বলত, পরবর্তীকালে 'কনসেনট্রেশন ক্যাম্প'ও বলা হয়েছে। এসব শিবিরে দারুণ অব্যবস্থা ছিল এবং অত্যাচারও ছিল। অর্ধাহার, অনাহার, রোগ শোক দুঃখে এসব শিবিরে মড়ক লেগেছিল। একটা হিসেবে দেখা যায়, বোয়ারদের ১৬ হাজার শিশু ও ৪ হাজার নারী এভাবে প্রাণ হারায়।[২০] বৃটেনের খুব বদনাম হয়। বৃটেনেও বেশ কিছু লোক কিচেনার-এর অমানুষিক যুদ্ধকৌশলের তীব্র নিন্দা

করে। বৃটিশ লিবারাল পার্টি তখন সরকারের বিরোধী পক্ষ, তাঁরা অনেকে কনসার্ভেটিভ পার্টি সরকারের বিরুদ্ধে প্রচারে এই নিয়ে আলোড়ন সৃষ্টি করার চেষ্টা করেন। ১৯০১ সালের জুলাই মাস থেকে আশ্রয়শিবির বা আটক-শিবিরগুলোর অবস্থার কিছু উন্নতি বিধান হতে থাকে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে শ্বেতাঙ্গ বোয়ার নারীশিশুদের আটক-শিবিরে দুর্দশা রোগভোগ ও মৃত্যু নিয়ে যে আলোড়ন হচ্ছিল তার মধ্যে কালোচামড়া মানুষ বা নারীশিশুর উল্লেখ হতো না। উভয়-পক্ষেই সৈন্যবাহিনীর পার্শ্বচর বা অনুচর ভারবাহী ভৃত্য হিসাবে কালোচামড়া মানুষদের নিয়োগ করা হয়েছিল, শারীরিক পরিশ্রমের অনেক কাজ তারাই করত। তারাও হাজারে হাজারে নিহত হয়, আহত হয় এবং বন্দী হয়। এদের কোন সঠিক হিসেব পাওয়া যায় না, এবং বোয়াররা তাদের কৃষ্ণকায় বন্দীদের প্রতি কি আচরণ করত, তার কোন বিবরণ দেখা যায় না। কিন্তু এমিলি হব্‌হাউস তাঁর এক বইয়ে উল্লেখ করেছিলেন যে ১৯০১ সালের অক্টোবর মাসে বৃটিশ বন্দী-শিবিরে ৪৩,৮১৩ জন বর্ণসঙ্কর বা বাদামীচামড়া মানুষ আটক ছিল, এবং আফ্রিকান বন্দীদের জন্য যে পৃথক্ শ্রম-শিবির ('লেবার ক্যাম্প') করা হয়েছিল সেগুলোয় ৩২,০০৬ জন আফ্রিকান আটক ছিল।[৩১] একটা হিসেবে দেখা যায়, বৃটিশ আটক-শিবিরে মোট ৮০ হাজার অ-শ্বেতাঙ্গ আটক ছিল, এবং তাদের দুর্দশা ও মৃত্যুহার বোয়ারদের তুলনায় বেশি বৈ কম ছিল না।[৩২]

আরেকটা হিসেবে দেখা যায়, শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর হবার পর বৃটিশ বন্দীশিবিরে ৩২ হাজার বোয়ার পুরুষ ছিল, আটক-শিবিরে আটক বোয়ার নারী পুরুষ শিশুর সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ১০ হাজার, এবং পৃথক্ আটক-শিবিরে আটক 'নেটিভ' আফ্রিকান ও মিশ্রবর্ণের মানুষের সংখ্যা ছিল প্রায় ১ লক্ষ।[৩৩]

১৯০২ সাল নাগাদ বোয়ারদের শক্তি নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল।

ইতিমধ্যে তাদের মধ্যে অনেকরকম মতভেদ ও দলাদলিও দেখা দিয়েছিল। কোন কোন দল পরাজয় স্বীকার করে আত্মসমর্পণ করেছিল। কোন কোন দল শান্তির জন্য বৃটিশ সরকারের সঙ্গে শর্ত আলোচনা শুরু করেছিল। মরিয়া অবুঝদের বোঝাবার জন্য কোন কোন দল বৃটিশ তরফের দালালী শুরু করেছিল। আবার, অনেকেরই কথা ছিল যে কিছুতেই পরাজয় স্বীকার করা চলবে না।

১৯০২ সালের এপ্রিল মাসে বোয়াররা শান্তি ভিক্ষা করতে বাধ্য হল। বৃটিশ তরফ থেকে তাদের কিছু আশ্বাসও দেওয়া হয়েছিল। ৩১শে মে তারিখে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হল। শান্তিচুক্তি অনুসারে বোয়াররা নিজেদের বৃটিশরাজ সপ্তম এডোয়ার্ড-এর প্রজা বলে স্বীকার করল।*

ট্রান্সভাল ও অরেঞ্জ প্রদেশ বৃটিশ কলোনী হয়ে গেল, এবং স্কুলে আদালতে ইংরেজী ভাষার ব্যবহার বোয়াররা মেনে নিতে বাধ্য হল; শ্বেতাঙ্গদের সকলের সমান ভোটাধিকার হল, 'নবাগত'দের সম্বন্ধে বৈষম্যমূলক আইন বাতিল হল। বিনিময়ে বৃটিশ সরকার প্রতিশ্রুতি দিলেন, (১) অল্প কয়েকজন ছাড়া সমস্ত বন্দী বোয়ারদের মুক্তি দেওয়া হবে এবং অপরাধ মকুব ('অ্যামনেস্টি') করা হবে; (২) বোয়ারদের ধ্বংস-হয়ে-যাওয়া খামারবাড়ি ও চাষবাস আবার চালু করার জন্য বৃটেন দানস্বরূপ ৩০ লক্ষ পাউণ্ড দেবে (বোয়ারদের মাথা-পিছু প্রায় ২৫ পাউণ্ড); (৩) জমির ওপর কোন বিশেষ কর বসানো হবে না; (৪) যথাশীঘ্র সম্ভব ট্রান্সভাল ও অরেঞ্জ প্রদেশে শ্বেতাঙ্গ ভোটের ভিত্তিতে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হবে; (৫) শ্বেতাঙ্গ স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার পূর্বে বৃটিশ সরকার কালোচামড়া মানুষদের ভোটাধিকার দেবে না।

পাঁচ নম্বর প্রতিশ্রুতিটির ফলাফল দক্ষিণ আফ্রিকার পরবর্তী ইতিহাসের পক্ষে ভয়ানক হয়েছিল; কালোচামড়া মানুষদের অধি-

*১৯০১ সালের ২২শে জানুয়ারী মহারানী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু হয়

কারের নিয়ন্তা করা হয়েছিল দক্ষিণ আফ্রিকার শাদাচামড়া লোককে, এবং ভোটার-তালিকায় কালোচামড়া মানুষের প্রবেশ নিষেধ করার রাস্তা করে দেওয়া হয়েছিল। যুদ্ধের সময় বৃটিশ সরকার কালো-চামড়া বাদামী-চামড়া মানুষদের প্রতি বোয়ারদের বর্ণবিদ্বেষ ও অত্যাচারের বিষয়টিকে যুদ্ধের একটা কারণ বলে খুব জাহির করেছিল। এসব অন্যায়ের প্রতিবিধান করা বৃটিশ সরকারের লক্ষ্য বলেও ঘোষণা করা হয়েছিল। যুদ্ধশেষে বৃটিশে বোয়ারে মিলন হল কালো-বাদামী মানুষদের বিরুদ্ধে। এই শান্তিচুক্তি কৃষ্ণকায় মানুষদের কাছে বৃটেনের নির্লজ্জ বিশ্বাসঘাতকতার বিকট দৃষ্টান্ত হয়ে আছে।[৩৪]

যুদ্ধ শেষ হওয়ার অল্প কিছুদিন আগে ১৯০২ সালের ২৬শে মার্চ তারিখে সিসিল রোড্‌সের মৃত্যু হয়। পল ক্রুগার ১৯০০ সালের অগস্ট মাসে হল্যাণ্ডে চলে গিয়েছিলেন, সেখান থেকে কিছুকাল পরে সুইজার্ল্যাণ্ডে চলে যান। ক্রুগার আর দেশে ফেরেননি। ১৯০৪ সালের জুলাই মাসে সুইজার্ল্যাণ্ডে ক্রুগারের মৃত্যু হয়। তাঁর শবদেহ দক্ষিণ আফ্রিকায় নিয়ে আসা হয়েছিল। ক্রুগারের শবযাত্রা বোয়ার জাতীয়তাবাদের পুনঃপ্রকাশের একটা উপলক্ষ হয়েছিল।

দক্ষিণ আফ্রিকায় রোড্‌স্‌ ও ক্রুগারের যুগ, ভিক্টোরিয়ার যুগ এবং উনবিংশ শতাব্দী এইভাবে সমাপ্ত হল।

ষষ্ঠ অধ্যায়

'গিরমিটিয়া', গান্ধী, সত্যাগ্রহ

॥ এক ॥

নাটালে আখের ক্ষেতে কাজ করার জন্য ১৮৫৯ সালে ভারতবর্ষ থেকে 'চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক' ('ইন্‌ডেন্‌চার্ড লেবার') আমদানী শুরু হয়, সেকথা আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি।* বোয়ারযুদ্ধের পূর্বেই এই ভারতীয়রা শ্বেতাঙ্গদের চোখে একটা বিপজ্জনক সমস্যা হয়ে উঠেছিল।

চুক্তিবদ্ধ শ্রমিকদের শ্বেতাঙ্গরা বলত 'কুলী'। চুক্তির ইংরেজী 'এগ্রিমেণ্ট'; ওই শব্দটা ভারতীয় শ্রমিক-সাধারণের উচ্চারণে হয়েছিল 'গিরমিট'; তাই থেকে এই শ্রমিকরা নিজেদের বলত 'গিরমিটিয়া'। ১৮৬০ সাল নাগাদ নাটালের আখক্ষেতে ৬৫০০ 'গিরমিটিয়া' কাজ করছিল, এবং প্রতি বৎসর ২০০০ করে নতুন 'গিরমিটিয়া' আমদানী হচ্ছিল।

এরা আসছিল প্রধানতঃ তখনকার মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর তামিল-তেলেগুভাষী অঞ্চল থেকে। মালাবার অঞ্চল থেকে, বিহার-বাঙলা ও উত্তর প্রদেশের দরিদ্রতম অঞ্চলগুলো থেকেও অনেকে আসছিল। প্রথমদিকে কলকাতা বন্দর থেকেই বেশি আসত, পরে মাদ্রাজ বন্দর থেকে বেশি।

বৃটিশ-শাসনের মহিমায় তখনকার ভারতবর্ষে প্রায় প্রতি বৎসরই কোন না কোন অঞ্চলে দারুণ খাদ্যাভাব ও দুর্ভিক্ষ হতো। ১৮৫৩-৫৫ সালে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে, ১৮৬২ সালে গোটা দাক্ষিণাত্যে, ১৮৬৬-৬৭ সালে বাঙলা-বিহার-উড়িষ্যায়, ১৮৬৮-৬৯ সালে পাঞ্জাব-রাজ-পুতানায়, ১৮৭৩-৭৪ সালে বাঙলা-বিহারে, ১৮৭৬-৭৮ সালে গোটা

* দ্বিতীয় অধ্যায়, ১৩ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য

দাক্ষিণাত্যে এবং ১৮৭৯-৮০ সালে আবার গোটা দাক্ষিণাত্যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ঘটেছিল। গ্রামাঞ্চলে জীবিকার সংস্থান হারিয়েছিল লক্ষ লক্ষ মানুষ। ১৮৭৬-৭৮ সালে দাক্ষিণাত্যে প্রায় ৮ লক্ষ মানুষের অনাহার-মৃত্যু ঘটেছিল বলে অনুমান করা যায়।[১] উইলিয়ম ডিগ্‌বি লিখেছিলেন, উনবিংশ শতাব্দীর শেষে পঁচিশটা বছরে ভারতে ২ কোটি ৬০ লক্ষ মানুষ দুর্ভিক্ষে মরেছিল, প্রতি বছরে গড়পড়তায় দশ লক্ষ। শেষ দশটা বছরেই ১ কোটি ৯০ লক্ষ মানুষ মরেছিল দুর্ভিক্ষে ও দুর্ভিক্ষজনিত রোগে।[২]

খাদ্যাভাব ও দুর্ভিক্ষের সঙ্গে ছিল জমির খাজনাবৃদ্ধি, রাজসরকার ও জমিদার-মহাজনের শোষণের তীব্রতার মাত্রাবৃদ্ধি, গ্রামীণ কুটির-শিল্পের ধ্বংসসাধন, এবং প্রবলের প্রচণ্ড অত্যাচার। দলে দলে মানুষ ভিক্ষুক হয়েছিল। ১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহের পরাজয়ের পর আবার বিদ্রোহ করার শক্তি সাহস বা ভরসা কোথাও ছিল না।

দুর্ভিক্ষ, মৃত্যু ও লাঞ্ছনা দিয়ে তাড়িত এই দেশে বৃটিশ উপনিবেশ-গুলো থেকে আড়কাঠির দল এসেছিল 'কুলী' জোগাড় করতে। ক্রীতদাস-প্রথা অবসানের পর বিভিন্ন বৃটিশ উপনিবেশের বৃটিশ ও অপর শ্বেতাঙ্গ মালিকদের আখ-ক্ষেতে, চা-বাগানে, রবার-বাগানে,—'প্ল্যানটেশন'-গুলোয়—শ্রমিকের অভাব হয়েছিল। দক্ষিণ আমেরিকায়, কিউবায় প্ল্যানটেশন মালিকরা চীনের পর্তুগীজ-অধিকৃত বন্দর মাকাও থেকে চীনা 'কুলী' আমদানী করে সমস্যা লাঘব করছিল। বৃটিশ মালিকদের নজর পড়ল ভারতের ওপর।[৩]

ভারতবর্ষ থেকে কলকাতা বন্দর দিয়ে বৃটিশ কলোনীতে 'কুলী'-চালান আরম্ভ হয়েছিল ১৮৩৮ সালে। ভারতমহাসাগরের দক্ষিণে আফ্রিকার নিকটে মরিশাস্‌ দ্বীপে, আটলান্টিক মহাসাগর পারে ওয়েস্টইণ্ডিজের ট্রিনিডাড্‌ দ্বীপে ও দক্ষিণ আমেরিকার উত্তরপ্রান্তে বৃটিশ গায়না দেশে, প্রশান্ত মহাসাগরের প্রায় মধ্যস্থলে ফিজি দ্বীপপুঞ্জে, এবং দক্ষিণ আফ্রিকার নাটাল প্রদেশে হাজারে হাজারে

ভারতীয় 'কুলী' নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ফরাসীরাও ভারতীয় কুলী নিয়ে যাচ্ছিল,—১৮৫১ সাল নাগাদ ফরাসী অধিকৃত 'রিইউনিয়ন' দ্বীপে ২৩ হাজার ভারতীয় শ্রমিক খাটছিল। ওলন্দাজরাও ফাঁদ পেতেছিল,—১৮৭২ সালে ইন্দোনেশিয়ার সুরিনাম দ্বীপে ভারতীয় 'কুলী' আমদানী শুরু হয়।[৪]

এই 'কুলী'দের অনেক রকম প্রলোভন দেখানো হয়েছিল, অনেক মিথ্যা ভরসা দেওয়া হয়েছিল। অবশ্য, বেশি প্রলোভন দেখানোর প্রয়োজন ছিল না—দুবেলা আহার আর মাথা গোঁজার ঠাঁই যথেষ্ট প্রলোভন ছিল। এই জীবিকান্বেষী ভারতসন্তানদের অধিকাংশ ছিল হিন্দুসমাজের নিম্নবর্ণ ও 'পতিত'-সম্প্রদায়ের মানুষ।[৫] দেশে থাকার জন্য এদের আকর্ষণ কি ছিল?

মহাসাগর পার হয়ে এই যে মানুষেরা বিদেশে চলে গিয়েছিল, এদের অবস্থা প্রায় ক্রীতদাসের মতোই ছিল। খাটুনী ছিল হাড়ভাঙা, তার ওপর ছিল হাজার রকম শাস্তির ব্যবস্থা। জরিমানা ছিল, চাবুক পড়তো প্রায়ই, প্রচণ্ড প্রহারে অর্ধমৃত করার ব্যবস্থা ছিল; কাজে ফাঁকি দিলে বা পালালে জেলখানা, সশ্রম কারাদণ্ড, এবং বন্দী-মজুর হিসাবে খাটানোর ব্যবস্থা ছিল। তবুও চুক্তির মেয়াদ শেষে সবাই দেশে ফিরত না, ফিরতে পারত না। দশ বছর, পনের বছর পরে এক টুকরো জমি নিয়ে 'নতুন দেশে' বসবাস করার চেষ্টা করত অনেকে, 'স্বাধীন মজুর' হয়ে বাঁচার চেষ্টা করত, নাহয় আবার চুক্তিবদ্ধ হত। বছর বছর এদের সংখ্যা বাড়ছিল। সেইসঙ্গে কতকগুলো সমস্যা বাড়ছিল।

অন্যান্য সমস্যার মধ্যে একটা গুরুতর সমস্যা গার্হস্থ্য জীবনের সমস্যা। 'গিরমিটিয়া'দের এক একটা চালানে স্ত্রীলোক এবং শিশুর অনুপাত বাঁধা ছিল খুব কম করে। সচরাচর স্ত্রীলোকের সংখ্যা শতকরা ২০ থেকে ৩০ থাকত। খুব কম 'গিরমিটিয়া' তার পরিবার নিয়ে আসতে পারত। ফলে 'গিরমিটিয়া'-বসতিতে গার্হস্থ্য জীবনের

সাধারণ নিয়ম প্রায়ই ভঙ্গ হত। গান্ধীজী এদের সম্বন্ধে লিখেছিলেন ঃ—

> কেমন করিয়া যে তাহাদিগকে ভারতবর্ষ হইতে নাতালের সহিত সম্পর্কিত ভারতীয় আড়কাঠিরা ভুলাইয়া লইয়া গিয়াছিল, কেমন করিয়া ভুলের মোহে পড়িয়া তাহারা মাতৃভূমি ত্যাগ করিয়াছিল, কেমন করিয়া নাতালে পৌছিয়াই তাদের চোখ খুলিয়া যায়, তবুও কেমন করিয়া তাহারা সেখানে টিকিয়া থাকে, কেমন করিয়া তাহাদের পর আরও মজুরেরা যাইতে থাকে, কেমন করিয়া তাহারা সমাজ ও ধর্মের সমস্ত সংযম ত্যাগ করে, অথবা তাহাদের সংযমের বাঁধ ভাঙ্গিয়া যায়, কেমন করিয়া এই হতভাগ্যদের ভিতর হইতে বিবাহিতা স্ত্রী ও রক্ষিতা স্ত্রীলোকের ব্যবধান পর্যন্ত অন্তর্হিত হয়, সে সকল কথা বলার স্থান এখানে নাই।[৫]

'সে সকল কথা' না বলেও গান্ধীজী যা উল্লেখমাত্র করেছেন, মোটামুটি ছবিটা বোঝার পক্ষে তা যথেষ্ট।

এই গিরমিটিয়া ভারতীয় কৃষি-শ্রমিকের শ্রমে নাটালের সমৃদ্ধি। তুই বছরের মধ্যে নাটাল থেকে চিনির রপ্তানী শতকরা ৪০০ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছিল।[৬]

গান্ধীজীই উল্লেখ করেছেন যে 'গিরমিটিয়া'দের পিছনে পিছনে ভারতীয় ব্যবসাদাররা বিভিন্ন দেশে যেত। ভারত থেকে তখন নাটালে জাহাজ আসত মরিশাস দ্বীপ হয়ে। মরিশাসে 'গিরমিটিয়া'-দের পিছনে পিছনে ভারতীয় দোকানদার-শেঠরা গিয়েছিল। নাটালে 'গিরমিটিয়া' আমদানী শুরু হলে তাদের পিছু পিছু মরিশাস থেকে কিছু ভারতীয় ব্যবসাদার নাটালে আসে। পরবর্তী কালে সরাসরি ভারত থেকেও ব্যবসাদারদের যাতায়াত শুরু হয়। এই ব্যবসায়ীদের অধিকাংশ ছিল গুজরাটের মুসলমান। নাটালে প্রথম ভারতীয় দোকান খুলেছিলেন মরিশাস থেকে আগত শেঠ আবুবকর আহ্‌মদ। তাঁর সমৃদ্ধির কথা গুজরাটে তাঁর দেশ পোরবন্দরে পৌছলে

সেখান থেকে অন্য ব্যবসায়ীরা নাটালে আসেন। এরপর সুরাট থেকেও ব্যবসায়ীরা নাটালে আসেন। এঁদের কারবারের হিসাবপত্র রাখার জন্য গুজরাট ও কাথিয়াওয়াড় থেকে যে হিসাবনবীশরা এঁদের কর্মচারী হয়ে আসেন তাঁরা অধিকাংশই হিন্দু।[৭]

এই ব্যবসায়ীরা প্রথমদিকে নিজেদের 'আরব' বলে পরিচয় দিতেন। মুসলমান বণিক বলে হয়তো ইউরোপীয়রাই এঁদের 'আরব' বলতো। ক্রমে এঁদের সংখ্যা বাড়তে থাকে এবং 'আরব' আখ্যা লোপ পেয়ে ভারতীয় হিসাবেই এঁরা পরিচিত হন। ১৮৮০ সালে ডারবান শহরে এরকম ভারতীয় 'আরব' ছিলেন ৭ জন। ১৮৮৫ সালে তাঁদের সংখ্যা হল ৪০; ১৮৯১ সালে ডারবান ও অন্যান্য শহর-গঞ্জে এঁদের সংখ্যা হল ৫৯৮, তাছাড়া আরো ১৭২ জন ফিরিওয়ালা; ১৯০৪ সালে নাটালে ভারতীয় দোকানদারের সংখ্যা ১২৬০, ইউরোপীয় দোকানদারের সংখ্যা ৬৫৮; ভারতীয় ফিরিওয়ালার সংখ্যা ১৪৮৭, ইউরোপীয় ফিরিওয়ালার সংখ্যা ১৯।[৮]

চুক্তির-মেয়াদ-উত্তীর্ণ 'গিরমিট-খালাস' গিরমিটিয়ারা কেউ কেউ "স্বাধীন" ব্যবসা বা কৃষিকর্ম বা মাছ-ধরা শুরু করেছিল। এই সব "স্বাধীন" ভারতীয়দের অনেকেই কঠোর পরিশ্রম করত, জীবন-নির্বাহে খরচ করত খুব সামান্য। একটুকরো জমি পেলে তাতেই ফলের গাছ লাগিয়ে শব্জীবাগান করে এরা ইউরোপীয়দের চমক লাগিয়ে দিয়েছিল।

আর ভারতীয় ব্যবসাদাররাও ব্যবসায়-বুদ্ধিতে ইউরোপীয়দের হার মানিয়ে দিয়েছিল। অধিকাংশ মানুষ যেখানে কালোচামড়া বা বাদামী-চামড়া, আর শাদাচামড়া যেখানে প্রভু, সেখানে শাদাচামড়া দোকানদার যে খরিদ্দার কম পাবে, তা প্রায় স্বতঃসিদ্ধ। ভারতীয়রা তো বটেই, আফ্রিকান জুলু খরিদ্দারও ভারতীয় দোকানেই বেশির ভাগ কেনা-কাটা করত। ফলে ইউরোপীয়দের চোখ টাটাতে থাকে। ভারতায়-বিতাড়নের জন্য এবং গিরমিটিয়াদের

ভারতে ফেরত পাঠানোর জন্য ইউরোপীয়দের মধ্যে আলোড়ন শুরু হয়।

এই আলোড়নের মধ্যে প্রথম কথা ওঠে যে ভারতীয়রা নাটাল ছেয়ে ফেলছে। সংখ্যার দিক থেকে ভারতীয়রা ১৮৯৩-৯৪ সালে ইউরোপীয়দের ছাড়িয়ে গিয়েছিল। কিন্তু তাদের অধিকাংশই ছিল 'গিরমিটিয়া' বা গিরমিট-খালাস কৃষিশ্রমিক এবং দরিদ্র শ্রমজীবী। কিছু সংখ্যাগত তথ্য এখানে উল্লেখযোগ্য।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয় 'গিরমিটিয়া কুলী' আমদানী বন্ধ হয় ১৯১৩ সালে। ১৮৭১ সাল থেকে ১৯০৩ সালের মধ্যে ৫৪ হাজার গিরমিটিয়া আমদানী করা হয়েছিল, ১৯০৪ সাল থেকে ১৯১১ সালের মধ্যে আরো ৪৬ হাজার; ১৯১১ সাল পর্যন্ত মোট আমদানী হয়েছিল ১ লক্ষ ৪২ হাজার ৬৭০ জন।[৯] আমদানী গিরমিটিয়াদের অর্ধেক বা তার চেয়ে কম মেয়াদ-শেষে ফিরে যেত। যারা থেকে যেত, তাদের সন্তানসন্ততি হত, সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটত। ১৮৯৩ সালে নাটালে ভারতীয় বাসিন্দার সংখ্যা ৪২,৯৭৭; তার মধ্যে ২৬,৩১২ জন 'গিরমিট-খালাস'; এরা ফল-শব্জীর বাগান করা, মাছ ধরা, গৃহভৃত্যের কাজ, খুচরো খাটুনীর জনমজুরী বা কারিগরী করে জীবন নির্বাহ করছিল; অল্প কয়েকজন দোকানদার বা ফিরিওয়ালা বা সম্পন্ন গৃহস্থ; আর, ১৬,৬৫৫ জন 'গিরমিট'-বদ্ধ 'কুলী'।[১০] ১৮৯৪ সালে নাটালে ভারতীয়ের সংখ্যা ৪৩,০০০, ইউরোপীয় প্রায় ৪০,০০০।[১১]

১৯১১ সালের লোকগণনার হিসেবে দেখা যায়, দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দের মোট সংখ্যা প্রায় ১ লক্ষ ৫০ হাজার; প্রদেশ অনুসারে, কেপ কলোনীতে প্রায় ৭,০০০, ট্রান্সভালে প্রায় ১১,০০০, অরেঞ্জ রাজ্যে ১০০, আর এক নাটালেই ১ লক্ষ ৩৩ হাজার। নাটালের ওই ১ লক্ষ ৩৩ হাজারের মধ্যে গিরমিটিয়ার সংখ্যা প্রায় ৪০ হাজার, আর ৬৩ হাজার ৭৬৬ জনের জন্ম দক্ষিণ আফ্রিকায়। নাটালে সে

সময়ে ইউরোপীয়দের সংখ্যা ৯৮ হাজার, এবং আফ্রিকানদের সংখ্যা ৯ লক্ষ ৬২ হাজার।[১২]

ভারতীয় ব্যবসাদার, উকীল, দোকানী সকলকেই নাটালের শ্বেতাঙ্গরা 'কুলী' বলত ; তামিলদের অনেকের নামের শেষে 'স্বামী' থাকে, তাই থেকে সব ভারতীয়কেই 'সামী' বলে সম্বোধন করাও হত। দুটো শব্দই অবজ্ঞাসূচকভাবে ব্যবহার করা হত। ভারতীয় ব্যবসাদার বা তাঁদের কর্মচারীরা উচ্চশিক্ষিত ছিলেন না, কিন্তু অধিকাংশ শ্বেতাঙ্গের তুলনায় তাঁরা বেশি শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত ছিলেন, এই অপমান তাঁদের লাগত। আরো অনেক অপমান-লাঞ্ছনা তাঁদের জুটত, এবং এগুলো বাড়ছিল। এঁরা প্রথমদিকে অবাক হতেন—তাঁরা সচ্ছল অবস্থার ভদ্রলোক হলেও গোরারা তাঁদের কুলীর পর্যায়-ভুক্ত করছে দেখে। তাঁরা যে গিরমিটিয়া নন, সেটা বোঝানোর জন্য ব্যাকুলতা ছিল। অপরদিকে কালো আফ্রিকানদের চেয়ে, জুলুদের চেয়ে, 'নেটিভ'দের চেয়ে তাঁরা যে অনেক উন্নতস্তরের তা বোঝানোর ব্যাকুলতাও ছিল। গিরমিটিয়া, বিশেষতঃ নিম্নবর্ণের 'অস্পৃশ্য'-জাতের অশিক্ষিত দীনহীন শ্রমিকের প্রতি যে অত্যাচার হত তাতে এঁরা সমব্যথী ছিলেন না। তা না হওয়ারই কথা, কারণ ভারতে উচ্চশ্রেণীর ভারতীয়রা তো এরকম মানুষদের প্রতি স্বদেশে ওইরকম ব্যবহারই করত।

জমিজায়গা খরিদ করে খামার-বাগান করে যে 'ভদ্র' ভারতীয়রা দক্ষিণ আফ্রিকায় বাসিন্দা হচ্ছিলেন, তাঁদের প্রতি এবং ভারতীয় ব্যবসায়ীদের প্রতি রূঢ় বর্ণ বৈষম্যমূলক আচরণ ও আইন-কানুন নিয়ে এঁরা একটু-আধটু প্রতিবাদ করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু সে প্রচেষ্টা ছিল খুবই ক্ষীণ ; কোন আদর্শবোধ তখনো জাগ্রত হয়নি তার পেছনে ; এবং এই নিয়ে কথা বলা, লেখা, মানুষজনকে জড়ো করার মতো মুখপাত্র-সংগঠক তখনো আসেনি।

॥ দুই ॥

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে জনবহুল পরাধীন ভারতবর্ষ ছিল 'গিরমিটিয়া কুলী' জোগানের একটা দেশ। আরেকটা জনবহুল দেশ চীন, নামে স্বাধীন হলেও আসলে পরাধীন—সে দেশও গিরমিটিয়া কুলী জোগানের দেশ হয়ে উঠেছিল। চীন থেকে পর্তুগীজরা 'কুলী' নিয়ে যাচ্ছিল দক্ষিণ আমেরিকায়, একথা আগে উল্লেখিত হয়েছে।

ভারতীয় কুলী আনা হয়েছিল নাটালের আখ-ক্ষেতের মালিকদের প্রয়োজনে। ট্রান্সভালের সোনার খনির মালিকদের প্রয়োজনে চীনা কুলীর ওপর নজর পড়ল বোয়ার-যুদ্ধের শেষে, খনিতে খাটুনীর শ্রমিকের অভাব হওয়ায়।

বোয়ার-যুদ্ধের সময় খনিগুলো বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। তখন যে প্রায় ১ লক্ষ কৃষ্ণকায় আফ্রিকানকে দুঃসহ প্রায়-বন্দী অবস্থায় খনিতে খাটানো হচ্ছিল, যুদ্ধের সময় তাঁদের ছাঁটাই করে ছেড়ে দেওয়া হয়। যুদ্ধশেষে খনিগুলো আবার চালু করার সময় এদের অনেককেই ফিরে পাওয়া গেল না। এরা অনেকে হয়তো মরেই গিয়েছিল, অনেকে দূর দূরান্তে ছড়িয়ে পড়েছিল। অনেকে পালিয়ে গিয়েছিল।

পালিয়ে যাওয়ার বা খনিতে খাটুনীর জন্য আর ফিরে না আসার কারণ ছিল। খনিতে খাটুনীর চেয়ে না খেয়ে মরা ভালো একথা যদি কোন আফ্রিকান মনে করত, তাহলে তাকে খুব বেহিসেবী বলা যায় না। 'কম্পাউণ্ড-আটক' খাটুনী মানুষের বেশিদিন সহ্য হবার কথা নয়।

'কম্পাউণ্ড-আটক' ব্যবস্থা চালু করেছিলেন সিসিল রোড্‌স্। কিম্বার্লির হীরকখনি অঞ্চলে হীরে চুরি হত। চুরি সবাই করত, বদনাম বেশি হত কালোচামড়া মজুরের। তারা খনি থেকে বেরুবার সময় গুঁড়ো হীরে বা টুকরো হীরে লুকিয়ে নিয়ে যায়, তারপর তাদের চেয়ে চালাক ওস্তাদ শ্বেতাঙ্গ চোরা-ব্যবসায়ীরা সেগুলো জলের দরে কিনে নেয়—এইরকম রিপোর্ট ছিল। ১৮৮৯ সাল নাগাদ সিসিল

রোড্‌স্‌ যখন হীরকখনিগুলোর প্রায় একচেটিয়া কর্তা হলেন, তখন প্রধানতঃ এই চুরি বন্ধ করার উদ্দেশ্যে তিনি আফ্রিকান শ্রমিকদের জন্য 'কম্পাউণ্ড-আটক' ব্যবস্থা চালু করলেন। এই ব্যবস্থায় শ্রমিকদের থাকতে হত কোম্পানীর খনি-সংলগ্ন কম্পাউণ্ডে, কাঁটা-তারের বেড়ার মধ্যে। বেড়ার বাইরে কোন সময়েই যাওয়া নিষেধ, ছুটির দিনে বিকালবেলাও বেড়ার ভেতরে থাকতে হবে। ওই ঘেরা জায়গার মধ্যেই কোম্পানীর দোকান থেকে বাজার করতে হবে, রান্না খাওয়া শোওয়া সবই কোম্পানীর নজরের মধ্যে ; খনি থেকে ওঠার পর শরীর-তল্লাসী তো ছিলই, এখন যখন-তখন ঘর-তল্লাসীও চলল। বাইরের এলোমেলো ঝুপড়ি-বস্তিগুলোর চেয়ে কোম্পানীর ব্যারাক-বাড়ি হয়তো একটু ভাল ছিল, হয়তো কোম্পানীর ডাক্তার ছিল, হয়তো শ্রমিকদের শৃঙ্খলা শেখানোর ব্যবস্থা ছিল। হয়তো আরো কিছু ভালো ব্যবস্থা ছিল। অন্ততঃ কোম্পানী দাবী করত যে এ ব্যবস্থায় শ্রমিকদের প্রভূত কল্যাণ হচ্ছে। হীরে চুরি কমে গিয়েছিল, সেকথা ঠিক।[১৩]

কিন্তু কল্যাণ যতই হোক, মানুষ কাঁটাতারের বেড়ার মধ্যে বেশি দিন থাকতে পারে না। জীবনের স্বাদ যখন চলে যায়, তখন দু'বেলা পর্যাপ্ত আহারেও রুচি চলে যায়। মানুষ ছট্‌ফট্‌ করে, নিশ্চিন্ত বন্দীজীবন থেকে অনিশ্চিত অন্ধকারেও পালিয়ে যায়।

খনিতে খাটুনীও ছিল ভয়ানক। মাটির অনেক নীচে, দম বন্ধ করা আবহাওয়ায় ভারবাহী জন্তুর খাটুনী খাটতে হতো। খোদাই চলত অবিরাম, হাওয়ায় সর্বদা ভাসত পাথর-ধাতু-মাটির গুঁড়ো। কোয়ার্টৎস-পাথরের গুঁড়োয় ফুসফুস ভরে যেত মানুষগুলোর, সিলি-কোসিস্‌ আর যক্ষ্মায় মরত দলে দলে। তাজা মানুষগুলো দু'চার বছরে ছিব্‌ড়ে হয়ে যেত। খনিগুলো বিকট গ্রাসে মানুষ খাচ্ছিল—সেই দানবিক ক্ষুধার জোগান দিতে দিতে আফ্রিকান শ্রমিকপল্লী উজাড় হচ্ছিল।[১৪]

বোয়ার-যুদ্ধের আগে আফ্রিকান শ্রমিককে মজুরী দেওয়া হত, মাসে ৪৫ শিলিঙ, শোওয়ার জায়গা আর খোরাক। যুদ্ধের সময় যাদের কাজে রাখা হয়েছিল তাদের মজুরী দেওয়া হচ্ছিল মাসে ২০ শিলিঙ। যুদ্ধের পরে যখন খনিগুলো আবার পুরোদমে চালু করার চেষ্টা হল, তখন মজুরী ধার্য হল ৩০ শিলিঙ। আফ্রিকান মজুররা লেখাপড়া জানত না, কিন্তু ৩০ শিলিঙ যে ৪৫ শিলিঙের চেয়ে অনেক কম, সেটা তারা বুঝতে পেরেছিল। মজুর পাওয়া গেল না। অগত্যা ১৯০৩ সালে মালিকরা আবার ৪৫ শিলিঙ মজুরী ধার্য করলেন। কিন্তু তাতেও ৫০ হাজারের বেশি মজুর জোগাড় হল না।[১৫] বোয়ার জমি-মালিকরা ইতিমধ্যে খামারের কাজকর্ম আবার চালু করেছিল ; ক্ষেত-খামারে খাটবার জন্য তাদেরও মজুর চাই, ঘরের ঝি-চাকর চাই ; তারাও মজুর টানছিল।

১৯০৩ সালের নভেম্বর মাসে সরকার-নিযুক্ত 'লেবার কমিশন' রিপোর্ট করলেন—আফ্রিকান শ্রমিকের ঘাটতির পরিমাণ ১ লক্ষ ২৯ হাজার, আফ্রিকান শ্রমিক পাবার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না, এবং ১৯০৮ সাল নাগাদ যত শ্রমিক দরকার হবে তার হিসাবে ঘাটতি হবে ৩ লক্ষ ৬৫ হাজার।[১৬]

কথা উঠল, শ্বেতাঙ্গ মজুর দিয়ে কাজ চালানো হোক। অস্ট্রেলিয়া, নিউজীল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড, ইটালী, নানাদেশ থেকে মজুর আনা হল কিছু, কিন্তু খনি-দানবের ক্ষুধার অনুপাতে তা যৎসামান্য। কালোচামড়া মানুষকে যেভাবে খাটানো যায়, এদের সেভাবে খাটাতে গেলে অনেক ঝামেলা-ঝঞ্ঝাট। আর, নিজের দেশে যে মোট বইত, দক্ষিণ-আফ্রিকায় এসে সে 'কুলী'র কাজ বা 'কালোচামড়া-কাফির'-এর কাজ করতে নারাজ। শ্বেতাঙ্গ বাসিন্দাদেরও গরজ ছিল,—শ্বেতাঙ্গ মাত্রেই 'কাফির' বা 'কুলী'র চেয়ে উন্নত জীব, তা দেখানোর ; শ্বেতাঙ্গ মজুরকে দিয়ে 'নীচু কাজ' করালে চামড়ার দেমাক চুপসে যায়। কাজেই, অন্যদিকে তাকাতে হল।

ভারতবর্ষ থেকে 'কুলী' আনার কথা হল। নাটালে ভারতীয়দের সংখ্যাবৃদ্ধি দেখে আর ভারতীয় বণিক-দোকানদারদের বাড়বাড়ন্ত দেখে ট্রান্সভালের শ্বেতাঙ্গরা ইতিপূর্বেই ট্রান্সভালে ভারতীয়দের প্রায় 'প্রবেশ নিষেধ' করে দিয়েছিল। ভারতীয় 'কুলী' আমদানীর প্রস্তাবে অনেকেই সজোরে মাথা নাড়ল—না, ওসব চলবে না। ইতিমধ্যে ভারতবর্ষের ভেতরেও 'কুলী' চালানের বিরুদ্ধে শোরগোল উঠেছিল; ভারতের বৃটিশ সরকারও ভারতীয় শ্রমিকদের অভিভাবক সেজে আপত্তি জানাচ্ছিলেন। ভারতের ভেতরে শ্রমিকের চাহিদাও বাড়ছিল—চা-বাগান, রেলওয়ে, চটকল, সুতোকল, কাপড়কল ইত্যাদিতে শ্রমিক-নিয়োগ বাড়ছিল।[১৭] ট্রান্সভালে ভারতীয় কুলী আমদানী হল না।

আফ্রিকার অন্য দেশ থেকে মজুর আমদানী হচ্ছিল। কিন্তু মধ্য আফ্রিকার গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চল থেকে যাদের আনা হয়েছিল, তারা অল্প সময়ের মধ্যে নিউমোনিয়া আর যক্ষ্মায় মরে সাফ হয়ে গেল।

অতএব নজর পড়ল চীনাদের ওপর। চীনারাও এশিয়াবাসী, কাজেই তাদের আমদানী করা নিয়েও শ্বেতাঙ্গমহলে আপত্তি উঠেছিল। কিন্তু উপায়ান্তর না দেখে শেষ পর্যন্ত ১৯০৪ সালে চীনা কুলী আমদানীতে সায় দিতে হয়েছিল। এবার অবশ্য প্রথম থেকেই ঠিক করা হল, এই কুলীদের মেয়াদ শেষে অবশ্যই স্বদেশে ফেরত যেতে হবে; নাটালে ভারতীয় কুলীদের মেয়াদ-শেষে জমিজমা নিয়ে ঘরবাড়ি করে বসবাস করার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল—এদের বেলায় আর ওসব ঝালাই রাখা হল না। বৃটিশ গভর্নর লর্ড মিলনার আশ্বাস দিলেন, এই চীনারা হবে বাড়ি তৈরী করার সময় যে ভারা বাঁধা হয়, সেই রকম, বাড়িটা তৈরী হয়ে গেলেই এই ভারা সরিয়ে ফেলা হবে।[১৮]

১৯০৪ সালের জুন মাসে চীনা কুলী আসা শুরু হল। ১৯০৪ সালের শেষে তাদের সংখ্যা দাঁড়াল ২৩ হাজার, আরো ২০ হাজার

জাহাজে বোঝাই হয়ে আসছে। কয়েক বছরের মধ্যেই তাদের সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ হল। চীনা কুলীরা আসতে শুরু করার আগেই ১৯০৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তাদের সম্বন্ধে আইন পাস করা হয়েছিল। সেই আইনে ছিল, চীনা কুলীদের সপ্তাহে ছয় দিন রোজ দশ ঘণ্টা খাটতে হবে, ন্যূনতম মজুরী হবে দৈনিক ২ শিলিঙ; তাদের 'কম্পাউণ্ড-আটক' থাকতে হবে, কখনো-সখনো খুব দরকারে ৪৮ ঘণ্টার ছাড়পত্র নিয়ে বেড়ার বাইরে যেতে পারবে, কিন্তু খনি-এলাকার বাইরে যেতে পারবে না; তারা কোনরকম ব্যবসা করতে পারবে না, কারিগরী ব্যবসাও করতে পারবে না, কোনরকম সম্পত্তির মালিক হতে পারবে না। এই শ্রমিকদের জন্য আইনে ১৪ রকম অপরাধের শাস্তির তালিকা ছিল, এসব শাস্তির বিরুদ্ধে আদালতে বিচার প্রার্থনা করতে যাওয়া নিষিদ্ধ ছিল।[৯]

অত্যাচার ও মাত্রাহীন শোষণের চাপে চীনা কুলীরা কিছুদিনের মধ্যেই মরিয়া হয়ে ওঠে। একটা খনিতে তারা ধর্মঘট করে। অনেকে খনি ছেড়ে পালিয়ে গিয়ে চুরি-ডাকাতি করে বাঁচার চেষ্টা করে। স্মরণ রাখতে হবে যে কম্পাউণ্ড-আটক শ্রমিকের স্ত্রী-পরিবার নিয়ে থাকার অধিকার ছিল না। অনেকে মরে যায়। ১৯০৬ সাল থেকে চীনা কুলী ফেরত পাঠানো হতে থাকে, ১৯১০ সাল নাগাদ প্রায় সবাই ফেরত চালান হয়ে যায়। খুব সামান্য সংখ্যক লোক জাল কেটে বেরিয়ে ক্ষুদে দোকানদার বা কারিগর হয়ে টিকে যায়।[২০] ১৯০৫ সালের সত্যাগ্রহ-আন্দোলনে ভারতীয়দের পাশে দাঁড়িয়ে এই চীনারা খুব দৃঢ়ভাবে লড়েছিল।

চীনা কুলী ছাড়াও ট্রান্সভালের খনিতে মোসাম্বিক ও অন্যান্য পার্শ্ববর্তী দেশ থেকে আফ্রিকান 'গিরমিটিয়া' ও কনট্রাক্ট-লেবার আনা হত। তাদের বিষয়ে আমরা পরে উল্লেখ করব।

তিন ॥

১৮৯৩ সালের মে মাসে নাটালের ডারবান বন্দরে ২৩ বছরের এক তরুণ ভারতীয় ব্যারিস্টার জাহাজ থেকে নামলেন। পুরো কেতাদুরস্ত সাহেবী পোশাকে সজ্জিত এই ব্যারিস্টারের নাম মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। বিলাত থেকে স্বদেশে ফিরে ব্যারিস্টারী ব্যবসায়ে বিশেষ কিছু উপার্জন করতে না পেরে তিনি হতাশ হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর জন্মস্থান পোরবন্দর, সেখানকার এক শেঠ—আব্দুল করিম ঝভেরী—নাটাল-ট্রান্সভালের এক বড় ভারতীয় ব্যবসায়ী কোম্পানীর অংশীদার ছিলেন। এই কোম্পানীর একটা বড় মামলা চলছিল ট্রান্সভালের রাজধানী প্রিটোরিয়ায়। সেই মামলার সাহেব-ব্যারিস্টারকে সাহায্য করার জন্য আব্দুল করিম ঝভেরী'র যোগাযোগে এই তরুণ ভারতীয় ব্যারিস্টারকে আনা হয়েছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় সম্প্রদায়ের হয়ে কথা বলার, লেখার এবং আন্দোলন সংগঠন করার মানুষ এসে পৌঁছল।

গান্ধীজী নাটালে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গেই ভারতীয়-বিদ্বেষী শ্বেতাঙ্গ শাসনের ঝাপটায় পড়লেন। ডারবান থেকে প্রিটোরিয়া যাবার পথে কেমন করে তাঁকে রেলগাড়ির কামরা থেকে ধাক্কা দিয়ে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল, ঘোড়ার গাড়িতে কেমন করে তাঁকে কোচোয়ানের পাশে বসতে বলা হয়েছিল এবং অস্বীকার করায় কেমন করে মারতে মারতে প্রায় অচৈতন্য করে দেওয়া হয়েছিল, কেমনভাবে কোন হোটেলে জায়গা মেলেনি, কেমনভাবে ফুটপাথের উপর থেকে গলা-ধাক্কা দিয়ে রাস্তায় ফেলে দেওয়া হয়েছিল, সেসব কথা ভারতবাসী মাত্রেই জানেন—এখানে পুনরাবৃত্তির প্রয়োজন নেই।[২১] 'কুলী'-ব্যারিস্টার বা 'সামী' মানে কি, তা গান্ধীজীকে খুব তাড়াতাড়ি শিখিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

কিন্তু যা শেখানো হয় সব মানুষ তা মেনে নেয় না। গান্ধীজী এই শিক্ষা মেনে নেননি। ইংরেজের আইন পড়ে ন্যায়বিচার সম্বন্ধে

তাঁর যে ধারণা হয়েছিল সেইটাই তিনি দাবী করলেন, বৃটিশ প্রজা হিসাবে, মহারাণীর অনুগত আইনমান্যকারী ভদ্রলোক হিসাবে। সেই সঙ্গে অন্যদেরও দাবী জানাতে শেখালেন। ১৮৯৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে নাটালের ইংরেজী সংবাদপত্রে চিঠি লিখলেন—এশিয়াবাসীর প্রতি এই অপমানের কারণ কি? "…বেচারা ভারতীয় ব্যবসাদারদের প্রতি এই ঘৃণা ও অবজ্ঞার মূলে দেখা যাচ্ছে তাদের শান্তিপূর্ণ সংযত চালচলন, তাদের হিসেবী মিতব্যয়ী স্বভাব। অথচ তারা তো বৃটিশ প্রজা। এই কি খৃস্টানের যোগ্য আচরণ, এই কি ন্যায়বিচার, এই কি সভ্যতা?"[২২]

মক্কেলের মামলা-শেষে ১৮৯৪ সালের মে মাসে গান্ধীজী যখন দেশে ফিরবেন, তখন খবরের কাগজে একটি ছোট্ট খবর তাঁর চোখে পড়ল—ভারতীয়দের নাটালে বিধানসভায় সদস্য নির্বাচনের অধিকার লোপ করা হবে।

গান্ধীজী এই ভোটাধিকার-লোপ আইনের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানো কর্তব্য বলে পরামর্শ দিলেন। শেঠেরা সম্মত হলেন, কিন্তু শর্ত হল, গান্ধীজীকে থাকতে হবে—"যদি আপনি এই ষ্টীমারে যাওয়া বন্ধ করেন ও মাসখানেক থাকেন, তবে আপনি যেমন বলিবেন আমরা তেমনভাবেই লড়িতে পারি।"

মাসখানেক নয়, গান্ধীজী নাটাল-ট্রান্সভালে মোট প্রায় একুশ বছর ছিলেন, মাঝে বার-দুই স্বল্পকালের জন্য দেশে গিয়েছিলেন। তাঁর পরিচালনায় নাটালের প্রস্তাবিত নতুন আইনের বিরুদ্ধে মে-জুন মাসের মধ্যে ৫০০ এবং জুলাই মাসের মধ্যে ১০ হাজার ভারতীয়ের স্বাক্ষরিত প্রতিবাদ-পত্র সরকারের উচ্চতম মহলে পাঠানো হয়। ১৮৯৪ সালের ২২শে অগস্ট 'নাটাল ইণ্ডিয়ান কংগ্রেস' প্রতিষ্ঠিত হয়, গান্ধীজী তার সম্পাদক।

১৮৯৪ সালের ২৮শে জুন তারিখে পাঁচশো জনের স্বাক্ষরিত প্রথম দরখাস্ত থেকে শুরু করে ১৮৯৬ সালের ২২শে মে পর্যন্ত ২৪ মাসে

গান্ধীজী ২১টি দরখাস্ত বা আবেদন ('পিটিশন', 'মেমোরাণ্ডাম', 'মেমোরিয়াল') লিখেছিলেন, সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য সম্পাদকের প্রতি চিঠি লিখেছিলেন ১৮টি, একাধিক খোলা চিঠি লিখে পুস্তিকাকারে প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর সংগঠনের সদস্য হয়েছিলেন ২২৮ জন, সদস্যপদের চাঁদা আদায় হয়েছিল শতকরা ৬০ ভাগ।[২৩]

স্মরণ রাখা উচিত যে এ সময়ে নাটালে ভোটার-তালিকায় ভারতীয়ের সংখ্যা ২৫১ জন, ইউরোপীয়ের সংখ্যা ৯,৩০৯ জন। সেদিক থেকে দেখলে আন্দোলন শুরু হয়েছিল খুব অল্প কিছু লোকের একটা প্রায়-নিরর্থক অধিকারের জন্য। ৪৬ হাজার ভারতীয় ভোটার-তালিকায় ঢুকে পড়ে ইউরোপীয়দের কোণঠাসা করে দেবে, ইউরোপীয়দের এই ভীতি যে অমূলক, তা বোঝাবার উদ্দেশ্যে গান্ধীজীই হিসেব দেখিয়েছিলেন যে যেখানে ৫০ পাউণ্ড মূল্যের স্থাবর সম্পত্তি বা তদনুরূপ উপার্জন না থাকলে ভোটার হওয়া যায় না, সেখানে ভারতীয় ভোটার কমসংখ্যকই থাকবে। ৪৬ হাজারের মধ্যে ১৬ হাজার তো গিরমিটিয়া কুলী, তাদের ভোটের কোন প্রশ্ন নেই; ৫ হাজারের মতো ব্যবসায়ী-দোকানদার-ফিরিওয়ালা যোগ করলেও যে ৩৫ হাজার ভারতীয় হয়, তাদের অর্ধেকের বেশি লোকের আর্থিক সঙ্গতি গিরমিটিয়া কুলীর ঠিক এক ধাপ ওপরে, ৫০ পাউণ্ড মূল্যের স্থাবর সম্পত্তি তাদের নেই, হওয়ার সম্ভাবনা নেই।[২৪]

কিন্তু ভোটের বিষয়টা উপলক্ষ। আন্দোলনের আসল ভিত্তি ছিল ভারতীয় হিসাবে মর্যাদার দাবী, অপমান-লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, ন্যায়বিচারের দাবী, বসবাস করার চলাফেরা করার অধিকারের দাবী। অধিকার-দাবীর এই ক্ষুদ্র শীর্ণ জলধারা মহাসাগরের তরঙ্গের সম্ভাবনা বহন করছিল।

গান্ধীনেতৃত্বের বিশ্লেষণমূলক আলোচনা প্রাসঙ্গিক হলেও আপাততঃ এখানে অবশ্য-প্রয়োজনীয় নয়। গান্ধীচরিত্র ও গান্ধী-নেতৃত্বের সামগ্রিক মূল্যায়ন ভারত-ইতিহাসের অঙ্গ, দক্ষিণ আফ্রিকার

অভিজ্ঞতা তার অন্যতম উপাদান। এখানে যা অবশ্য-স্মরণীয় তা হল ব্যাপক গণআন্দোলনের প্রস্তুতি ও প্রসারের পর্বে উপযোগী পদ্ধতির উদ্ভব ও প্রয়োগে গান্ধীজীর অসামান্য কৃতিত্ব। সরকার ও শাসকবর্গের কাছে অল্প কিছু লোকের বিনীত অথচ দৃঢ় আবেদন-নিবেদন থেকে শুরু করে ধাপে ধাপে গণস্বাক্ষর, পত্র-পত্রিকায় আলোড়ন, জনসভা, মিছিল, বিক্ষোভ, আইন-অমান্য, কারাবরণ, হরতাল-ধর্মঘট প্রভৃতি শান্তিপূর্ণ গণআন্দোলনের সবকটা পর্বই দক্ষিণ আফ্রিকায় দেখা গিয়েছিল। আর্জি-দরখাস্ত, স্মারকলিপি, আইনের যুক্তি অবলম্বনে ওকালতী লড়াই, মামলা-মোকদ্দমা ক'রে ন্যায়বিচার পাবার চেষ্টা, এসব আগে ছিল। গান্ধীজী সেগুলো ছাড়েননি। কিন্তু সেগুলোর সঙ্গে তিনি যোগ করেছিলেন বহু মানুষের পথে হাঁটা, হাজার-হাজার মানুষের জমায়েত, এবং আইন অমান্য করে স্বেচ্ছায় জেলে-যাওয়া মার-খাওয়া। উচ্চমহলের কিছু লোকের বৈঠকখানা আর উকীল-ব্যারিস্টারের কামরা থেকে তিনি আন্দোলনকে মাঠে-ময়দানে পথেঘাটে নিয়ে এসেছিলেন।

এই আন্দোলনের প্রধান ক্ষেত্র ছিল নাটাল ও ট্রান্সভাল। গান্ধীজী আন্দোলন শুরু করেছিলেন ধনী ব্যবসায়ী শেঠ ও মধ্যবিত্ত শিক্ষিত লোকদের নিয়ে। ধনী পরিবারের অনেক মানুষকে নিশ্চিন্ত আরামের জীবন ছেড়ে কষ্টকর আন্দোলনের মধ্যে তিনি টেনে আনতে পেরেছিলেন। সম্প্রদায়, ধর্ম, ভাষা, আচার-ব্যবহারের পার্থক্য ভুলে তারা যে সবাই ভারতীয় শুধু এইমাত্র পরিচয়ে মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। মেয়েরা আন্দোলনে নেমেছিল, কারাক্লেশ বরণ করেছিল।

কিন্তু গান্ধীজী আন্দোলনকে শুধু ব্যবসায়ী আর কর্মচারী আর শিক্ষিত পেশাদার মহলে আবদ্ধ রাখেননি। তিনি গরীব অশিক্ষিত গিরমিটিয়াদেরও আন্দোলনে টেনে এনেছিলেন। ট্রান্সভালে ১৯০৭ সালে সত্যাগ্রহ-আন্দোলনে 'প্রথম সত্যাগ্রহী কয়েদী' হয়েছিলেন রামসুন্দর পণ্ডিত, একজন পলাতক গিরমিটিয়া। রামসুন্দরের

গিরমিট ভেঙে পালিয়ে আসা গান্ধীজী অনুমোদন করেননি, তাঁর অন্য দোষের কথাও উল্লেখ করেছেন ; কিন্তু সেই সঙ্গে রামসুন্দর আন্দোলনে যে উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিলেন সেকথা অকৃপণভাবে উল্লেখ করেছেন। গান্ধীজী লিখেছিলেন,—"গিরমিটিয়ারা এই আন্দোলনে অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছিল। সংগ্রামে চূড়ান্ত জয়লাভ করার ব্যাপারে একটা বড় অবদান ছিল তাহাদের।"[২৫]

১৯১৩ সালে ট্রান্সভালে ভারতীয় মহিলাদের একটি দল (শ্রীমতী থাম্বি নাইডু, শ্রীমতী ভাল্লিয়াম্মা প্রভৃতি) আইন অমান্য করলেও পুলিস তাঁদের গ্রেপ্তার করল না। তাঁরা অতঃপর আরেক ধাপ এগিয়ে নিউকাস্‌ল এলাকায় কয়লাখনির ভারতীয় মজুরদের কাছে গিয়ে ধর্মঘটের আহ্বান জানালেন। তখন তাঁদের তিনমাস কারাদণ্ড দেওয়া হয়। ষোল বছরের মেয়ে ভাল্লিয়াম্মার জেলে মারাত্মক জ্বর হয়েছিল, ছাড়া পাবার পর সেই জ্বরে তাঁর মৃত্যু হল। কিন্তু তাঁদের ডাকে মজুররা সাড়া দিয়েছিল, অপ্রত্যাশিত সাড়া। গান্ধীজী লিখেছেন :—

> আমি তারযোগে এই সংবাদ পাইয়া সন্তুষ্ট হইবার সঙ্গে সঙ্গে হতবুদ্ধিও হইলাম। এখন কি করা যায়? এই অদ্ভুত জাগৃতির জন্য আমি প্রস্তুত ছিলাম না।...শত শত লোক হরতাল করিয়াছিল, এ সংখ্যা সহজেই হাজারে হাজারে পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। ভারতীয় ব্যবসায়ীরাও ভয় পাইয়াছিলেন এবং আমাকে প্রকাশ্যভাবে সাহায্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। খনির মালিক ও অন্যান্য গোরাদের সহিত তাঁহাদের ব্যবসা ছিল।..[২৬]

শত শত মজুর—তাদের ঘরবাড়ি ছিল না, ধর্মঘটের ফলে তাদের কোম্পানীর ঘর ছেড়ে মাঠে আকাশের নীচে এসে দাঁড়াতে হল। এদের আশ্রয় ও আহার জোটানো সমস্যা। গান্ধীজী সমস্যা সমাধানের উপায় স্থির করলেন—"এই 'সেনাবাহিনীকে' ট্রান্সভালে প্রবেশ

করাইয়া নিরাপদে জেলে স্থান করিয়া দিব।" তখন 'সেনাবাহিনী'র সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার। ১৯১৩ সালের ২৮শে অক্টোবর ট্রান্সভাল যাত্রা শুরু—পায়ে হেঁটে ৩৬ মাইল চলল ২০৩৭ জন পুরুষ, ১২৭ জন মেয়ে আর ৫০টি শিশু। ১৮৩৬ সালে বোয়ারদের মহা-অভিযান আরেক রকম ছিল।

গান্ধীজী গ্রেপ্তার হলেন, আরো অনেকে গ্রেপ্তার হলেন। কিন্তু ধর্মঘট চলল। সরকারী হিসেবে ১৯১৩ সালের ডিসেম্বর মাসের ২ তারিখে ২৮০৩ জন শ্রমিক ধর্মঘট করছিল, ১৩৮৫ জন জেলে আটক ছিল; ডিসেম্বরের ১৮ তারিখে ৬২১ জন ধর্মঘট করছিল, ১০৬৯ জন জেলে আটক।

শেষের দিকে সরকার ধর্মঘটী মজুরদের জেলে না পাঠিয়ে খনি-গুলোকেই সাময়িক জেল বলে ঘোষণা করল। কাজে না গেলে চাবুক, এবং গুলী চালানো হচ্ছিল। শ্রমিকরা জখম হয়েছিল অনেক, প্রাণও দিয়েছিল। এই লড়াইটায় শেষ পর্যন্ত আংশিক ও ক্ষণস্থায়ী বিজয়লাভ হয়েছিল।[২৭]

গান্ধীজীর পরিচালিত আন্দোলন মানুষের চরিত্র বদলে দিচ্ছিল। তিনি চেয়েছিলেন শাসকদের হৃদয়-পরিবর্তন। শাসককুলের কোন ব্যক্তির হৃদয়ে কিছু পরিবর্তন হয়েছিল বলে জানা যায় না; হয়তো হয়েছিল; অন্ততঃ গান্ধীজী তাদের অনেকের কাছ থেকে অনিচ্ছুক সম্ভ্রম অর্জন করেছিলেন। কিন্তু অর্থনৈতিক বা রাষ্ট্রনৈতিক ব্যবস্থা একটা মানুষ নয়, ব্যবস্থার হৃদয় থাকে না। ব্যক্তিমানুষের হৃদয় বদলালে ব্যবস্থা বদলায় না। গান্ধীজীর আন্দোলন দক্ষিণ আফ্রিকায় ব্যবস্থা বদলাতে পারেনি।

কিন্তু গান্ধীজীর আন্দোলন বহু মানুষের চিন্তাভাবনা চালচলন স্বভাবচরিত্র বদলে দিয়েছিল। যারা সংগ্রামের কথা ভাবত না, তাদের অনেককে সংগ্রামী করে তুলেছিল। সংগ্রাম মানুষকে উন্নত করে, মনুষ্যত্ব জাগায়।

আর, আন্দোলন গান্ধীজীকেও বদলে দিচ্ছিল। ১৮৯৩ সালের কেতাদুরস্ত সাহেবী পোশাকে সুসজ্জিত ব্যারিস্টার-সাহেব ১৯১৩ সালে গিরমিটিয়া কুলীর পোশাক পরেছিলেন। হিন্দুসমাজের এক অংশকে 'পতিত' 'অস্পৃশ্য' 'পঞ্চম' 'ঢেড়বোড়ো' বলে ফেলে রেখে দিয়ে বৃটিশ বা বোয়ারের কাছে ভারতীয়দের জন্য ন্যায়বিচার দাবী করার নৈতিক অসঙ্গতি ও রাজনৈতিক দুর্বলতা তিনি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন—অস্পৃশ্যতা-বর্জন ও সাম্প্রদায়িক ঐক্য তাঁর প্রায় মন্ত্র হয়ে উঠেছিল। তিনি অনেক কিছু ছেড়েছিলেন।

কিন্তু তাঁর ধর্মবিশ্বাস, অহিংস-পন্থা, ও শাসন-ব্যবস্থার হৃদয়-পরিবর্তনের কল্পনা তিনি কখনো ছাড়েননি। শেঠদের সঙ্গে তাঁর মিত্রতার বন্ধনও কখনো ক্ষীণ হয়নি। তিনি নিজেকে কুলী বলতে সঙ্কুচিত হননি, বাণিয়া বলতেও সঙ্কুচিত হননি। অস্পৃশ্যতা-বর্জন যেমন তাঁর মন্ত্র, শ্রেণীবিভক্ত সমাজের নিত্যতায় তাঁর তেমনি অটল বিশ্বাস।[২৮]

কুলীকামিনের, গরীব-চাষীর, ক্ষেতমজুরের দুর্দশায় গান্ধীজীর হৃদয় বিগলিত হত, মাত্রাতিরিক্ত শোষণ ও জুলুমের প্রতিবাদ তিনি করতেন। কিন্তু শোষণব্যবস্থার অবসানকল্পে সশস্ত্র বিপ্লব তাঁর কাছে অধর্ম ও ভীষণ ক্ষতিকর মনে হতো। গিরমিটিয়া বা সর্বহারা শ্রমিককে তিনি শেষ পর্যন্ত দেখেছিলেন এক অমানবিক বৃহৎ যন্ত্র-শিল্পের অপপ্রসব হিসাবে, দুর্ভাগা শিকার হিসাবে। নূতন সমাজের নির্মাতা অগ্রদূত হিসাবে তিনি তাদের দেখেননি। তিনি বারবার ফিরে চেয়েছেন প্রাচীন গ্রামসমাজ। সে অতীত অপ্রাপণীয়, তাই বর্তমানের সঙ্গে বারে বারে গান্ধীজীর আপোসও অনিবার্য ছিল।

॥ চার ॥

বোয়ারযুদ্ধের সময় গান্ধীজীর নেতৃত্বে ভারতীয় সেবাদল বৃটিশ-পক্ষে কাজ করেছিল। ১৯০৬ সালে নাটালে জুলু-বিদ্রোহের সময়ও

গান্ধীজীর নেতৃত্বে ভারতীয় সেবাদল বিদ্রোহদমনকারী বৃটিশ সরকারের পক্ষে কাজ করেছিল। একথা ঠিক যে এই ভারতীয়দের অন্য কোন কাজ করতে দেওয়া হয়নি—আহত ও মরণাপন্ন জুলুদের চিকিৎসা বা শুশ্রূষার কাজে কোন শ্বেতাঙ্গ পাওয়া যায়নি, সেই কাজটাই এঁদের ওপর দেওয়া হয়েছিল। তথাপি, কাজটা ছিল বিদ্রোহীদের বিপক্ষে বৃটিশরাজের সহযোগিতা, এবং সেই সহযোগিতা করার উদ্দেশ্যেই গান্ধীজী গিয়েছিলেন, জুলুদের সেবা করার উদ্দেশ্য নিয়ে যাননি।

> আমার জুলুদের সঙ্গে কোন শত্রুতা ছিল না। জুলুরা একজন ভারতবাসীরও ক্ষতি করে নাই।… কিন্তু ইংরাজ রাজত্বকে তখন আমি জগতের কল্যাণকামী রাজত্ব বলিয়া মানিতাম। আমার এ বিশ্বাস ও অনুরাগ হৃদয়ের বস্তু ছিল। সুতরাং সে রাজত্বের বিনাশ আমি ইচ্ছা করিতাম না। সেই জন্যই বল ব্যবহার করার নীতি-অনীতি সম্বন্ধে আমার সিদ্ধান্ত [—অহিংসানীতি আমাকে আমার সঙ্কল্প হইতে নিরস্ত করিতে পারিল না।… যাহা হউক আমার হৃদয় জুলুদের তরফেই ছিল।…যখন আমাদে উপর আহত জুলুদের সেবা করার ভার পড়িল, তখন আমি সন্তুষ্ট হইলাম।… যে রোগীদের আমাদের শুশ্রূষা করিতে হইত তাহারা লড়াইতে জখম হইয়াছে একথাও যেন কেহ না মনে করেন। ইহাদের কতক ছিল সন্দেহবশে ধৃত কয়েদী। ইহাদিগকে জেনারেল চাবুক খাওয়ার সাজা দিয়াছিলেন। সেই চাবুকে ঘা, শুশ্রূষার অভাবে পাকিয়া উঠিয়াছিল। আর অন্য ভা ছিল সেই সব জুলু যাহারা মিত্র ছিল।… তাহাদিগকে ভু করিয়া সিপাহীরা ঘায়েল করিয়াছিল।
>
> ইহা ছাড়া আমাকে শ্বেতাঙ্গ সিপাহীদের জন্যও ঔষধ রাখা ঔষধ দেওয়ার ভার দেওয়া হইয়াছিল।…
>
> "বুয়ার যুদ্ধে গিয়াও যুদ্ধের ভয়ঙ্করত্ব আমার কাছে তত স্পষ্ট নাই, যতটা এই জুলু বিদ্রোহে হইয়াছিল। এ তো যুদ্ধ নয়, কেবল মানুষ শিকার করা হইতেছিল।…[২৯]

১৮৮৬ সালে বৃটিশ সরকার জুলুল্যাণ্ড দখল করে নেওয়ার পর থেকেই জুলুদের ওপর শোষণ-অত্যাচারের মাত্রা বাড়ছিল। জুলুরা যাতে ক্ষেতে খামারে বাগিচায় খনিতে মজুর হিসেবে খাটতে বাধ্য হয় সেজন্য, অন্যান্য আফ্রিকান জাতির মতোই, জুলুদের ওপর নানা রকম ট্যাক্স বসানো হয়েছিল। ট্যাক্সের টাকা জোগাড় করতে হলে মজুর হয়ে খাটা ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। কৃষি ও পশুপালন দ্বারা জীবননির্বাহের ক্ষুদ্র-গ্রামীণ অর্থনীতি থেকে আধুনিক মুদ্রা-অর্থনীতিতে মানুষকে টেনে আনার এই উপায় সব দেশেই ব্যবহার করা হয়েছিল, জবরদস্তির পরিমাণ কোথাও বেশি কোথাও কম। জুলুদের ওপর জবরদস্তির বহর ছিল মাত্রাছাড়া। জমির খাজনা দিতে হবে, ঝুপড়িঘরের জন্য ট্যাক্স দিতে হবে, জরিমানা দিতে হবে, খাটুনী ছেড়ে পালালে চাবুক খেতে হবে। ১৯০৫ সালের শেষাশেষি চাপল 'পোল্-ট্যাক্স'—মাথাপিছু ট্যাক্স দিতে হবে। চড়া খাজনা আর মহাজনের সুদ জোগাতে জোগাতে জুলুরা তখন জেরবার হয়ে গেছে। এই পোল্-ট্যাক্স আদায় করতে যখন পুলিস গেল, তখন একটা গ্রামে জুলুরা ট্যাক্স দিতে অস্বীকার করল। ধস্তাধস্তির মধ্যে দুজন শ্বেতাঙ্গ পুলিসের মুণ্ডু কাটা পড়ে। তৎক্ষণাৎ সামরিক আইন জারী হল, সৈন্যদল এল, বারোজন জুলু নেতাকে ধরে নিয়ে গিয়ে কোর্টমার্শালের বিচারে ফাঁসীর হুকুম দেওয়া হল। লণ্ডনের সরকার প্রকাশ্য প্রাণদণ্ডে আপত্তি জানালেন, নাটালে মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করল; লণ্ডনের সরকার পিছু হঠল; মন্ত্রিসভা পুনরায় বহাল হল, প্রাণদণ্ডের হুকুম তামিল হল। এবার জুলুদের বিদ্রোহ ফেটে পড়ল। গোটা দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ সৈন্যবাহিনী নাটালে পাঠিয়ে রক্তের বন্যা বইয়ে বিদ্রোহ দমন করা হল। চার হাজার জুলুর সঙ্গে বিদ্রোহের নেতা বাম্‌বাটাকে হত্যা করা হয়, শ্বেতাঙ্গ নিহতের সংখ্যা ২৫ জন।[৩০]

গান্ধীজী লিখেছেন, "বিদ্রোহের স্থানে পৌঁছিয়া আমি দেখি যে ইহাকে বিদ্রোহ বলা যায় না। বিপক্ষের কাহাকেও দেখিতে পাওয়া

গেল না ;” কিন্তু “প্রাতঃকালেই সৈন্যেরা গ্রামের মধ্যে গিয়া পটকা ফাটানোর মত বন্দুকের আওয়াজ করিত ; আমরা দূর হইতে শুনিতে পাইতাম।”[৩১] চার হাজার মানুষ মারার খবর গান্ধীজী টের পাননি।

ভারতীয়দের আন্দোলনে প্রথমদিকে নানারকম সঙ্কীর্ণতা ছিল, জাত্যভিমান ছিল, সেকথা উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমদিকে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা ও বৃত্তিজীবীরা নিজেদের ‘গিরমিটিয়া’ ও ‘অস্পৃশ্য’ বর্ণের ভারতীয়দের থেকে পৃথক্ উচ্চসম্প্রদায়ের মানুষ বলে দাবীদাওয়া জানাতেন। শাসকরা তাঁদের বংশমর্যাদা ও শিক্ষা-সভ্যতা-সাচ্ছল্য খেয়াল না করে তাঁদের কালো আফ্রিকান জুলু ‘নেটিভ্’দের সমপর্যায়-ভুক্ত করত, তাতে তাঁরা আহত বোধ করতেন। স্বয়ং গান্ধীজী পর্যন্ত প্রথমদিকে এই বিচিত্র সঙ্কীর্ণ বুদ্ধি থেকে মুক্ত ছিলেন না। ১৮৯৫ সালের মে মাসে বৃটিশ সরকারের উপনিবেশ-দপ্তরের মন্ত্রী লর্ড রিপনের কাছে এক ‘পিটিশন’ গান্ধীজী রচনা করেছিলেন,—তাতে এক জায়গায় অনুযোগ করা হয়েছিল, কাফিরদের প্রতি যেরকম ব্যবহার করা হয় ভারতীয়দের প্রতি সেইরকম ব্যবহার করা হচ্ছে ; সম্পত্তিবান ভারতীয়দেরও রেলগাড়িতে প্রথম শ্রেণী বা দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় উঠতে দেওয়া হয় না, “নেটিভ্দের সঙ্গে একই কামরায় গাদাগাদি করে তাদের যাতায়াত করতে হয়।”[৩২] ১৮৯৫ সালের অগস্ট মাসে নাটাল ইণ্ডিয়ান কংগ্রেসের প্রথম বার্ষিক বিবরণীতে গান্ধীজী লিখেছিলেন—“পোস্ট-অফিসগুলোয় ইউরোপীয়ানদের জন্য একটা প্রবেশপথ আর এশিয়াটিকদের জন্য ও নেটিভ্দের জন্য পৃথক একটা প্রবেশপথ থাকত, তাই নিয়ে সরকারের কাছে চিঠিপত্র লেখা হয়েছিল। তার ফল খুব খারাপ হয়নি ; এখন তিন সম্প্রদায়ের পৃথক পৃথক তিনটি প্রবেশপথ রাখা হবে।”[৩৩] ‘নেটিভ্’দের সঙ্গে এক প্রবেশপথ ক্ষোভের কারণ ছিল, তা এ থেকেও দেখা যায়।

এই অবস্থায় কালোমানুষদের স্বাধিকার-প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে প্রথমদিকে ভারতীয়রা হাত মেলাননি। ভারতীয়দের আন্দোলন

আফ্রিকানদের মধ্যে সাড়া জাগিয়েছিল, গণ-আন্দোলনের একটা নতুন কায়দা দেখিয়েছিল, তার খানিকটা গৌরব ভারতীয়দের প্রাপ্য। কিন্তু আফ্রিকানদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার কথা তখনকার ভারতীয়রা ভাবতে পারতেন না। অপরদিকে আফ্রিকানদের মধ্যেও ভারতীয়দের সম্পর্কে নানা সন্দেহ অবিশ্বাস ও অসন্তোষ ছিল। ঐক্যের আবহাওয়া আসতে প্রায় পঞ্চাশ বছর সময় লেগেছিল। ১৯৩৯ সালেও গান্ধীজী মনে করতেন যে দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের সমস্যা আর আফ্রিকানদের সমস্যা এক নয়, অ-শ্বেতাঙ্গদের যুক্তফ্রন্ট গঠন করা ভুল হবে।[৩৪]

১৯৪৬ সালে ট্রান্সভালে ইণ্ডিয়ান কংগ্রেসের নেতা ডাঃ ইউসুফ দাদু এবং নাটালে ইণ্ডিয়ান কংগ্রেসের নেতা ডাঃ গঙ্গাধর নাইকার ভারতীয়দের নতুন আইন-অমান্য আন্দোলনের সময় আফ্রিকান-ভারতীয় যুক্তফ্রন্টের সম্ভাবনার পথ খুলে দিয়ে ইতিহাসের আরেক অধ্যায় শুরু করেন।

সপ্তম অধ্যায়

বৃটিশ-বোয়ার মিলন

॥ এক ॥

ইউনিয়ন-সংবিধান

বোয়ার-যুদ্ধে জয়লাভ করার পর বৃটিশ সরকারী মহলে বোয়ার-বন্ধুত্বের ঝোঁক প্রবল হয়ে উঠল। যুদ্ধের সময় বৃটেনে লিবারাল নেতারা যুদ্ধের বিরোধিতা করেছিলেন, যুদ্ধের পর বৃটেনে লিবারাল পার্টির সরকার হয়েছিল; শান্তির আকাঙ্ক্ষা, শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে সংঘর্ষের পরিবর্তে সম্প্রীতির আকাঙ্ক্ষা, উদারনৈতিক মহানুভবতা, ইত্যাদি ছাড়া এই ঝোঁকের অন্য কারণও ছিল। মহাযুদ্ধ যদি বাধে, তাহলে তার আগে দক্ষিণ আফ্রিকার বোয়ারদের জার্মান-প্রীতি ঘুচিয়ে বৃটিশ-পক্ষে নিয়ে আসার চেষ্টা করা দরকার, এই হিসেবও ছিল।

বৃটিশ-বোয়ারের মিলন একটা শর্তেই হতে পারত—দক্ষিণ আফ্রিকার কালো ও বাদামী মানুষদের ওপর অক্ষুণ্ণ ও অবাধ শ্বেতাঙ্গ স্বৈরশাসন। কালো-বাদামী মানুষদের ওপর বোয়ারদের শোষণ-জুলুমের বিরুদ্ধে, বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে, বৃটিশ-তরফ থেকে বোয়ার-যুদ্ধের সময় যেসব বড় বড় নীতিবাক্য প্রচার করা হয়েছিল, যুদ্ধের পর সেগুলোয় জলাঞ্জলি দেওয়া হল। বৃটিশ লিবারাল সরকারের উদারনৈতিক ভঙ্গীটা ছিল, দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাপারে তাঁরা পারত-পক্ষে হস্তক্ষেপ করবেন না; দক্ষিণ আফ্রিকার যারা বাসিন্দা তারাই দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যাপার ভালো বোঝে, তাদের সিদ্ধান্তে বৃটিশ সরকার সায় দিয়ে চলবে। এক্ষেত্রে 'দক্ষিণ আফ্রিকার বাসিন্দা' মানে শ্বেতাঙ্গ বাসিন্দা।

১৯০৬ সালে কেপ্ কলোনীতে 'বিদ্রোহী' বোয়ারদের ভোটাধিকার ফিরিয়ে দেওয়া হল। ১৯০৬ সালে ট্রান্সভালে শ্বেতাঙ্গদের ভোট ও

স্বায়ত্তশাসন পুনঃপ্রবর্তিত হল; ১৯০৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ট্রান্সভালে মন্ত্রিসভা গঠিত হল, প্রধানমন্ত্রী জেনারেল বোথা, উপনিবেশ মন্ত্রী জেনারেল স্মাট্‌স্। অরেঞ্জ রাজ্যে নির্বাচন হল ১৯০৭ সালের নভেম্বর মাসে, প্রধানমন্ত্রী হলেন আব্রাহাম ফিশার।

চারটি রাজ্য এক করে 'ফেডারেশন' বা 'ইউনিয়ন' গঠন করার সপক্ষে বৃটিশ-মহলের প্রচেষ্টা তো ছিলই, বোয়ার-মহলেও এ সময় ওই প্রস্তাবের সপক্ষে জোরাল মত সৃষ্টি হয়েছিল। ট্রান্সভালের বোয়ার-নেতারা,—বোথা, স্মাট্‌স্, হার্টৎসগ প্রভৃতি যাঁরা যুদ্ধের সময় বিখ্যাত হয়ে উঠেছিলেন—এ সময় এ প্রস্তাবের সমর্থক হয়ে ওঠেন। বোয়ার-নেতাদের একটা ভয় ছিল: 'ইউনিয়ন' হলে বৃটিশ সরকার ট্রান্সভালেও কালো-বাদামী মানুষদের ভোটাধিকার দেবার কথা বলবে, অন্ততঃ কেপ্ কলোনীতে যেরকম উপার্জনগত-শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে বাছাই করা স্বল্পসংখ্যক অ-শ্বেতাঙ্গের ভোট আছে, সেইরকম সীমিত অধিকার দেওয়ার কথা উঠবে। কিন্তু ১৯০৩ থেকে ১৯০৬ সাল পর্যন্ত প্রত্যক্ষ বৃটিশ-শাসনের সময় যেভাবে ট্রান্সভালে কালো-বাদামী মানুষদের প্রবেশ-নিয়ন্ত্রণ ও অধিকার-নিবারণ আইন চালু হয়, ১৯০৬-৭ সালে নাটালে বৃটিশ সরকার যেরকম নৃশংসভাবে জুলুবিদ্রোহ দমন করে, ১৯০২ থেকে ১৯০৬ সাল পর্যন্ত কেপ্ কলোনীতে যেভাবে ধাপে ধাপে 'এশিয়াটিক'দের প্রবেশ-নিয়ন্ত্রণ এবং কার্যতঃ প্রবেশ-নিষেধ করার আইন জারী করা হয়, ১৯০৭ সালে ট্রান্সভালে বোথা-মন্ত্রিসভার 'এশিয়াটিক'-প্রবেশ-নিয়ন্ত্রণ আইন যেরকম নির্বিবাদে বৃটিশরাজের সম্মতি ('রয়্যাল অ্যাসেন্ট') পেল, তাতে বোয়ার-নেতারা আশ্বস্ত হয়েছিলেন।[১]

১৯০৮ সালের মে মাসে রেলওয়ে এবং কাস্টম্‌স্-এর ব্যাপারে যৌথ ব্যবস্থা করার জন্য চারটি রাজ্যের সরকারের প্রতিনিধিদের এক সম্মেলনে জেনারেল স্মাট্‌স্ চারটি রাজ্যকে একত্র করে 'ফেডারেশন' বা 'ইউনিয়ন' গঠনের প্রক্রিয়া-পদ্ধতি সম্বন্ধে যেসব

প্রস্তাব করেন, সেগুলি সবই গৃহীত হয়। রোডেশিয়াকেও প্রস্তাবিত ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত করার কথা প্রস্তাবগুলোর মধ্যে ছিল, সেটা মনে রাখতে হবে।

স্থির হল, চারটি রাজ্যের আইনসভা থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিরা এক "জাতীয় কনভেনশনে" বসে 'ইউনিয়ন'-রাষ্ট্রের সংবিধান ও আনুষঙ্গিক ব্যাপারগুলো সাব্যস্ত করবেন। ১৯০৮ সালের ১২ই অক্টোবর থেকে ১৯০৯ সালের ৩রা ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত 'কনভেনশন' হল। ৬০ জন প্রতিনিধি রুদ্ধদ্বার কক্ষে বসে সংবিধান রচনা করলেন। সবাই শ্বেতাঙ্গ, সবাই শাসক।

সংবিধান রচনা সহজ কাজ ছিল না। প্রথম জটিল সমস্যা ছিল নূতন 'ইউনিয়ন'-পার্লামেন্টে প্রতিনিধিসংখ্যার সন্তোষজনক বণ্টন। নানারকম তর্কবিতর্কের পর যা মীমাংসা হল তাতে বোয়াররা বৃটিশ-দের তুলনায় আনুপাতিকভাবে বেশি আসন পেল। শহরাঞ্চলে যতজন ভোটার একজন পার্লামেন্ট-সদস্য নির্বাচন করবে, গ্রামাঞ্চলে তার চেয়ে অনেক কমসংখ্যক ভোটার একজন পার্লামেন্ট-সদস্য নির্বাচন করবে—এই যে ব্যবস্থা হল, বোয়াররা তার সুযোগ পেল দীর্ঘকালের জন্য। কেপ্ প্রদেশের বাসিন্দাদের তুলনায় ট্রান্সভাল-অরেঞ্জের বাসিন্দারা লোকসংখ্যার অনুপাতে বেশি আসন পেল। কেপ্ প্রদেশ পেল ৫১টি আসন, ট্রান্সভাল ৩৬টি, অরেঞ্জ ১৭টি এবং নাটাল ১৭টি।

দ্বিতীয় প্রশ্ন, অ-শ্বেতাঙ্গদের ভোট সম্বন্ধে। অন্য রাজ্যে অ-শ্বেতাঙ্গদের ভোটাধিকারের কথা একটু উঠেই খতম হয়ে গেল, প্রশ্ন হল কেপ্ প্রদেশে ভোটার-তালিকায় অ-শ্বেতাঙ্গদের স্থান নিয়ে। ১৯০৯ সালে কেপ্ প্রদেশে ভোটার-তালিকায় মোট ১ লক্ষ ৪২ হাজার ৩৬৭ জন ভোটারের মধ্যে ১৪ হাজার ৩৯৪ জন (১০.১%) ছিল মিশ্র-বর্ণের মানুষ, আর ৬ হাজার ৬৩৭ জন (৪.৭%) ছিল কৃষ্ণাঙ্গ আফ্রিকান। সাব্যস্ত হল, ইউনিয়ন-পার্লামেন্টের নির্বাচনে কৃষ্ণাঙ্গ

আফ্রিকানদের কোন ভোটাধিকার থাকবে না। কেপ্ প্রদেশের প্রাদেশিক বিধানসভায় ওই সাড়ে ছয় হাজার আফ্রিকান ভোটারের ভোট আপাতত বজায় থাকল। কিন্তু এ অধিকারটুকু বাতিল করার ব্যবস্থাও থাকল—পার্লামেন্টে দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সমর্থন থাকলে তা করা যাবে।

কেপ্ প্রদেশের মিশ্রবর্ণ ভোটারদের নিয়ে একটু বেশি বিতর্ক হয়েছিল। সে সময়ে মিশ্রবর্ণ মানুষরা শাসক শ্বেতাঙ্গদের কাছাকাছি থাকতে প্রাণপণে চেষ্টা করত। শাসকরা মাঝে মাঝে এদের পিঠ চাপ্‌ড়াতো, শ্বেতাঙ্গ সাজার প্রচেষ্টায় বাহবা দিত। আসলে এরা শাদা আর কালো উভয় বর্ণেরই অবজ্ঞা ও ঘৃণা কুড়োত। দক্ষিণ আফ্রিকা এদের জন্মভূমি, এদের অধিকাংশের ভাষা বোয়ার-ভাষা। কেপ্ কলোনীতে এদের ১৪ হাজার ভোট কোন কোন শ্বেতাঙ্গ রাজনীতিকের ভোটের খেলায় দরকারী ছিল; আবার কেউ কেউ এদের প্রতি যথার্থ সহানুভূতিশীল ছিলেন। এদের ভোটাধিকার রক্ষার জন্য এবং 'ইউনিয়ন'-পার্লামেন্টের নির্বাচনেও এদের ভোটাধিকার দেওয়ার জন্য কেপ্ কলোনীর কয়েকজন প্রতিনিধি খুব তর্কবিতর্ক করেছিলেন।[২] কিন্তু স্থিত অবস্থা বজায় রাখার বেশি আর কিছু করতে অধিকাংশ প্রতিনিধির তীব্র আপত্তি ছিল। কেপ্ প্রদেশের প্রাদেশিক আইনসভার নির্বাচনে মিশ্রবর্ণের ভোটাধিকার থাকল। বলা হল পার্লামেন্টে দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতি ছাড়া এই অধিকারের পরিবর্তন করা যাবে না। পরবর্তীকালে সংবিধান-লঙ্ঘন, মামলা-মোকদ্দমা, সংবিধান-সংশোধন প্রভৃতি নানা প্রক্রিয়া করে মিশ্রবর্ণের এই অধিকারটুকুও লোপ করে দেওয়া হয় ১৯৫৬ সালে।

ইংরেজী এবং ওলন্দাজ দুটি ভাষাই সরকারী ভাষা সাব্যস্ত হল। রোডেশিয়া, বেচুয়ানাল্যাণ্ড, বাসুটোল্যাণ্ড ও সোআজিল্যাণ্ডকে বৃটিশ সরকার পরে ইউনিয়নের সঙ্গে জুড়ে দিতে পারবেন সে ব্যবস্থা রইল।

সংবিধানের এই খসড়া বৃটিশ পার্লামেণ্টে পেশ হল। বর্ণ বৈষম্যের বিরুদ্ধে কিছু প্রতিবাদ হল, বৃটিশ সরকার তাতে কর্ণপাত করলেন না। কেপ্ কলোনীর প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী উইলিয়ম শ্রাইনার দুই আফ্রিকান নেতা ওআলটার রুবুসানা ও জন তেঙ্গো জাবাভু-কে সঙ্গে নিয়ে প্রতিবাদ জানাতে লণ্ডনে ছুটে গিয়েছিলেন—কোন পাত্তা পাননি।

১৯০৯ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর 'সাউথ আফ্রিকা অ্যাক্ট' বৃটিশ-রাজের সম্মতি পেল। দক্ষিণ আফ্রিকায় বৃটিশ-বোয়ার ঐক্যের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হল।

॥ দুই ॥

বোয়ার-জাতীয়তাবাদ

বোয়ার-বৃটিশে মিলিত রাষ্ট্র হল বটে, কিন্তু বোয়ার-জাতীয়তাবাদ ক্ষীণ হল না। দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ রাজনীতিতে বৃটিশবিরোধী বোয়ার-জাতীয়তাবাদের অন্তঃস্রোত সর্বদা চলেছে। ১৯৫৮ সালের নির্বাচনের সময়েও লিবারাল পার্টির নেতা অ্যালান প্যাটন লিখে-ছিলেন, "দেখা যাচ্ছে ভোটারদের সামনে (তারা সবাই শ্বেতাঙ্গ) প্রশ্ন একটাই, বোয়ার-যুদ্ধটা মনে রাখা হবে, নাকি ভুলে যাওয়া হবে?"[১]

বোয়ার-জাতীয়তাবাদের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে একটা নির্দোষ উপাদান তাদের ভাষা। ভাষা নিয়ে বোয়ারদের মধ্যে একটা আন্দোলন অনেকদিন থেকেই চলছিল, বোয়ার-যুদ্ধের পর সে আন্দোলন জাতীয় আন্দোলন হয়ে ওঠে। যুদ্ধে পরাজিত বোয়াররা নিজেদের ভাষার জন্য এই আন্দোলনে জাতি হিসেবে নিজেদের অভিব্যক্তির একটা পথ পেয়েছিল।

দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম বাসিন্দা বোয়ারদের ভাষা ছিল ওলন্দাজ। কালক্রমে হল্যাণ্ডের ওলন্দাজ ভাষা থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার

বোয়ারদের ভাষা বেশ পৃথক হয়ে পড়ে। অন্যান্য ভাষার বহু শব্দ এখানে বোয়ারদের ভাষায় এসে পড়ে, ব্যাকরণও অনেক সরলীকৃত হয়ে যায়। উনবিংশ শতাব্দীতে হল্যাণ্ডের সাধুভাষা—যাকে 'হাই ডাচ্' বলা হয়, তার থেকে বোয়ারদের দৈনন্দিন জীবনের ভাষার পার্থক্য বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বোয়ারদের ধর্মানুষ্ঠানে, লেখাপড়ায়, সরকারী কাজকর্মে তখনো 'হাই ডাচ্' ব্যবহার হচ্ছিল, কিন্তু বহু মানুষই ও ভাষা বুঝত না। বোয়ারদের নিজেদের ভাষা এ সময়ে 'টাল্' (Taal) বলে পরিচিত হয়েছিল।

১৮৭৫ সাল নাগাদ 'টাল্' ভাষাকে সাহিত্যের ভাষায় উন্নীত করার প্রচেষ্টা এবং 'টাল্' ভাষাকেই বোয়ারদের আপন ভাষা বলে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার আন্দোলন শুরু হয়। বোয়ারদের মধ্যে তখন দুটো দল হয়। একদল প্রবীণ রক্ষণশীল, তাঁরা এই অ-সংস্কৃত মেঠো ভাষাকে ধর্মকর্ম, প্রশাসন, জ্ঞানচর্চা বা সাহিত্যকর্মের ভাষা বলে মানতে রাজী হননি ; আরেকদল নবীন, জীবন্ত আধুনিক ভাষার সপক্ষে উগ্র প্রচারক।

১৮৯০ সালে সিসিল রোড্স্ যখন কেপ্ কলোনীর প্রধানমন্ত্রী, তখন বৃটিশ-বোয়ার মিলনের প্রচেষ্টায় তিনি কেপ্ কলোনীর স্কুলগুলোয় ইংরেজী ও 'হাই ডাচ্' দুটো ভাষাই শিক্ষার জন্য উৎসাহ দেবার নীতি মেনে নেন। ওদিকে ট্রান্সভালের বোয়ার-রাষ্ট্র কিন্তু 'ইংরেজী হঠাও' শুরু করেছিল। সেখানে শিক্ষাবিভাগের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ডক্টর মান্স্ফেল্ট ১৮৯৮ সালে স্কুলগুলো থেকে ইংরেজী শিক্ষা বিতাড়ন করেন। ইংরেজীভাষীরা নিজেদের আলাদা স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে বাধ্য হয়। বোয়ার-যুদ্ধের পেছনে এটা একটা গৌণ কারণ বলে উল্লেখ করা হয়ে থাকে।

বোয়ার-যুদ্ধের পর প্রথম দু'একটা বছর ইংরেজ প্রশাসকরা সর্বত্র বাধ্যকরী ভাবে ইংরেজী ভাষা চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করেছিল। বোয়ারদের আপন ভাষা ভুলিয়ে দিয়ে ইংরেজ বানানোর চেষ্টা

হচ্ছিল। স্কুলগুলোয় ডাচ্ ভাষা বরদাস্ত করা হচ্ছিল নামে মাত্র। ডক্টর মান্‌স্‌ফেল্টকে উল্টোদিকে ছাড়িয়ে যাবার চেষ্টা হচ্ছিল।[৪]

স্বভাবতই আপন ভাষার জন্য বোয়ারদের আকুতি প্রবল হয়ে ওঠে, এবং ইংরেজী-বিরোধিতাও প্রবল হয়ে ওঠে। এবার নিজেদের আলাদা স্কুল গড়ার পালা বোয়ারদের। ট্রান্সভালে ও অরেঞ্জ প্রদেশে তারা প্রায় ২০০ স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিল—ডাচ্ ভাষায় শিক্ষাদানের জন্য। এ ব্যাপারে হল্যাণ্ড থেকে কিছু সাহায্য এসেছিল।

বোয়াররা এ সময়ে জাতি হিসেবে নিজেদের একটা নাম খুঁজছিল। 'বোয়ার' নামটা তাদের পছন্দ হবার কথা নয়—'চাষা-গাঁইয়া' বলে নিজেদের জাতিপরিচয় দেওয়া কে পছন্দ করে? 'আফ্রিকান্‌ডের', 'আফ্রিকানের', 'আফ্রিকান' প্রভৃতি শব্দগুলো এ সময়ে চালু হয়। এরা কালো আফ্রিকান জাতিগুলিকে আফ্রিকান বলতে অস্বীকার করছিল, দক্ষিণ আফ্রিকায় তাদের কোন অধিকার এরা মানবে না ব'লে। 'নেটিভ্' শব্দটাও ক্রমে অগ্রাহ্য হয়ে যায় একই কারণে—সে জায়গায় আসে 'বান্টু'। নিজেদেরকেই যথার্থ আফ্রিকান বলে চালাতে বদ্ধপরিকর বোয়াররা শেষ পর্যন্ত নিজেদের নাম দেয় 'আফ্রিকানের' এবং নিজেদের ভাষার নাম দেয় 'আফ্রিকান্‌স্'। ১৯১৪ সালে 'হাই ডাচ্'কে সরিয়ে স্কুলগুলোয় এই ভাষা চালু করা হয়, ১৯১৬ সালে ধর্মানুষ্ঠানে 'হাই ডাচ্'-এর জায়গায় এই ভাষা স্বীকৃত হয়, এবং ইংরেজীর সমান মর্যাদাবিশিষ্ট সরকারী ভাষা হিসেবে 'আফ্রিকান্‌স্' ভাষা স্বীকৃতি পায় ১৯২৫ সালে।

বোয়ার-জাতীয়তাবোধের একটা উপাদান তাদের এই ভাষা। আরেকটা উপাদান ইংরেজদের বিরুদ্ধে তাদের বংশপরম্পরাগত আক্রোশ। ১৮৩৭ সালে ইংরেজ সরকার ক্রীতদাস-প্রথা অবসান করে বোয়ারদের বিপন্ন করেছিল; ইংরেজদের উৎপাতে বোয়াররা নিজেদের পুরনো বাসভূমি কেপ্ অঞ্চল ছেড়ে উত্তরমুখে মহা-অভিযানে যেতে বাধ্য হয়েছিল; ইংরেজরা সেখানেও তাদের শান্তিতে থাকতে

দেয়নি, ১৮৭৭ সালে ট্রান্সভাল দখল করেছিল; তারপরে মাজুবা পাহাড়ের যুদ্ধে বেদম মার খেয়ে ট্রান্সভাল ছেড়ে দিলেও, বেহায়া ইংরেজরা আবার ১৮৯৫ সালে 'জেমসন-হামলা' চালিয়েছিল; জেমসন-হামলা ব্যর্থ হল, কেলেঙ্কারী কাণ্ড হল, তবু আবার চার বছর যেতে না যেতেই 'বোয়ার যুদ্ধ' বাধিয়ে ইংরেজরা ট্রান্সভাল ও অরেঞ্জ রাজ্য গ্রাস করল। বোয়ারদের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে ইংরেজদের আচরণ এই রকম। ইংরেজরা আজও বোয়ারদের মুখে এইসব কথা শোনে, আর সঙ্কুচিত হয়। দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গদের তুটো পৃথক সম্প্রদায় রয়ে গেছে—বোয়ারদের উত্তরপুরুষ 'আফ্রিকান্‌স্‌'-ভাষী 'আফ্রিকানের' শ্বেতাঙ্গ, আর ইংরেজীভাষী শ্বেতাঙ্গ। ইংরেজীভাষীরা সংখ্যালঘু, শতকরা ৪০ ভাগ। অ-শ্বেতাঙ্গদের শোষণপীড়ন করার ব্যাপারে এই তুই সম্প্রদায় আবার ঐক্যবদ্ধ।

বোয়ার-জাতীয়তাবোধের মধ্যে তাদের ভাষা এবং ইংরেজের বিরুদ্ধে আক্রোশ প্রধান উপাদান নয়। এ জাতীয়তাবোধের প্রধান উপাদান অ-শ্বেতাঙ্গ মানুষদের ওপর তাদের কল্পিত শ্রেষ্ঠত্ব সংরক্ষণের উগ্র আকুতি। এই আকুতির মধ্যে একদিকে রয়েছে দেশের ধন-দৌলত বিষয়সম্পত্তির প্রায় সবটা গ্রাস করে বসে থাকার স্বার্থপর লোভ, প্রভুত্ব ও স্বৈরাচারী ক্ষমতা আঁকড়ে থাকার বিকট মোহ, শ্বেত-সভ্যতার অন্তঃসারশূন্য দম্ভ; আরেক দিকে উদ্বেগ-আশঙ্কা-আতঙ্ক। এরা একদিকে যেমন বিশ্বাস করে যে কালোমানুষের চেয়ে শাদা-মানুষ মাত্রেই সর্বাংশে উন্নত, এবং কালোমানুষ মাত্রেই জন্তুর সমতুল্য; আরেকদিকে এরা তেমনি বিশ্বাস করে যে শ্বেতাঙ্গদের চারপাশে সংরক্ষণের প্রাচীর তুলে না রাখলে, আর কড়া পাহারার মধ্যে কালোমানুষদের শাসন ও দমন না চালালে, শাদামানুষের ছোট্ট দ্বীপটুকু কালোমানুষের সমুদ্রে ভেসে ডুবে যাবে। কালোমানুষদের ওপর অত্যাচার যত বাড়ানো হয়, শ্বেতাঙ্গদের আরেকটা ভয়ও তত বাড়ে—ওরা যদি কোনোদিন ফাঁক পায় তাহলে তো এসবের বদ্‌লা

নেবে! সেই ভয়ঙ্কর সম্ভাবনার কথা ভেবে শ্বেতাঙ্গ সম্প্রদায় আরো ভয়ঙ্কর হয়ে ওঠে।

॥ তিন ॥

যৌন-আতঙ্ক

দক্ষিণ আফ্রিকায় বোয়ার-জাতীয়তাবোধের প্রধান উপাদান কৃষ্ণ-আতঙ্ক। সে আতঙ্কের মধ্যে আবার একটা বিশেষ আতঙ্ক যৌন-আতঙ্ক। শাদা নারীর সঙ্গে কালো পুরুষের মিলন বোয়ারদের কাছে একটা বিভীষিকা। প্রসঙ্গটা কদাচিৎ খোলাখুলি আলোচনা হতো, শুচিবায়ুগ্রস্ত শ্বেতাঙ্গ-সমাজে বিষয়টা অনুচ্চার্য ছিল। কিন্তু প্রসঙ্গটা অনুচ্চার্য হলেও—অথবা অনুচ্চার্য বলেই হয়তো—মনের গভীর প্রদেশ এই বিভীষিকায় আচ্ছন্ন থাকত, এক জটিল মানসিক বিকৃতির উৎস সেখানে। শ্বেতাঙ্গ পুরুষ ভাবত, কালো মানুষের জঙ্গলের মধ্যে তার সংসার, কালো পুরুষের ঘৃণ্য লালসার দৃষ্টি বুঝি সর্বদা তার স্ত্রী-কন্যা-ভগ্নীর ওপর পড়ছে, সুযোগ পেলেই এই ঘৃণ্য লালসা চরিতার্থ করবে ওরা, বলাৎকার করবে শাদা মেয়েদের। কারু কারু আবার সেই সঙ্গে আরো ভয়ানক সন্দেহ ছিল—ওই কালো-পাথরে খোদাই-করা প্রায়-উলঙ্গ বলিষ্ঠ শরীর-গুলোর প্রতি শাদা মেয়েরা বোধ হয় আকৃষ্ট হয়। সর্বদা সতর্ক দৃষ্টি ও বিভীষিকার আবহাওয়া বজায় না রাখলে তারা ওই টানে ভেসে যাবে।

কালো পুরুষ কর্তৃক শাদা মেয়ের ওপর বলাৎকারের ঘটনা যে ঘটত না তা নয়। রক্ষকহীন অসহায় স্ত্রীলোকের ওপর বলাৎকার করার মতো চরিত্র পৃথিবীর সব জাতির মধ্যেই আছে। তেমনি কালো পুরুষের প্রতি শাদা মেয়ের আকৃষ্ট হওয়ার ঘটনাও ঘটত, আজো ঘটে। সেরকম আকর্ষণের মধ্যে কখনো কখনো এক ধরনের বিকৃত ক্ষুধাও থাকত, কালো পুরুষকে প্রলোভিত করে তারপর

তাকে বলাৎকারের অভিযোগে অভিযুক্ত করার ঘটনাও থাকত। আবার কালো পুরুষের প্রতি শাদা মেয়ের আকর্ষণ যে সব সময়ই অস্বাভাবিক ক্ষুধার বশে হতো তা-ও নয়,—স্বাভাবিক অনুরাগ-ভালোবাসার ফলে শাদা মেয়ে কালো পুরুষকে বরণ করে, তেমন ঘটনা আগেও ঘটত, এখনও ঘটে।

কিন্তু আতঙ্কগ্রস্ত শ্বেতাঙ্গ-সমাজের অধিকাংশ নারীপুরুষ এসব ভেবে দেখত না। কালো পুরুষ কর্তৃক শাদা মেয়ের ওপর বলাৎকারের ঘটনার সংখ্যা কত, শাদা-কালোয় স্বেচ্ছামিলনের সংখ্যা কত, সেসব বিবেচনা করার মতো অবস্থা তাদের ছিল না। এগুলো যে ব্যতিক্রম, এবং সব কালো মানুষই কামনাতাড়িত জন্তু নয়,—সেকথা ভাবতে গেলে তাদের বিভীষিকা দিয়ে গড়া আত্মসংরক্ষণের প্রাচীর ভেঙে পড়ে। এ সব কথা বা এসব ভাবনা শ্বেতাঙ্গমহলে জাতিদ্রোহী ভ্রষ্টাচারেরই লক্ষণ বলে মনে করা হত। কালো মানুষের প্রতি দয়া-ধর্ম বা ন্যায়বিচারের কথা উঠলে সে কথাবার্তার শেষ কথা—"কিন্তু, তোমার মেয়ে যদি…?"

এই জটিল মানসিক অবস্থা বোয়ার-জাতীয়তাবোধের একটা বিশেষ উপাদান হলেও, এটা শুধু বোয়ারদেরই বৈশিষ্ট্য নয়। মার্কিন দেশে শ্বেতাঙ্গরা তো সংখ্যাগরিষ্ঠ, কালোমানুষেরা সংখ্যালঘু ; কিন্তু সেখানে শ্বেতাঙ্গ-মহলে এই আতঙ্ক এবং আতঙ্ক-প্রসূত উন্মত্ততা বারবার দেখা গেছে। রোডেশিয়ায় শ্বেতাঙ্গদের অধিকাংশ তো বৃটিশ ; তারাও এই একই মানসিক ব্যাধিতে ভোগে। ফিলিপ ম্যাসন তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থে রোডেশিয়ার শ্বেতাঙ্গ মানসিকতার যে বিবরণ ও বিশ্লেষণ দিয়েছেন তাতে এই বিকৃতির চিত্র খুব স্পষ্ট।[৫]

এই চিত্রের আরেকটা অংশ আরো উৎকট। কালো পুরুষ ও শাদা মেয়ের মিলন অপরাধ—সে অপরাধে কালো পুরুষের শাস্তি কঠিন, শাদা মেয়ের শাস্তি কম ; শাদা পুরুষ ও কালো মেয়ের মিলন তত বড় অপরাধ নয়—যদি অপরাধ সাব্যস্ত হয়, তাহলে কালো

মেয়ের শাস্তি কঠিন, শাদা পুরুষের যদি কখনো শাস্তি হয় তবে তা নামমাত্র ; কালো পুরুষ কর্তৃক শাদা মেয়ের ওপর বলাৎকার ভয়ঙ্কর অপরাধ—শাস্তি প্রাণদণ্ড ; শাদা পুরুষ কর্তৃক কালো মেয়ের ওপর বলাৎকার অপরাধ—যদি বিচার হয় ও প্রমাণ হয়, তবে শাস্তি কয়েক মাস কারাদণ্ড।

শ্বেতাঙ্গ-মহলের আতঙ্কগ্রস্ত, বিকারগ্রস্ত, উত্তেজিত, হিংস্র আবহাওয়ায় কালোমানুষের যৌন-অপরাধের বিচারে ন্যায়নীতি বলে কিছু ছিল না। বলাৎকার নয়,—বলাৎকারের অভিযোগ, বলাৎকার-প্রচেষ্টার অভিযোগ, সন্দেহ, গুজব, শাদা মেয়ের বিকারগ্রস্ত দুঃস্বপ্ন—সবই কালোমানুষের প্রাণদণ্ডের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। শ্বেতাঙ্গ জুরী, শ্বেতাঙ্গ বিচারক কালো পুরুষকে কখনো রেহাই দিত না ; প্রাণদণ্ড না দিলে শ্বেতাঙ্গ বিচারক নিজের সমাজে হেয় হয়ে যেত। কখনো কদাচিৎ সরকারের উচ্চতম কর্তৃপক্ষ যদি সাক্ষ্যপ্রমাণের নিতান্ত অভাব দেখে কালোমানুষের প্রাণদণ্ড মকুব করে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড দিতেন, তাহলে সংবাদপত্রে ও শ্বেতাঙ্গ-সভায় তীব্র নিন্দাবাদের ঝড় উঠত।[৬]

এই প্রসঙ্গে বর্তমান পরিস্থিতিটা এখানেই বলে নেওয়া ভাল ৬০-৭০ বছর আগে যা হতো, এখনো তাই হয়। দক্ষিণ আফ্রিকায় ইতিমধ্যে আরো অনেক বিকট আইন জারী হয়েছে—তার মধ্যে একটা হল ১৯৪৯ সালের 'মিশ্র বিবাহ নিষেধ আইন'। এ আইনে দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গের সঙ্গে অ-শ্বেতাঙ্গের বিবাহ নিষেধ হয়েছে ; শুধু তাই নয়, দক্ষিণ আফ্রিকার কোন নাগরিক বা অধিবাসী বিদেশে গিয়ে এরকম মিশ্র বিবাহ করলে দক্ষিণ আফ্রিকায় সে বিবাহ অবৈধ বলে গণ্য হবে।[৭]

১৯৫০ সালে আরেক আইন পাস হয়েছে—১৯২৭ সালের 'ভ্রষ্টাচার-দমন' আইনের সংশোধন করে ঘোষণা করা হয়েছে, শ্বেতাঙ্গ ও অ-শ্বেতাঙ্গের যৌন মিলন (বিবাহ-বহির্ভূত স্বেচ্ছামিলন) গুরুতর

দণ্ডযোগ্য অপরাধ।[৮] এই আইনে ব্যবস্থা হয়েছে এরকম মিলন-অপরাধের দুইজন অপরাধীর বিচার হবে দুই পৃথক আদালতে। দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার এক মিশ্র দম্পতিকে এই আইনে গ্রেপ্তার করে আদালতে পাঠানো হল। শ্বেতাঙ্গ পুরুষটির যে আদালতে বিচার হল, সে আদালত তাকে নির্দোষ বলে খালাস দিল ; অর্থাৎ সাব্যস্ত হল যে মিলন ঘটেনি। আর, কালো মেয়েটির যে আদালতে বিচার হল, সে আদালত তাকে দোষী সাব্যস্ত করে কারাদণ্ড দিল।[৯]

প্যাট্রিক ডান্‌কান্ একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন। ৬৫ বৎসর বয়সের এক সহায়সম্বলহীন নিরাশ্রয় শ্বেতাঙ্গ বৃদ্ধ পথে পড়েছিল। প্রায় সমবয়সী এক কৃষ্ণকায় বৃদ্ধা তাকে ঘরে তুলে এনে আশ্রয় দিল। তারা স্বামী-স্ত্রীর মতো বাস করত, আনুষ্ঠানিক বিবাহ তো আইনে নিষিদ্ধ। তাদের গ্রেপ্তার করে দুইজনকেই তিনমাসের কারাদণ্ড দেওয়া হল ; পুনরায় এ অপরাধ করলে আরো কঠিন শাস্তি হবে।[১০]

এইসব উন্মাদ আইন ও বিকারগ্রস্ত শাসকসম্প্রদায়ের দেশে পুলিস ও গুপ্তচরের একটা বড় কর্ম হচ্ছে মানুষের শোবার ঘরে উঁকি দেওয়া, আর প্রলোভনের ফাঁদ পেতে অপরাধী ধরা। এটা বিস্ময়কর নয় যে ১৯৬৯ সালে এরকম অপরাধের জন্য যে ৫০০০ মামলা হয়েছিল তার প্রায় সবকটিতেই 'অপরাধী'-পুরুষটি শ্বেতাঙ্গ, মেয়েটি কালো বা মিশ্রবর্ণ। এটাও বিস্ময়কর নয় যে এরকম 'অপরাধ' জানাজানি হয়ে যাওয়ার পরে শ্বেতাঙ্গ পুরুষের আত্মহত্যার ঘটনা অনেক। এটাও বিস্ময়কর নয় যে দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ পুরুষদের মধ্যে মদ্যাসক্তি-রোগ ও আকস্মিক মৃত্যুর হার খুব বেশি। মৃত্যুর হার বেশি হওয়ার কারণ—(১) সন্ন্যাসরোগের (থ্রম্বসিস্) আধিক্য এবং (২) মোটরগাড়ি দুর্ঘটনার আধিক্য।[১১]

দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গসমাজ ভারসাম্যহীন বিচলিত-উত্তেজিত অপ্রকৃতিস্থ সমাজ। যে অল্প কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ নরনারী এই সমাজের

গণ্ডী কেটে বেরিয়ে এসে সর্বজাতিক ঐক্যের ও সাম্যের সংগ্রামে হাত মিলিয়েছেন, শ্বেতাঙ্গসম্প্রদায়ের কাছ থেকে ও শাসক সরকারের কাছ থেকে তাঁরা পেয়েছেন অপমান লাঞ্ছনা ও শাস্তি ; দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে তাঁদের অনেককে চলে যেতে হয়েছে বিদেশে আশ্রয়প্রার্থী হয়ে। কিন্তু তাঁরা বিশ্বমানবের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা অর্জন করেছেন।

॥ চার ॥

বোথা সরকার, ১৯১০—১৯

নবরচিত সংবিধান অনুসারে ১৯১০ সালে যখন "ইউনিয়ন অব্ সাউথ আফ্রিকা"-র পার্লামেণ্ট গঠিত হল তখন বোয়ার নেতারা তাঁদের বিভিন্ন রাজ্যের দলগুলোকে একত্র করে নতুন পার্টি গঠন করলেন—'সাউথ আফ্রিকান ন্যাশনাল পার্টি'। বৃটিশদের দলগুলিকে একত্র করে হল 'ইউনিয়নিস্ট পার্টি'। এ ছাড়া রইল 'লেবার পার্টি' এবং কয়েকজন নির্দল সদস্য। পার্লামেণ্টে এই দলগুলির সদস্যসংখ্যা হল : সাউথ আফ্রিকান ন্যাশনাল—৬৬, ইউনিয়নিস্ট—৩৯, লেবার—৪ ; নির্দল সদস্যের সংখ্যা—১২। জেনারেল বোথার প্রধানমন্ত্রিত্বে কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রিসভা গঠিত হল। অন্যান্য মন্ত্রিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—জেনারেল ইয়ান স্মাট্স্, জেনারেল জেমস হার্টৎসগ, এবং আব্রাহাম ফিশার।

'লেবার পার্টি' সম্বন্ধে একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন। বৃটেনের লেবার পার্টির কিছুটা প্রভাব এই পার্টির পিছনে ছিল। কিন্তু এ হল শ্বেতাঙ্গ লেবার পার্টি ; দক্ষিণ আফ্রিকার শ্রমিকদের বিপুল অধিকাংশ যে অ-শ্বেতাঙ্গরা, তাদের এই পার্টি থেকে শুধু যে বাদ দেওয়া হয়েছিল তাই নয়, সেই অধিকাংশের স্বার্থের বিরোধিতা করা এ পার্টির প্রধান কাজ হয়ে উঠেছিল।

ট্রান্সভালের খনিগুলোয় শ্রমিক-ঘাটতি পূরণ করার জন্য ১৯০৩-৪ সালে যখন চীন থেকে 'কুলী' আমদানী করার কথা হচ্ছিল, সেই সময়

শ্বেতাঙ্গ শ্রমিকদের মধ্যে আশঙ্কা হয় যে পালে পালে অ-শ্বেতাঙ্গ মজুর এসে শ্বেতাঙ্গ মজুরদের কোণঠাসা করে ফেলবে ; ক্রমে ক্রমে শ্বেতাঙ্গ মজুর বাদ দিয়ে সস্তা মজুরীর অ-শ্বেতাঙ্গ মজুর দিয়ে কাজ করানোর ঝোঁক মালিকদের পেয়ে বসবে, শ্বেতাঙ্গ মজুরকে হয় কম মজুরী নিতে রাজী হতে হবে, না হয় বেকার হতে হবে। এই আশঙ্কা একেবারে অমূলক ছিল না। মেহনৎ-বিক্রীর বাজারে শ্রমিকরা পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে ওঠে, এবং মালিকরা সেই প্রতিদ্বন্দ্বিতার সুযোগ নিয়ে মজুরী কমায়। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা শ্রমিকদের মধ্যে নানা রকম সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষেরও রূপ নেয়।

শ্বেতাঙ্গ শ্রমিকরা যখন চীনা কুলী আমদানীর বিরোধিতা করছিল, তখন কর্নেল ক্রেস্‌ওয়েল্‌ নামে এক খনি-ম্যানেজার তাদের মুখপাত্র হয়ে ওঠেন। শেষ পর্যন্ত শ্বেতাঙ্গ মালিকে-মজুরে চুক্তি হয় যে চীনা কুলী বা অন্য কোন অ-শ্বেতাঙ্গ শ্রমিকদের কোনরকম দক্ষ-শ্রমিকের কাজ দেওয়া চলবে না, এবং শ্বেতাঙ্গ শ্রমিকের সংখ্যা হ্রাস করা চলবে না। ট্রেড ইউনিয়নের ভাষায় এরকম চুক্তিকে বলে 'জব-প্রোটেকশন'। এক্ষেত্রে শ্বেতাঙ্গ শ্রমিকের স্বার্থ সংরক্ষণ হচ্ছিল অ-শ্বেতাঙ্গ শ্রমিকদের মেরে। দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ শ্রমিকদের অধিকাংশের ট্রেড-ইউনিয়ন-চেতনা আজও এই নিম্নস্তরেই রয়ে গেছে।

শ্বেতাঙ্গ শ্রমিকদের এই আন্দোলনের ভিত্তিতে ট্রান্সভালে ক্রেস্‌ওয়েলের নেতৃত্বে লেবার পার্টি গঠিত হয়। এর সঙ্গে অন্য রাজ্যগুলোর 'ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট লেবার পার্টি' প্রভৃতি দল একত্র করে সাউথ আফ্রিকান লেবার পার্টি গঠিত হয় ১৯০৯ সালে।

১৯১০ সালের বোথা-মন্ত্রিসভায় একজন উগ্র বোয়ার জাতীয়তাবাদী ছিলেন জেনারেল হার্টৎসগ। তাঁকে নিয়ে বোথা-মন্ত্রিসভার অসুবিধা হচ্ছিল, ১৯১২ সালের ডিসেম্বরে তাঁকে মন্ত্রিসভা থেকে বাদ দেওয়া হল। হার্টৎসগ তাঁর সমর্থকদের নিয়ে আলাদা পার্টি করলেন, তার নাম হল 'ন্যাশনাল পার্টি'।

১৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্ধ বাধল। ডি-ভেট, ডি-লা-রেই প্রভৃতি প্রাক্তন বোয়ার-জেনারেলরা জার্মানার সমর্থক ; বোথা-মন্ত্রিসভা বৃটিশ সরকারের সমর্থনে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দিলে এঁরা তার বিরোধিতা করেন। দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার জার্মান উপনিবেশ দখল করার জন্য বোথা-মন্ত্রিসভা সৈন্যবাহিনী পাঠানোর সিদ্ধান্ত করলে এঁদের বিরোধিতা বিদ্রোহ-অভ্যুত্থানের আকার ধারণ করে। সে বিদ্রোহ খুব সহজেই দমন করা হয়।

১৯১৫ সালের নির্বাচনে বোথা-স্মাট্‌সের সাউথ আফ্রিকান পার্টি অনেকগুলো আসন হারাল। বিভিন্ন দলের আসনসংখ্যা দাঁড়াল: সাউথ আফ্রিকান—৫৪, ইউনিয়নিস্ট—৪০, হার্টংসগের ন্যাশনাল পার্টি—২৭, লেবার—৩ ; এবং নির্দল—৬। বৃটিশ দল ইউনিয়নিস্ট পার্টি বোথা-স্মাট্‌সের মন্ত্রিসভাকে সমর্থন করছিল বলে বোথা-মন্ত্রিসভা টিকে রইল। ১৯১৯ সালে জেনারেল বোথার মৃত্যু হলে জেনারেল স্মাট্‌স্ প্রধানমন্ত্রী হলেন।

১৯২০ সালের মার্চ মাসের নির্বাচনে 'ন্যাশনাল পার্টি' বৃহত্তম পার্টি হয়ে উঠল। দলগুলির আসনসংখ্যা দাঁড়াল: ন্যাশনাল—৪৪, সাউথ আফ্রিকান—৪১, ইউনিয়নিস্ট—২৫, লেবার—২১, এবং নির্দল ৩। সাউথ আফ্রিকান পার্টি, ইউনিয়নিস্ট পার্টি এবং নির্দলরা মিলে এক কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা হল ৪ জন সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে। মন্ত্রিসভা গঠন করেই স্মাট্‌স্ সাউথ আফ্রিকান পার্টি ও ইউনিয়নিস্ট পার্টিকে ঐক্যবদ্ধ করে পরিবর্ধিত সাউথ আফ্রিকান পার্টি গঠন করে আবার নির্বাচন আহ্বান করলেন। ১৯২১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের নির্বাচনে সাউথ আফ্রিকান পার্টি ১৩৪টি আসনের মধ্যে ৭৮টি আসনে জয়ী হয়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করল ; 'ন্যাশনাল'রা ৪৫টি আসনে জয়ী হয়েছিল বটে, কিন্তু 'লেবার' ২১ থেকে ১০ হয়ে গেল। ইংরেজীভাষী শ্রমিকরা এই নির্বাচনে 'লেবার' ছেড়ে স্মাট্‌সের পার্টিকেই ভোট দিয়েছিল,—বোয়ার-আধিপত্য ঠেকাবার জন্য।

॥ পাঁচ ॥

শ্বেতাঙ্গ খনি-শ্রমিক ধর্মঘট, ১৯২২

লেবার পার্টির পরাজয়ে খনিমালিকদের প্রতিষ্ঠান 'চেম্বার অব্ মাইন্‌স্' খুব উৎফুল্ল হয়েছিল। চেম্বার অব্ মাইন্‌স্ প্রধানতঃ বৃটিশ মূলধনের সংগঠন; পুরনো ইউনিয়নিস্ট পার্টি এবং স্মাট্‌সের নতুন সাউথ আফ্রিকান পার্টির প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিল এরা। ১৯২১ সালের নির্বাচনের পর সুযোগ বুঝে এরা শ্বেতাঙ্গ শ্রমিকদের মজুরী কমানো শুরু করল। মজুরীখাতে খরচা কমানোর মতলবেই 'চেম্বার অব্ মাইন্‌স্' আরেকটি সিদ্ধান্ত ঘোষণা করল—আগের চেয়ে বেশি সংখ্যায় কালো শ্রমিক নিয়োগ করা হবে এবং যেসব কাজ এতদিন শাদা মজুরের জন্য বাঁধা ছিল সেসব কাজেরও কিছু কিছু কালো মজুর দিয়ে করানো হবে। শ্বেতাঙ্গ শ্রমিকদের মজুরীরক্ষা ও চাকুরীরক্ষার তাগিদের সঙ্গে বর্ণবৈষম্য ও বর্ণবিদ্বেষ মিশে এক জটিল আলোড়ন সৃষ্টি হল। ১৯২২ সালের ১০ই জানুয়ারী ২০ হাজার শ্বেতাঙ্গ খনি-শ্রমিক ধর্মঘট শুরু করল। সাধ্যসাধনা, শাসানি-ধমকানি, ধরপাকড়, মারপিট করে ধর্মঘট ভাঙতে না পেরে স্মাট্‌স্-সরকার সৈন্যবাহিনী নামালো। ধর্মঘট ততক্ষণে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আকার নিয়েছে, জোহানেসবার্গ শহর ধর্মঘটীদের দখলে। সংঘর্ষের ফলে ২০০ জনেরও বেশি শ্বেতাঙ্গ নিহত হয়, তার মধ্যে ৭৮ জন ধর্মঘটী শ্রমিক। কৃষ্ণকায় শ্রমিকদের ওপর শ্বেতাঙ্গ ধর্মঘটী শ্রমিকদের ও গুণ্ডাদের আক্রমণের অনেক ঘটনা ঘটে,—৩১ জন কৃষ্ণকায় মানুষ নিহত হয়, আহতের সংখ্যা ৬৭ জন।

১৪ই মার্চ তারিখে ধর্মঘটীদের সদরদপ্তরে গোলাগুলি চালিয়ে সৈন্যবাহিনী দিয়ে বাড়িটা দখল করা হল, ধর্মঘটীদের লাল নিশান নামিয়ে দেওয়া হল—শ্রমিকদের প্রতিরোধও শেষ হল। ৪,৭৫৮ জন গ্রেপ্তার হয়েছিল, ৯৫৩ জনকে আদালতে সোপর্দ করা হয়; ৪৬ জনের বিরুদ্ধে নরহত্যার অভিযোগ ছিল, তাদের মধ্যে ১৮ জনের প্রাণদণ্ডের

হুকুম হয় ; শেষপর্যন্ত চারজনকে ফাঁসী দেওয়া হয়, বাকীদের প্রাণদণ্ড মকুব করা হয়।

১৯১৭ সালের রুশবিপ্লবের কিছু প্রভাব ইতিমধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ শ্রমিকদের মধ্যে পৌঁছেছিল। ১৯২১ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়েছিল। ১৯২২ সালের ধর্মঘটে এঁদের প্রভাব ছিল খুবই সামান্য। এরিক ওয়াকার এঁদের 'তৃতীয় আন্তর্জাতিকের সঙ্গে যুক্ত কমিউনিস্টদের ক্ষুদ্র গ্রুপ' বলে উল্লেখ করেছেন। ওয়াকার-এর বিবরণে দেখা যায় এঁরা শ্বেতাঙ্গ শ্রমিকদের সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতার পুরো সমর্থক ছিলেন, এবং "শ্বেত দক্ষিণ আফ্রিকার জন্য দুনিয়ার শ্রমিক এক হও" বলে জিগির তুলেছিলেন। মেরী বেনসন অন্য কথা লিখেছেন: এঁরা নাকি কালো শ্রমিকদের পক্ষেও কথা বলেছিলেন, কিন্তু সংখ্যাল্পতার জন্য অল্পেই কোণঠাসা হয়ে যান ; ফৌজের সঙ্গে সংঘর্ষের সময় এঁদের দুইজন কর্মী নিহত হন।[১২] অ্যালেক্স হেপ্‌ল্ লিখেছেন, কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরা কেউ কেউ ধর্মঘটে জড়িত ছিলেন বটে, কিন্তু ধর্মঘট-পরিচালনায় তাঁদের প্রভাব ছিল বললে ভুল হবে ; শ্রমিকদের মধ্যে অনেকে মহাযুদ্ধের সামরিক অভিজ্ঞতা নিয়ে এসেছিল, এবং জঙ্গী-ধরনের বিদ্রোহের মেজাজ শ্রমিকদের মধ্যে ছিল ; তারা আবার বর্ণ বৈষম্যের প্রবল সমর্থকও ছিল ; এই পটভূমিতেই ধর্মঘটীদের নিশানে ওই কথাগুলো দেখা গিয়েছিল—"দুনিয়ার শ্রমিক এক হও, এবং শ্বেত দক্ষিণ আফ্রিকার জন্য সংগ্রাম কর।"[১৩]

সম্প্রতি দক্ষিণ আফ্রিকার সম্বন্ধে একটি গ্রন্থের পরিচিতি-সমালোচনা প্রসঙ্গে 'সেশাবা' পত্রিকায় এই বিষয়ে যা লেখা হয়েছে, বর্তমানকালের আফ্রিকান সংগ্রামীদের অভিমতের প্রতিফলন হিসেবে তার একটু অংশ উল্লেখযোগ্য :—

> এত নাটকীয়তা ও রক্তক্ষয় সত্ত্বেও এ ধর্মঘট ছিল একটা প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মঘট—বর্ণ বৈষম্য রক্ষা করার জন্য ধর্মঘট। ..

> এ ধর্মঘটের ফলাফল কি হবে সবটা আগে থেকে জানা সম্ভব ছিল না। কিন্তু যা ঘটল তার ভিত্তিতে এই প্রশ্ন জাগে—এই ধর্মঘট সমর্থন করে কমিউনিস্ট পার্টি কাণ্ডটা কি করছিল? বান্টিং (সিড্‌নী বান্টিং, কমিউনিস্ট পার্টির নেতা) বর্ণ বৈষম্য-মূলক রেগুলেশন সমর্থন করেছিলেন কেন, এবং অধুনা-কুখ্যাত সেই শ্লোগানটিকে—'শ্বেত দক্ষিণ আফ্রিকার জন্য দুনিয়ার শ্রমিক এক হয়ে সংগ্রাম কর' শ্লোগানটিকে—ব্যাখ্যা করে নির্দোষ প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেছিলেন কেন?
>
> অবশ্য ঝট্ করে একটা রায় দিয়ে ফেলা সুবিবেচনার কাজ হবে না—কারণ, এই এস্ পি বান্টিং-ই আবার সরকারী শাসন অমান্য করে এবং শ্বেতাঙ্গ সমাজের প্রতিষ্ঠিত প্রথা অগ্রাহ্য করে বিপুল স্বার্থত্যাগ করে কমিউনিস্ট পার্টির মাধ্যমে আফ্রিকানদের সংগঠন নির্মাণ ও রাজনৈতিক শিক্ষার পথ তৈরী করার জন্য নিজের জীবনের অর্ধেকটা ঢেলে দিয়েছিলেন।[১৪]

সেশাবা পত্রিকার গ্রন্থ-সমালোচক আরো উল্লেখ করেছেন যে ফাঁসীর দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত শ্বেতাঙ্গ শ্রমিকরা ফাঁসীর মঞ্চে উঠেছিল 'লাল নিশান' গান গাইতে গাইতে। আর, শ্বেতাঙ্গ শ্রমিকরা যখন তাদের শহীদদের জন্য শোকপালন করছে, সেই সময়ে আফ্রিকান শ্রমিক নেতা ক্লিমেন্স কাডালি 'আফ্রিকান শ্রমিকদের হত্যাকারী এই মানুষদের ফাঁসী দেওয়ার জন্য' স্মাট্স্-সরকারের প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করে বার্তা পাঠান। দুই তরফেই গোটা ব্যাপারটা মর্মন্তুদ এবং বিকট, এক উন্মাদ সমাজব্যবস্থা কাউকে সুস্থবুদ্ধিতে থাকতে দেয়নি।

॥ ছয় ॥

নির্বাচন, ১৯২৪

১৯২২ সালের ওই ধর্মঘট ওরকমভাবে ভাঙার ফলে শ্বেতাঙ্গ শ্রমিকরা প্রবল স্মাট্স্‌বিরোধী হয়ে উঠল। স্মাট্স্ ইতিপূর্বেও ১৯১৪ সালে একবার শ্বেতাঙ্গ শ্রমিকদের ধর্মঘট ভেঙে এবং ধর্মঘটী নেতাদের দেশান্তরে নির্বাসন দিয়ে শ্রমিকমহলে কুখ্যাতি অর্জন

করেছিলেন। এবার শ্বেতাঙ্গ শ্রমিকদের ক্রোধ ও ঘৃণার পাত্র ভরে গেল।

হার্টংসগের 'ন্যাশনাল পার্টি' সুযোগ বুঝে শ্বেতাঙ্গ শ্রমিকদের পক্ষে কথা বলতে লাগল। এ পার্টির সমর্থক-পৃষ্ঠপোষকরা বেশির ভাগ ছিল বোয়ার জমিদার, তখনো খনি-মালিক ও কারখানা-মালিকদের সঙ্গে তারা একীভূত হয়ে যায়নি; মালিকদের বিরুদ্ধে ও স্মাট্‌স্-সরকারের বিরুদ্ধে শ্বেতাঙ্গ শ্রমিকদের পক্ষে দুটো সমর্থনসূচক কথা বলতে তাদের আপত্তি ছিল না। বিশেষতঃ সেই শ্বেতাঙ্গ শ্রমিকরা যখন খনি-কারখানায় কালো মজুর বেশি ঢোকানোর বিরোধিতা ক'রে প্রকারান্তরে জমিদারদের খামারে সস্তা ক্ষেতমজুর সরবরাহের ব্যবস্থাকে পাকাপোক্ত করতে চাইছে, তখন তাদের স্বার্থের সঙ্গে জমিদারদের স্বার্থের মিলনও ঘটেছিল।

'আফ্রিকানের' বা বোয়ার জাতীয়তাবাদও এ সময়ে তেজী হয়ে উঠেছিল। যুদ্ধোত্তর মন্দা এসেছিল, অনেক শ্বেতাঙ্গ বেকার হয়েছিল, জিনিসপত্রের দামও চড়েছিল।

এই পরিস্থিতির মধ্যে ১৯২১ সালের লোকগণনার হিসেব সম্বন্ধে প্রচুর গুজব রটেছিল। শ্বেতাঙ্গ-মহলে এই ধারণা খুব ছড়ানো হয়েছিল যে কালো আফ্রিকানরা অস্বাভাবিক দ্রুত হারে সংখ্যায় বাড়ছে, এবং এখনই সতর্ক না হলে 'কালো কাফিরের সমুদ্র' শ্বেতাঙ্গদের গ্রাস করে ফেলবে। লোকগণনার হিসেব ছিল এইরকম :—

লোকগণনার হিসেব[১৫]

সাল	ইউরোপীয়	মিশ্রবর্ণ	এশিয়াটিক	আফ্রিকান
১৯১১	১২,৭৬,০০০	৪,২৮,০০০	১,৫০,০০০	৪০,১৯,০০০
১৯২১	১৫,১৯,০০০	৫,৪৫,০০০	১,৬৬,০০০	৪৬,৯৮,০০০

এই হিসেব থেকে সহজ অঙ্কে পাওয়া যায়—দশ বছরে

ইউরোপীয়দের সংখ্যাবৃদ্ধির হার ১৯%, আফ্রিকানদের ১৬'৮%। অথচ আফ্রিকানদের 'অস্বাভাবিক প্রজননক্ষমতা ও সংখ্যাবৃদ্ধি' নিয়ে গুজব শ্বেতাঙ্গদের আতঙ্ক সৃষ্টি করছিল। আফ্রিকানরা পালে পালে মরছিল ; অনাহার, অর্ধাহার, টাইফয়েড, নিউমোনিয়া, যক্ষ্মা, এবং শহরাঞ্চলের বস্তিগুলোয় সিফিলিস, তাদের মারছিল ; আফ্রিকানদের মধ্যে শিশু-মৃত্যুর হার ভয়াবহ। তথাপি তারা বাড়ছে—এটাই বোধ হয় বিস্ময় ও চমক সৃষ্টি করেছিল।[১৬]

এই গুজব ও আতঙ্কের সঙ্গে মিশেছিল আফ্রিকানদের মধ্যে জাগরণের লক্ষণ, নাটালবাসী ভারতীয়দের আন্দোলনের জের, এবং ভারতবর্ষে বৃটিশরাজের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলনের খবর। 'কাফির' ও 'কুলী'র বিরুদ্ধে বর্ণবিদ্বেষী শ্বেতাঙ্গদের একজোট হওয়ার মতো আবহাওয়া তৈরী হয়েছিল।

এই পটভূমিতে ১৯২৪ সালের জুন মাসে নির্বাচন এল। হার্টৎসগের 'ন্যাশনাল পার্টি' এবং ক্রেস্ওয়েল্-এর 'লেবার পার্টি' নির্বাচনী জোট বাঁধল। ইতিহাসের অনেক নির্মম বিদ্রূপের মধ্যে একটা দেখা গেল—দক্ষিণ আফ্রিকার কমিউনিস্ট পার্টি এই নির্বাচনে 'ন্যাশনাল-লেবার' জোটকে সমর্থন করল—এটা 'ধনতন্ত্র বিরোধী জোট' অনুমান ক'রে। নির্বাচনী রাজনীতির সুবিধাবাদ কতদূর যেতে পারে, এটা তার একটা নমুনা বলে মেরী বেনসন উল্লেখ করেছেন।[১৭]

এ নির্বাচনের ছয় মাস আগে ১৯২৪ সালের ২১শে জানুয়ারী সন্ধ্যার অন্ধকারে মৃত্যু এসে লেনিনের পীড়িত দৃষ্টি আবৃত করে দিয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদ, ধনতন্ত্র, জাতিবৈষম্য, আধিপত্যকামী উগ্র জাতীয়তাবাদ ও সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে বিশ্বের মহত্তম সংগ্রামীর কণ্ঠ ও লেখনী থেমে গিয়েছিল।

॥ সাত ॥

হার্টৎসগ-সরকার

১৯২৪-এর নির্বাচনে স্মাট্‌সের দল গদীচ্যুত হল। বিভিন্ন দলের সদস্যসংখ্যা হল: ন্যাশনাল—৬৩, লেবার—১৮, সাউথ আফ্রিকান—৫৩, নির্দল—১। ন্যাশনাল-লেবার যুক্ত মন্ত্রিসভা হল, প্রধানমন্ত্রী হলেন হার্টৎসগ। লেবার পার্টির নেতা ক্রেস্‌ওয়েল্ দেশরক্ষা-মন্ত্রী হলেন। ১৯২৫ সালে 'শ্রমদপ্তর' নামে নতুন দপ্তর সৃষ্টি করে লেবার পার্টির ওআলটার ম্যাডেলি'কে শ্রমমন্ত্রী করা হল। এ মন্ত্রিসভার আরেকটি উল্লেখযোগ্য নাম স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ড্যানিয়েল ফ্ঁাসোয়া মালান। ওলন্দাজ গীর্জার যাজক, কুসংস্কারাচ্ছন্ন বর্ণ বৈষম্যের ধর্মধ্বজী প্রচারক, ডক্টর মালান পরে ১৯৪৮ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন।

হার্টৎসগ-সরকার শ্বেতাঙ্গ শ্রমিকদের কিছু কিছু সুবিধা করে দিয়েছিল। ন্যাশনাল পার্টির আসল লক্ষ্য ছিল আফ্রিকানদের ও ভারতীয়দের ওপর অত্যাচার বাড়ানো। ১৯২৬ সালে হার্টৎসগ এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য চারটি আইনের খসড়া হাজির করেন। লেবার পার্টির সদস্যদের মধ্যে কারু কারু এবার বিবেক-দংশন শুরু হয়।

১৯২৮ সালে শ্রমমন্ত্রী ম্যাডেলি আফ্রিকান শ্রমিকদের এক প্রতিনিধিদলকে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের অনুমতি দিলে হার্টৎসগ আপত্তি করেন। ম্যাডেলি এই আপত্তি না শোনায় এবং পদত্যাগ করতে রাজী না হওয়ায় হার্টৎসগ মন্ত্রিসভা ভেঙে দিয়ে নতুন মন্ত্রিসভা করেন। তাতে ম্যাডেলি বাদ গেলেন, ক্রেস্‌ওয়েল্-পন্থী আরেকজন শ্রমমন্ত্রী হলেন। লেবার পার্টি দুইভাগে বিভক্ত হয়ে গেল।

১৯২৯ সালের নির্বাচনে লেবার পার্টি অনেকগুলো আসন হারালেও স্মাট্‌সের দল যথাপূর্ব অবস্থায় রইল, হার্টৎসগের দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে মন্ত্রিসভা গঠন করল। এবার মন্ত্রিসভায় ড্যানিয়েল মালান ছাড়াও আরেকটি উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি এলেন—

বিচারমন্ত্রী অস্‌ওয়াল্ড পিরো। ইনি পরে হিটলারের পরমভক্ত হয়ে নাম কিনেছিলেন।

হার্টৎসগ-সরকার কিন্তু শীঘ্রই সঙ্কটে পড়ল। ১৯২৯ সালের অক্টোবর মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অর্থনৈতিক সঙ্কট চূড়ান্ত আকার ধারণ করার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ব-ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অচল অবস্থা প্রকট হয়ে পড়েছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার স্বর্ণশিল্প ও গোটা অর্থনীতি এই ধাক্কায় ভেঙে পড়ার মতো হয়েছিল। শ্বেতাঙ্গ-রাজনীতিতে আবার বৃটিশ-বোয়ার নির্বিশেষে শ্বেতাঙ্গদের 'জাতীয় ঐক্য' জরুরী আওয়াজ হয়ে উঠল, বৃটেন থেকে মূলধন আমদানী ও বাণিজ্যবৃদ্ধির প্রয়োজন অন্য সব প্রয়োজনকে ছাপিয়ে উঠল। মালানের তাড়নায় কেন্দ্রীয় সরকার যেভাবে প্রাদেশিক সরকারগুলোর সর্বব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছিল, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক-নিয়োগ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করছিল, তাতে অসন্তোষ আর চাপা ছিল না। সরকারী চাকরী বণ্টন ও অন্যান্য রাজপ্রসাদ-বণ্টনেও পক্ষপাতিত্ব এবং দুর্নীতির অভিযোগ উঠছিল।[১৮]

১৯৩১ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা 'বৃটিশ ডমিনিয়ন'-এর মর্যাদা লাভ করেছিল। ওই বৎসরেই শ্বেতাঙ্গদের সার্বজনীন ভোটাধিকার প্রবর্তিত হল, উপার্জনগত বা শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রশ্ন বাদ গেল ; শ্বেতাঙ্গ মেয়েদেরও ভোটাধিকার হল। অপরদিকে অ-শ্বেতাঙ্গদের ভোট আরো কমানো হল।

১৯৩৩ সালের ৩১শে মার্চ অকস্মাৎ সকলের বিস্ময় উৎপাদন করে স্মাট্‌সের সঙ্গে হার্টৎসগের চুক্তি হল,—'ন্যাশনাল পার্টি' ও 'সাউথ আফ্রিকান' পার্টির যৌথ মন্ত্রিসভা গঠিত হল। হার্টৎসগ প্রধানমন্ত্রী, স্মাট্‌স্ বিচারমন্ত্রী ; স্বরাষ্ট্র ও শিক্ষা দপ্তর নিলেন ইয়ান হফ্‌মেয়ার (ছোট) ; দেশরক্ষা ও রেল দপ্তর নিলেন অস্‌ওয়াল্ড পিরো।

ড্যানিয়েল মালান এই ঐক্যের বিরোধী। তিনি মন্ত্রিসভায় রইলেন না। ওদিকে ১৯৩৩ সালের ১লা জানুয়ারী জার্মানীতে

হিটলার সর্বেসর্বা হয়েছেন। জাপান ১৯৩১ সালে চীনের ওপর হামলা শুরু করেছিল, সেই হামলা চলছে, এবং ১৯৩৩ সালের মার্চ মাসে জাপান 'লীগ অব্ নেশন্স্' ত্যাগ করে বেরিয়ে গেছে। বিশ্বযুদ্ধের ঘনঘটা দেখা দিয়েছে।

১৯৩৩ সালের মে মাসে দক্ষিণ আফ্রিকায় আবার নির্বাচন হল। হার্টৎসগ-স্মাট্স্ জোট ১৪৪টি আসন লাভ করল। বিরোধীরা মাত্র ৬টি আসন পেয়েছিল। ১৯৩৪ সালের ডিসেম্বর মাসে হার্টৎসগের ন্যাশনাল পার্টি এবং স্মাট্সের সাউথ আফ্রিকান পার্টি সংযুক্ত করে নতুন নাম হল 'ইউনাইটেড পার্টি'। উগ্র 'আফ্রিকানের' মালান আলাদা পার্টি করলেন—'বিশুদ্ধীকৃত ন্যাশনাল পার্টি'; পার্লামেণ্টে এই পার্টির সদস্যসংখ্যা হল ১৯, এরাই 'বিরোধী দল' বলে স্বীকৃতি পেল।

॥ আট ॥

'ব্রোয়েডেরবণ্ড', হিটলার, বিশ্বযুদ্ধ

প্রথম মহাযুদ্ধের শেষে ১৯১৮ সালে বোয়ারদের মধ্যে সবচেয়ে উগ্র ও সঙ্কীর্ণ মনোভাবাপন্ন কিছু লোক 'ব্রোয়েডেরবণ্ড' নামে এক সংগঠন স্থাপন করেছিল। এই সংগঠনের প্রকাশ্য কাজকর্মে 'আফ্রিকানের ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি' ইত্যাদি বিষয়ে চর্চা আলোচনা ও প্রচার করা হত। কিন্তু তাছাড়া কিছু নিভৃত কাজকর্ম ছিল, সাম্প্রদায়িক গোপন চক্র সৃষ্টি ও সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ বিস্তারই সেগুলোর উদ্দেশ্য। জার্মানীতে হিটলারের নাৎসী (ন্যাশনাল সোসালিস্ট) পার্টির প্রভাব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই সংগঠনেরও চালচলন বদলাতে থাকে; এরা নিজেরা যেসব মত পোষণ করত, হিটলারের মতবাদের সঙ্গে সেগুলোর খুব সাদৃশ্য ছিল। এরা হিটলারভক্ত হয়ে ওঠে।

১৯৩৪ সাল নাগাদ এই সংগঠন বোয়ারদের মধ্যে যথেষ্ট বিস্তৃত হয়েছিল। মালান যখন 'বিশুদ্ধীকৃত ন্যাশনাল পার্টি' গঠন করলেন,

তখন ব্রোয়েডেরবণ্ড তাঁর সমর্থনে সক্রিয় হয়ে উঠল। মালানকে গুপ্তচক্রে দীক্ষা দিয়ে শপথ গ্রহণ করিয়ে সংগঠনের সদস্য করে নওয়া হয়।

১৯৩৫ সালের নভেম্বর মাসে প্রধানমন্ত্রী হার্টৎসগ মালানের পার্টির সঙ্গে ব্রোয়েডেরবণ্ডের যোগাযোগ এবং তাদের গুপ্ত-সংগঠনের পদ্ধতি ও কার্যকলাপ বর্ণনা করে পার্লামেণ্টে এক ভাষণে এদের কঠোর নিন্দা করেন। সরকারী স্কুলগুলোয় ব্রোয়েডেরবণ্ড-সদস্য শিক্ষকরা আফ্রিকানের-ভাষী ছাত্রছাত্রীদের ইংরেজীভাষী ছাত্র-ছাত্রীদের বিরুদ্ধে চালিত করছে, সাম্প্রদায়িকতা শেখাচ্ছে; প্রশাসন, পুলিস, শিক্ষাব্যবস্থা সর্বত্র এরা গোপন সংগঠনের জাল বিস্তার করছে ;—হার্টৎসগ এসব অভিযোগ করেন। তিনি শাসানি দেন যে এরপর এই বণ্ডের কোন সদস্যকে সরকারী চাকরী দেওয়া হবে না। মালানকে বণ্ডের সদস্য বলে বর্ণনা করলে মালান সদর্পে সেকথা স্বীকার করেন এবং পাল্টা অভিযোগ করেন যে হার্টৎসগ ও স্মাট্স্ উভয়েই 'আফ্রিকানের'-জাতির শত্রু।[১৯]

হার্টৎসগ ব্রোয়েডেরবণ্ডকে দমাতে পারেননি। তাঁর নিজের দলের মধ্যেই 'আফ্রিকানের' সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদীরা মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিল। হার্টৎসগের নিজের পুত্র আলবার্টস হার্টৎসগ মালানের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন এবং ব্রোয়েডেরবণ্ডের একজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি হয়ে উঠেছিলেন। বৃটিশ-আফ্রিকানের ঐক্যের মুখপাত্র স্মাট্সের সঙ্গে হার্টৎসগের একত্র চলা শক্ত হয়ে উঠছিল।

দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকায় জার্মান বাসিন্দাদের মধ্যে হিটলারের 'ব্রাউনশার্ট' যুবসংগঠন ১৯৩২-৩৩ সালেই দেখা দিয়েছিল। ১৯৩৪-৩৬ সালে খাস দক্ষিণ আফ্রিকার বিভিন্ন শহরে নাৎসীবাদী 'গ্রে-শার্ট' 'ব্ল্যাক-শার্ট' প্রভৃতি সংগঠন দেখা যাচ্ছিল। এগুলো হিটলারের পররাষ্ট্রদপ্তরের অর্থসাহায্য পেত।[২০]

১৯৩৫ সালের অক্টোবরে মুসোলিনী-চালিত ফাসিস্ট ইটালী

আফ্রিকার উত্তরপূর্বে ইথিওপিয়া আক্রমণ করল। 'লীগ অব্ নেশন্স্', এবং বৃটেন, ফ্রান্স, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মুখে ইটালীর সমালোচনা করল, কিন্তু কাজে কোন বাধা দিল না। ১৯৩৬ সালের জুলাই মাসে স্পেনে হিটলার-মুসোলিনীর সহযোগী জেনারেল ফ্রাঙ্কো ক্ষমতা দখলের জন্য গৃহযুদ্ধ শুরু করলেন ; অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে তাঁকে সাহায্য করা ছাড়াও তাঁর সাহায্যার্থে জার্মান বিমানবহর স্পেনে গিয়ে গের্নিকা শহরের ওপর বোমাবর্ষণ করে নারীশিশুনির্বিশেষে হত্যা ও ধ্বংস-কাণ্ডের আধুনিক নজীর স্থাপন করে এল ; বৃহৎ রাষ্ট্রশক্তিগুলো চুপ করে দেখল। লীগ অব্ নেশন্সের দরবারে সোভিয়েট প্রতিনিধি লিটভিনফ্ আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে যৌথ নিরাপত্তা চুক্তির প্রস্তাব বারবার তুললেন, বারবার প্রত্যাখ্যাত হলেন। জাপান ইতিমধ্যে চীনের মাঞ্চুরিয়া দখল করে নিয়েছিল ; ১৯৩৫ সালে যখন জাপান চীনের অন্তঃ-মঙ্গোলিয়া প্রদেশ দখল করতে এগোল, তখনো বৃহৎ রাষ্ট্রশক্তিগুলি বাধা দিল না। ১৯৩৬ সালের নভেম্বর মাসে জার্মানা-ইটালী-জাপান 'কমিউনিস্ট-আন্তর্জাতিক বিরোধী চুক্তি' ('অ্যান্টি-কমিণ্টার্ণ প্যাক্ট') স্বাক্ষর করল।

১৯৩৭ সালে জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে চীনে কমিউনিস্ট পার্টি চিয়াংকাই শেক'এর কুওমিনটাঙ দলের সঙ্গে জাপান-বিরোধী যুক্তফ্রন্ট গঠন করল, চীনে প্রতিরোধ-সংগ্রাম নতুন জাতীয় রূপ পরিগ্রহ করল। ১৯৩৭ সালেই বৃটিশ সরকারের হিটলার-মুসোলিনী-তোষণ-প্রচেষ্টা নিয়ে বৃটিশ মন্ত্রিসভায় মতভেদ প্রকাশ্য আকার ধারণ করল—বৈদেশিক দপ্তরের মন্ত্রী অ্যাণ্টনি ইডেন পদত্যাগ করলেন, প্রধানমন্ত্রী নেভিল চেম্বারলেনের তোষণ-নীতি বহাল রইল।

১৯৩৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে হিটলার অস্ট্রিয়ার ওপর হামলা শুরু করলেন, ১১ই মার্চ অস্ট্রিয়া জার্মানীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। মার্চ মাসেই শুরু হল চেকোশ্লোভাকিয়ার ওপর চাপ। সেপ্টেম্বর মাসে জার্মানীর মিউনিখ শহরে বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চেম্বারলেন ও ফরাসী

প্রধানমন্ত্রী দালাদিয়ের হিটলারের হাতে চেকোশ্লোভাকিয়াকে সমর্পণ করে দিয়ে চুক্তি সম্পন্ন করে দেশে ফিরলেন।

হিটলারের এই অবাধ অগ্রগতি এবং শক্তিমত্তা ও দুঃসাহসের এই দৃপ্ত প্রদর্শনী দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ হিটলার-ভক্তদের খুব উৎসাহ জোগাচ্ছিল। ব্রোয়েডেরবণ্ড ক্রমেই উগ্র হয়ে উঠছিল। ১৯৩৬ সালে 'সংস্কার সাধন সংগঠন' নাম দিয়ে একটি বিশেষ সংগঠন করা হল শ্বেতাঙ্গ শ্রমিকদের ট্রেড-ইউনিয়নগুলোকে 'বৈদেশিক প্রভাব', 'কমিউনিস্ট প্রভাব', 'উদারনীতিক প্রভাব' ইত্যাদি সব প্রভাব থেকে উদ্ধার করে 'আফ্রিকানের' জাতীয়তাবাদীদের দখলে আনার জন্য। প্রধানমন্ত্রী হার্টৎসগের পুত্র আলবার্ট্স এই সংগঠনের প্রধান পরিচালক হয়েছিলেন।

১৯৩৮ সালের মে মাসে নির্বাচন হল। মালানের ন্যাশনাল পার্টি বৃটিশ সাম্রাজ্যের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করে দক্ষিণ আফ্রিকায় 'স্বাধীন শ্বেত সাধারণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠার কথা বলত। তার পাল্টা দাঁড়িয়েছিল বৃটিশরাজভক্ত 'ডমিনিয়ন পার্টি'। ভোটের পর বিভিন্ন দলের আসন-সংখ্যা হলঃ ইউনাইটেড—১১১, ন্যাশনাল—২৭, ডমিনিয়ন—৮, লেবার—৩, এবং ১ জন নির্দলীয়। ইউনাইটেড পার্টির পক্ষে মোট ভোট ৪,৪৫,৭৮১; ন্যাশনাল পার্টির পক্ষে মোট ভোট ২,৫৯,৪৫০। ভোটের তুলনায় অনেক কম আসন পেয়ে ন্যাশনালরা খানিকটা হতাশ হয়েছিল। কিন্তু 'আফ্রিকানের' ভোট যে মালানের দিকে ঝুঁকছে তা বেশ স্পষ্ট দেখা গেল।

১৯৩৮ সালের মাঝামাঝি শুরু হল বোয়ারদের 'গ্রেট ট্রেক' বা মহা-অভিযানের শতবার্ষিকী পালন উৎসব। ১৮৩৮ সালের অভিযানের কথা-কাহিনী ফলাও করে প্রচার হতে থাকল, ১৮৩৮ সালের ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে রক্তনদীর যুদ্ধের কথা গর্বভরে স্মরণ করা হল। প্রিটোরিয়া শহরে মনুমেণ্ট, অন্যান্য শহরে মিউজিয়াম, প্রদর্শনী ইত্যাদি স্থাপিত হল। ১৮৩৮ সালে বোয়াররা যেরকম বলদের গাড়ি চালিয়ে

উত্তরদিকে এসেছিল, সেইরকম বলদের গাড়ি চালিয়ে দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে বোয়াররা প্রিটোরিয়ায় এল। এই থেকে প্রায় এক বলদ-গাড়ি ব্রতই সৃষ্টি হল। 'আফ্রিকানের' জাতীয়তাবাদের প্রবল আবেগের তরঙ্গের মধ্যে তৈরী হল আরেকটি অর্ধগোপন পাক্কা নাৎসী সংগঠন—Ossewabrandwag, (ইংরেজীতে Ox-wagon Sentinel), 'বলদ-গাড়ি প্রহরী', সংক্ষেপে 'ও-বি'।

১৯৩৮ সালের সেপ্টেম্বরে ইউরোপে মিউনিখ-চুক্তির পর দক্ষিণ আফ্রিকায় জোহানেসবার্গ শহরে নাৎসী-সমর্থক ও নাৎসীবিরোধীদের মধ্যে এক সংঘর্ষে ৫০ জন আহত হল।[২১] মারামারি আরো হচ্ছিল —ব্রোয়েডেরবণ্ড ট্রেড-ইউনিয়ন দখল করতে গিয়ে মারামারি বাধাচ্ছিল। এ সময়ে শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে ফাসিস্টবিরোধী ও কমিউনিস্টদের সংখ্যা কিছু বেড়েছিল, কিছু সাহসী মানুষ এগিয়ে এসেছিলেন।

হার্টৎসগের মন্ত্রিসভার প্রতিরক্ষা-বাণিজ্য ও শিল্পদপ্তরের মন্ত্রী অস্‌ওয়াল্ড পিরো এসময়ে হিটলারভক্ত হয়ে উঠেছিলেন। ১৯৩৮ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে পিরো বাণিজ্যবিষয়ে আলাপ-আলোচনার জন্য ইউরোপের বিভিন্ন রাজধানীতে সফরে গেলেন। তিনি গেলেন পর্তুগালের রাজধানী লিসবনে ; স্পেনে গিয়ে ফ্রাঙ্কোর সঙ্গে আলাপ করলেন ; রোমে মুসোলিনীর সঙ্গে কথা বললেন ; বার্লিনে গিয়ে হিটলার দর্শন করে অভিভূত হয়ে এলেন ; লণ্ডনেও গেলেন। এইসব সাক্ষাৎকারের পর আত্মগর্বে স্ফীত হয়ে পিরো দেশে ফিরে নাৎসীবাদের প্রচারক হয়ে উঠলেন।

হিটলারের সীমাহীন দম্ভ, আর বৃটেনে-ফ্রান্সে ও বিশ্বের সর্বত্র হিটলার-বিরোধী জনমতের ক্রমবর্ধমান চাপ শেষ পর্যন্ত বৃটিশ ও ফরাসী সরকারকে রুখে দাঁড়াতে বাধ্য করল। হিটলার পোল্যাণ্ড আক্রমণ করলে বৃটেন ও ফ্রান্স জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল ১৯৩৯ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হল।

এই যুদ্ধে বৃটিশপক্ষে যোগ দেওয়া সম্বন্ধে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের

মন্ত্রিসভায় মতভেদ দেখা দিল। হার্টৎসগ নিরপেক্ষতা চাইছিলেন, স্মাট্‌স্‌ বৃটিশপক্ষে যোগ দিয়ে জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা চাইছিলেন। ৪ঠা সেপ্টেম্বর পার্লামেণ্টের অধিবেশনে দুইজনের দুটি পৃথক ও প্রায়-বিপরীত প্রস্তাব উপস্থিত হল। মালান-পন্থীদের ভোট পেয়েও হার্টৎসগ ৬৭-৮০ ভোটে পরাজিত হলেন। গভর্ণর-জেনারেল সার প্যাট্রিক ডানকান স্মাট্‌স্‌কে নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করতে আহ্বান করলেন। ডমিনিয়ন পার্টি ও লেবার পার্টি স্মাট্‌স্‌কে সমর্থন জানাল। স্মাট্‌সের নেতৃত্বে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার হিটলারের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামল।

হার্টৎসগ, মালান ও পিরো এই বিষয়ে একমত হলেও তাঁদের পরস্পরের মধ্যে সম্প্রীতি ছিল না। মালান ও পিরো হিটলার-সমর্থক নাৎসী ছিলেন। মালান প্রকাশ্যে তা বলতে চাইতেন না, পিরো বলতেন। হার্টৎসগ এঁদের কাউকেই পছন্দ করতেন না। প্রথমে হার্টৎসগ ও মালান একত্রে 'পুনর্মিলিত ন্যাশনাল জনতা পার্টি' গঠন করলেন, পিরো নাৎসী আদর্শে 'নব-বিধান পার্টি' (New Order) প্রতিষ্ঠা করলেন। নানারকম অদল-বদল ও কলহ-বিবাদের শেষে হার্টৎসগকে বিদায় নিতে হল; মালান নিজের পার্টির ভেতরে পিরো-পন্থীদেরও শায়েস্তা করে নিজে সর্বেসর্বা হয়ে উঠলেন। হার্টৎসগ-পন্থীরা 'আফ্রিকানের পার্টি' নাম দিয়ে আলাদা একটা পার্টি করেছিল; ১৯৪২ সালে হার্টৎসগ পদত্যাগ করে অবসর গ্রহণ করলে নিকোলাস হাভেঙ্গা এ পার্টির নেতা হন; ১৯৪৮ সালে এই পার্টি মালানের ন্যাশনাল পার্টির সঙ্গে যৌথ মন্ত্রিসভায় অংশ নেয়; ১৯৫১ সালে 'ন্যাশনাল' ও 'আফ্রিকানের' পার্টি মিলে সংযুক্ত পার্টির নাম হয় 'আফ্রিকানের ন্যাশনাল পার্টি'; এই পার্টিই আজ দক্ষিণ আফ্রিকার শাসকদল।

যুদ্ধ চলার সময় 'ও-বি' এবং অন্যান্য ফাসিস্ট গুপ্তসংগঠনগুলো নাৎসী-ফাসিস্ট অক্ষশক্তির সাহায্যকল্পে শুধু প্রচারই নয়, ধ্বংসাত্মক

কার্যকলাপও চালাচ্ছিল। ১৯৪১ সালের মার্চ মাসে প্রধানমন্ত্রী স্মাট্‌স্‌ 'জাতীয় নিরাপত্তা আইন' অনুসারে 'ও-বি'কে আপত্তিকর কার্যকলাপে লিপ্ত রাজনৈতিক সংগঠন বলে ঘোষণা করলেন এবং সরকারী কর্মচারী ও শিক্ষকদের এই সংগঠনের সদস্যপদ বর্জন করতে নির্দেশ জারী করলেন। অনেকে আনুষ্ঠানিকভাবে এই নির্দেশ পালন করলেও ও-বি'র সদস্যসমর্থকদের সংখ্যা কমল না। সে সময়ে ও-বি'র সংখ্যাগত শক্তি তিন লক্ষের ওপর, তার একটা উল্লেখযোগ্য অংশ পুলিসবাহিনীর মধ্যে।[২২]

১৯৪১ সালের ২২শে জুন হিটলার সোভিয়েট রুশকে আক্রমণ করার পর বৃটেন ও সোভিয়েট রুশের মৈত্রী মালান-পিরো'র দলকে ক্ষিপ্ত করে তুলেছিল। 'কালো আতঙ্ক', ইহুদী-বিদ্বেষ, ইংরেজ-বিদ্বেষ ও ভারতীয়-বিদ্বেষের সঙ্গে 'লাল আতঙ্ক' এসে মিশেছিল। ১৯৪২ সালে খনি-অঞ্চলে এবং রেলওয়েতে 'ও-বি' ক্রমাগত বোমাবাজি করছিল। সরকার হঠাৎ হানা দিয়ে পুলিসের এবং রেলওয়ে-পুলিসের প্রায় ৩৫০ জন লোককে গ্রেপ্তার করল, তাদের অনেকের কাছে ধ্বংসাত্মক কাজের বোমা পাওয়া গিয়েছিল। মালান এ সময়ে বৃটিশ-সম্পর্ক ছিন্ন করে 'সাধারণতন্ত্র' ঘোষণা করার ও জার্মানীর সঙ্গে সন্ধি করার সোচ্চার দাবী তুলেছিলেন। পার্লামেণ্টে তাঁর প্রস্তাব হেরে যাওয়ার পর ব্যাপক ধ্বংসাত্মক কাজকর্ম শুরু হল—খনি-অঞ্চলে বিদ্যুৎ-সরবরাহের ইলেকট্রিক পাইলন বোমা মেরে উড়িয়ে দেওয়া হল, টেলিগ্রাফ-টেলিফোনের তার কেটে দেওয়া হল, ডারবান শহরে ও-বি সশস্ত্র অভ্যুত্থানের চেষ্টা করল। সরকার এসব দমন করল, কিন্তু বিশেষ কাউকে কোন উল্লেখযোগ্য শাস্তি দেওয়া হল না।[২৩]

মালানের দুইজন সুযোগ্য সহচরের নাম এখানে উল্লেখযোগ্য। প্রথম জনের নাম 'হেন্‌ড্রিক ভেরউর্ট'—ন্যাশনাল পার্টির মুখপত্র 'ডি ট্রান্সভালের' পত্রিকার সম্পাদক; ইনি এঁর পত্রিকায় প্রকাশ্যে হিটলারের বিজয় কামনা করে প্রবন্ধাদি লিখছিলেন। দ্বিতীয় ব্যক্তির

নাম 'বালথাজার জন্ ফর্স্টার' ; দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হিটলারের সমর্থনে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের অভিযোগে এঁকে আটক করে রাখতে হয়েছিল।[২৪] এঁরা উল্লেখযোগ্য, কারণ ভেরউর্ট ১৯৫৮ সাল থেকে ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ; তাঁর মৃত্যুর পর প্রধানমন্ত্রী হলেন ফর্স্টার, আজও তিনি প্রধানমন্ত্রী।

মহাযুদ্ধের মধ্যেই ১৯৪৩ সালে নির্বাচন হল। স্মাট্সের কোয়ালিশন বিপুলভাবে জয়লাভ করল। ইউনাইটেড পার্টির আসন-সংখ্যা ৭০ থেকে বেড়ে ৮৯ হল, কোয়ালিশনের আসনসংখ্যা ৮৭ থেকে হল ১০৫ ; বিরোধী সদস্যদের সংখ্যা ৬৩ থেকে ৪৩-এ নামল।

১৯৪৫ সালে মহাযুদ্ধ শেষ হবার পর নতুন পরিস্থিতি। ইউরোপে মহাযুদ্ধ শেষ হবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সোভিয়েট রুশের প্রভাববিস্তার রোধ করার উদ্দেশ্যে বৃটিশ আয়োজন শুরু হয়ে গিয়েছিল ; সাম্রাজ্য-বাদের নতুন প্রস্তুতি চলছিল। অপরদিকে পৃথিবীর সর্বত্র পুরনো সাম্রাজ্যবাদী দখল নড়ে গিয়েছিল—ভিয়েৎনামে, ভারতবর্ষে, ব্রহ্ম-দেশে, আফ্রিকার নানা দেশে, সর্বত্র জাতীয় স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের সংগ্রাম নতুন তেজে শুরু হয়েছিল।

দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গসমাজে যুদ্ধশেষে এল ঘোর প্রতিক্রিয়ার আতঙ্কিত পশ্চাৎমুখী টান। এখানে এল ন্যাশনাল পার্টি ও ব্রোয়েডেরবণ্ডের নাৎসীবাদী রাজত্বের কাল। ১৯৪৮ সালের মে মাসে নির্বাচনে বিভিন্ন দলের আসনসংখ্যা হলঃ ন্যাশনাল—৭০, ইউনাইটেড—৬৫, আফ্রিকানের—৯, লেবার—৬। ন্যাশনাল ও আফ্রিকানের দলের কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা হল, প্রধানমন্ত্রী ড্যানিয়েল মালান। মালান-হাভেঙ্গার দল স্মাট্সের দলের চেয়ে এক লক্ষ ভোট কম পেয়েও ৮টি আসন বেশি পেয়েছিল।

শুরু হল 'আফ্রিকানের-ন্যাশনাল' শাসন। এদের নির্বাচনী শ্লোগানই ছিল 'Die Kaffer op se plek en die Koelie uit die land'—'কাফিরকে তার যথাযোগ্য স্থানে আর কুলীকে দেশের

বাইরে।' অ-শ্বেতাঙ্গদের ওপর অত্যাচারের বন্যাস্রোত বইতে থাকল। যে স্বল্প কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ এসব অত্যাচারের প্রতিবাদ করলেন, তাঁরাও দমন-পীড়ন-লাঞ্ছনার শিকার হলেন। ন্যায়বিচার, মানবিক অধিকার বা উদারনীতির কথা যে-ই বলুক তাকে 'কমিউনিস্ট' বলে চিহ্নিত করা হল। 'কাফির, কুলী, কমিউনিস্ট'—এই তিন শত্রুর বিরুদ্ধে 'শ্বেতাঙ্গ পাশ্চাত্য খ্রীস্টান সভ্যতা রক্ষার জন্য জেহাদ' শুরু হল। মুছে গেল বিশ্বরাষ্ট্রসংঘের মানবিক অধিকারের সনদ, মুছে গেল সমস্ত সভ্যবিধির দলিল।

কিন্তু যাদের ওপর অত্যাচার তারাও আর পুরনো জায়গায় পড়ে ছিল না। তারা জেগে উঠেছিল, উঠে দাঁড়িয়েছিল।

অষ্টম অধ্যায়

জাগরণ, আঘাত, আলোড়ন

॥ এক ॥

কোন দেশ বা জাতির ইতিহাসে এমন সময় কখনো হয় না যখন সব মানুষ ঘুমোয়। সব সময়েই কেউ না কেউ জাগে। জাতীয় জাগরণ যে কখন শুরু হয় তার তারিখ নির্দিষ্ট করা খানিকটা ভ্রান্তিকর। সূচনারও সূচনা থাকে, ইতিহাসেরও প্রাক্-ইতিহাস থাকে।

তবুও ১৯১২ সালের ৮ই জানুয়ারী অরেঞ্জ-প্রদেশের ব্লোয়েম্-ফণ্টেইন শহরে আফ্রিকান নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের সম্মেলন থেকে দক্ষিণ আফ্রিকায় আফ্রিকান জাগৃতির ইতিহাস শুরু করা চলে। ওই সম্মেলনকে দক্ষিণ আফ্রিকার আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা-সম্মেলন বলে ধরা হয়ে থাকে।

এ সম্মেলনের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন পিক্‌স্‌লি কা ইজাকা সেমে। 'পিক্‌স্‌লি' এক মার্কিন মিশনারীর নাম। তাঁর নাম থেকেই 'ইজাকা'র পুত্র 'সেমে'র নাম হয়েছিল পিক্‌স্‌লি। পিক্‌স্‌লি সেমে তখনকার দক্ষিণ আফ্রিকায় পাশ্চাত্য-শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত অল্প কয়েকজন কৃষ্ণকায় আফ্রিকানদের মধ্যে একজন। মার্কিন মিশনারীদের পৃষ্ঠ-পোষকতায় তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন, সেখান থেকে ইংল্যাণ্ডে গিয়ে অক্সফোর্ড বিশ্ব-বিদ্যালয়ে আইন শিক্ষা করেন, লণ্ডনে ব্যারিস্টার-তালিকাভুক্ত হন। অনেক উচ্চাশা ও রঙীন কল্পনা নিয়ে সেমে দেশে ফিরেছিলেন, তার মধ্যে ছিল তাঁর স্বজাতি জুলুদের মধ্যে শিক্ষা ও আধুনিক সংস্কৃতির বিস্তার, তাদের সামাজিক উন্নতিসাধন, তাঁর নিজের মতো আরো অনেক জুলু যুবক গড়ে তোলা।

এতদিন বিদেশে কাটিয়ে সেমে বোধ হয় নিজের দেশের বাস্তব চেহারা খানিকটা ভুলে গিয়েছিলেন। দেশে ফিরে হঠাৎ যেন একটা প্রচণ্ড রূঢ় ধাক্কা লাগল। ভিক্টোরিয়ার যুগের ইংরেজ ভদ্রলোকের মতো মর্নিংকোট টপ্‌হ্যাটে সুশোভিত সেমে জোহানেসবার্গে ব্যারিস্টারী করতে এসে দেখলেন, পথের দুধারে বাঁধানো ফুটপাথের ওপর কালোমানুষের চলার অধিকার নেই, ফুটপাথে উঠলে লাথি গলাধাক্কা জুটবে; যে কোন শ্বেতাঙ্গকে দেখামাত্র কালোমানুষের মাথার টুপী খুলে অভিবাদন করতে হবে; রেলগাড়িতে কালো মানুষের জন্য নির্দিষ্ট চতুর্থ শ্রেণীর কামরা, গরুছাগল চালান দেওয়ার জন্য আসনবিহীন ট্রাক-গাড়ির মতো; শহর শ্বেতাঙ্গদের, সেখানে কালোমানুষকে সদাসর্বদা 'পাস্‌', ট্যাক্সের রসিদ ও অন্যান্য নানারকম অনুমতিপত্র পরিচয়পত্র ইত্যাদি সঙ্গে নিয়ে চলাফেরা করতে হয়, রাত্রি নটার পর রাস্তায় বেরুতে হলে বিশেষ অনুমতিপত্র নিতে হয়; পুলিস যখন-তখন তল্লাসী করে, এসব কাগজপত্র না দেখাতে পারলে তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ড; আদালতে শ্বেতাঙ্গ জজ-ম্যাজিস্ট্রেট

কালোমানুষের কোন কথা শোনে না, বোঝে না, শুনলে-বুঝলেও বিশ্বাস করে না,—কালোমানুষ মাত্রেই যে অলস চোর মিথ্যুক অসভ্য, এ বিশ্বাস অবিচল ; আর, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে কালো শিশুদের প্রবেশ নিষেধ।'

সেমে-র মতোই আরেকজন বিলেত-ফেরত কালো সলিসিটর, রিচার্ড ম্‌সিমাঙ, দেশে ফিরে 'পাস্‌' দেখাতে না পেরে সরাসরি জেলে চালান হয়েছিলেন। সেমে, ম্‌সিমাঙ, এবং তাঁদের মতো আরো দুইজন বিলেত-ফেরত কালো আইনজীবী একত্রে বসে আলোচনা করে ঠিক করলেন, আফ্রিকানদের একজোট হওয়া দরকার এবং এজন্য সমস্ত আফ্রিকান গোষ্ঠীপ্রধানদের ও নেতৃস্থানীয়দের একটা সম্মেলন করা দরকার। তাঁরা যোগাযোগ করলেন গোষ্ঠীপ্রধানদের সঙ্গে, নেতৃস্থানীয়দের সঙ্গে, পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষদের সঙ্গে ; খ্রীস্টধর্মে দীক্ষিত হয়ে যাঁরা যাজক হয়েছেন, 'রেভারেণ্ড' আখ্যা লাভ করেছেন, তেমন লোকেদের সঙ্গে।

সম্মেলনের প্রস্তুতি-পর্বে 'ইম্‌ভো জাবান্‌ৎস্থুন্‌ড়ু' ["কৃষ্ণকায় অভিমত"] পত্রিকায় সেমে এক ছোট্ট ইশ্‌তেহারের শেষে লিখলেন—আমরা এক জাতি ; বিভিন্ন আফ্রিকান জাতির মধ্যে উপজাতীয় বিবাদ-সংঘর্ষের যুগ শেষ হয়ে গেছে ; খোশা-র সঙ্গে ফিঙ্গো-র বিবাদ, জুলু-র সঙ্গে তঙ্গা-র বিবাদ, সোথো-র সঙ্গে বাকী সকলের বিবাদ, এসব ভুলতে হবে ; আমাদের নিজেদের মধ্যে এইসব বিভেদ বিবাদ ও পারস্পরিক ঈর্ষা-সন্দেহ, এইগুলোই আমাদের সমস্ত দুর্দশার কারণ, আমাদের বর্তমান পশ্চাৎপদতা ও অশিক্ষা-অজ্ঞতার কারণ।

এ একটা নতুন কথা, তখনকার দক্ষিণ আফ্রিকায় কালো-মানুষদের মধ্যে একটা নতুন চিন্তার প্রকাশ। ঠিক এই কথাটা এইভাবে এর আগে দক্ষিণ অফ্রিকায় ওঠেনি। সেমে কথাটা বলতে পেরেছিলেন, এবং অনেক লোকের মনে কথাটা সাড়া তুলেছিল, কারণ এ সময়ে তার ক্ষেত্র তৈরী হয়েছিল। আধুনিক শিক্ষায়

শিক্ষিত কিছু মানুষ তৈরী হয়েছিল; ইংরেজী-জানা মানুষদের মধ্যে একটা যোগসূত্র তৈরী হয়েছিল ইংরেজী ভাষা দিয়েই—জুলু, খোশা, সোথো, ৎসোআনা, প্রভৃতি বিভিন্ন আফ্রিকান ভাষাভাষী মানুষদের সাধারণ সমস্যা নিয়ে সমবেত আলোচনা ও চিন্তার একটা সাধারণ ভাষা পাওয়া গিয়েছিল।[২] ইংরেজী ভাষায়, এবং রোমান লিপিতে খোশা, জুলু, সোথো ভাষায় পত্রিকা ছাপা হচ্ছিল। আর, ইংরেজী-শিক্ষিত আফ্রিকানদের মধ্যে আগে যে কল্পনা ছিল, শ্বেতাঙ্গ-মিশনারী বা শ্বেতাঙ্গ-শাসকের অভিভাবকত্বেই সব দুঃখ ঘুচবে, সে কল্পনা ভাঙছিল। সম্মেলন শুরু হল খ্রীস্টান প্রার্থনা দিয়ে। উদ্বোধনী সঙ্গীত হল খোশা-ভাষায় রচিত "ঙ্‌কোসি সিকেলেল্ ই আফ্রিকা"—"প্রভু আশীর্বাদ কর আফ্রিকাকে"। সংগঠনের নাম হল 'সাউথ আফ্রিকান নেটিভ ন্যাশনাল কংগ্রেস।' মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস সংগঠনের আদর্শে, বৃটিশ পার্লামেণ্টারী রীতিপদ্ধতি অনুসারে, ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের খানিকটা সাদৃশ্য নিয়ে এই সংগঠন। প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হলেন নাটাল প্রদেশের জুলু নেতা ও শিক্ষা-সংগঠক রেভারেণ্ড জন্ লাঙ্গালিবালেলে ডুবে। সম্পাদক হলেন সলোমন প্লাত্‌যে,—ইংরেজী জার্মান ওলন্দাজ এবং আফ্রিকান ভাষা-গুলিতে দক্ষ বক্তা ও লেখক, ৎসোআনা ভাষায় এক পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক। অন্যান্য নেতাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রেভারেণ্ড ওআলটার রুবুসানা, কেপ্ প্রদেশের আইনসভায় আফ্রিকানদের নির্বাচিত প্রতিনিধি। দক্ষিণ আফ্রিকার ইতিহাসে আইনসভা-সদস্যদের নামের তালিকায় আজ পর্যন্ত একমাত্র নাম ওআলটার রুবুসানা। এরপর আফ্রিকানদের আইনসভা-সদস্য হবার অধিকার এবং ভোটের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছিল।

কেপ্ প্রদেশের আরেকজন প্রভাবশালী আফ্রিকান নেতা জন্ তেঙ্গো জাবাভু এই কংগ্রেস-সংগঠন থেকে দূরে সরে রইলেন। এরিক ওয়াকার লিখেছেন, রুবুসানা'র বিরুদ্ধে জাবাভু'র ঈর্ষা ছিল প্রচণ্ড,

সেই কারণেই তিনি তাঁর 'ইম্‌ভো' পত্রিকায় এই কংগ্রেস-সংগঠনকে আমল দিলেন না, এবং 'সাউথ আফ্রিকান রেসেস্ কংগ্রেস' নাম দিয়ে এক পাল্টা সংগঠন তৈরী করে রুবুসানা'র বিরুদ্ধে লাগলেন।[৩] ফলে পরবৎসর কেপ্ প্রাদেশিক আইনসভায় আফ্রিকান প্রতিনিধির আসনটিতে নির্বাচনের সময় আফ্রিকান ভোট দু'ভাগ হয়ে রুবুসানা হারলেন, নির্বাচিত হলেন একজন শ্বেতাঙ্গ। এর ফলে জাবাভু'র প্রভাব-প্রতিপত্তিও অনেক কমে গিয়েছিল। ইস্কুল প্রতিষ্ঠা করে সংবাদপত্র চালিয়ে আফ্রিকানদের উন্নতিবিধানের প্রচেষ্টা করে যে সুনাম তিনি অর্জন করেছিলেন তা দিয়ে এই গ্লানি ঢাকা যায়নি।[৪]

'সাউথ আফ্রিকান নেটিভ ন্যাশনাল কংগ্রেস'-এর প্রাথমিক চেহারা ছিল গ্রামাঞ্চলের উপজাতীয় গোষ্ঠীপ্রধানদের সঙ্গে শহরের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের যোগাযোগের মঞ্চ, সেখানে নেতৃত্ব জোগাচ্ছেন আইনজীবী, ধর্মযাজক, সাংবাদিক, শিক্ষকরা। এঁদের লক্ষ্য ছিল শিক্ষাক্ষেত্রে, শিল্পে, আইনসভা-পার্লামেণ্টে বর্ণবৈষম্যের প্রাচীর লাঘব করা এবং আফ্রিকানদের আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলে শ্বেতাঙ্গদের সমপর্যায়ভুক্ত করানো। কেন্দ্রীয় সরকারের পার্লামেণ্টে কবে একজন কৃষ্ণাঙ্গ আফ্রিকান সদস্য বসতে পারবে—তাই ছিল এঁদের স্বপ্ন। এঁরা নিজেদের 'অনুগত বৃটিশ প্রজা' বলে পরিচয় দিতেন, বিদ্রোহ বা বিপ্লবের বাষ্পমাত্র কোথাও ছিল না।

॥ দুই ॥

তবুও এর মধ্যেই সঞ্চিত হচ্ছিল ভবিষ্যতের উপাদান। অন্য নেতারা অভিজাত হলেও সম্পাদক সলোমন প্লাত্ যে ঠিক অভিজাত মেজাজের মানুষ ছিলেন না। তিনি দেশের নানা জায়গায় ঘুরতে লাগলেন। পথ-চলতি মানুষের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে থাকলেন, আর দেশটার আসল চেহারা তাঁর চোখে একটু একটু করে উন্মোচিত হতে থাকল। সেই নতুন চেতনা দিয়ে দেখা দেশের চেহারা

সলোমন প্লাত্‌যের লেখা বই 'নেটিভ লাইফ্ ইন্ সাউথ আফ্রিকা' গ্রন্থের উপজীব্য—মর্মন্তুদ দৃশ্য ও ঘটনার চলচ্চিত্রের মতো। জমি থেকে উৎখাত আফ্রিকান দম্পতি চলেছে যথাসর্বস্ব নিয়ে, শিশুটা নিউমোনিয়ায় মরল, তাকে কবর দেবার জমি নেই, রাতের অন্ধকারে অন্য লোকের চোখ এড়িয়ে অন্যের জমিতে বাচ্চাটাকে কবর দিল; জীবিকার সন্ধানে পঞ্চাশ-ষাট-সত্তর মাইল হাঁটছে মানুষ; শাদা গুণ্ডার দল হামলা করছে, গরুবাছুর কেড়ে নিচ্ছে, গুলী চালাচ্ছে, মানুষ মেরে ফেলছে।

প্লাত্‌যে যে দৃশ্যগুলো দেখছিলেন সেগুলোর পেছনে ছিল নতুন এক আইনের ধাক্কা। ১৯১৩ সালের জুন মাসে দক্ষিণ আফ্রিকার নবগঠিত ইউনিয়ন-পার্লামেণ্টে বোথা সরকার 'নেটিভ্‌স্ ল্যাণ্ড অ্যাক্ট' নামক আইন পাস করাল। সলোমন প্লাত্‌যে লিখেছিলেন,—"১৯১৩ সালের ২০শে জুন তারিখে আফ্রিকান মানুষ সকালে ঘুম ভেঙে দেখল, তার নিজের জন্মভূমিতে সে পরদেশী হয়ে গেছে।"

এই আইনে বলা হল, অতঃপর দক্ষিণ আফ্রিকার শতকরা ৯০ ভাগ জমি শ্বেতাঙ্গদের জন্য নির্দিষ্ট এলাকা হল, শতকরা ৭·৩ ভাগ আফ্রিকানদের জন্য বরাদ্দ রাখা হল। তখন শ্বেতাঙ্গদের সংখ্যা ১০ লক্ষ, আফ্রিকানরা ৪০ লক্ষ। আফ্রিকানদের জন্য বরাদ্দ জমি প্রায় সবই খারাপ জমি, অনাবৃষ্টি-ক্লিষ্ট ডাঙ্গা-এলাকায়, শহর বা রেলপথ বা রাজপথ থেকে অনেক দূরে। আইনে আরো বলা হল, শ্বেতাঙ্গ-এলাকায় শ্বেতাঙ্গদের ভৃত্য আফ্রিকান ছাড়া আর কোন আফ্রিকান বসবাস করতে পারবে না, করলে তা দণ্ডনীয় অপরাধ হবে। এ সময়ে শ্বেতাঙ্গ জমিদারদের খামারের সংলগ্ন জমিতে দশ লক্ষ আফ্রিকান বসবাস করছিল—কেউ ভাগচাষী হিসাবে, কেউ বা কিছু বেগার-খাটুনীর বিনিময়ে থাকবার অনুমতি পেয়েছিল। তারা সবাই উচ্ছেদ হল।[৫] শ্বেতাঙ্গ ও কৃষ্ণাঙ্গ মানুষকে পৃথক করে রাখার যে ব্যবস্থা 'সেগ্রেগেশন' নামে কুখ্যাত হয়েছে, সেই সেগ্রেগেশন আর

এক ধাপ এগোল। পরে সেগ্রেগেশন থেকে এসেছে 'আপার্টহেইট্' — বর্ণ বৈষম্যের আরো এক ধাপ।

উচ্ছেদ-হওয়া মানুষগুলো যাবে কোথায় ? 'আফ্রিকান রিজার্ভ' এলাকায় জমির টানাটানি, জমি পেলেও তা দিয়ে সংসার চালানো যাবে না। তার ওপর সরকারের ট্যাক্স জোগানোর নগদ পয়সা কোথা থেকে আসবে ?

শ্বেতাঙ্গ শাসকরা 'সেগ্রেগেশন' চাইছিলেন, কিন্তু আরো বেশি করে চাইছিলেন আফ্রিকানরা সস্তা মজুর-চাকর হয়ে তাঁদের খনিতে, কলকারখানায়, রাস্তায় রেললাইনে খাটতে আসুক, তাঁদের বাড়িঘরে চাকর-চাকরানীর খাটুনী খাটতে আসুক, তাঁদের খামারে ক্ষেতমজুর হয়ে আসুক।

অথচ খনিতে কলকারখানায় অনেক কাজেই আফ্রিকানদের নিয়োগ করা চলবে না, দক্ষ-শ্রমিকের কাজগুলো শাদা মজুরদের জন্য নির্দিষ্ট রাখতে হবে। ১৯১১ সালে আইন পাস হয়েছিল, 'মাইন্‌স্ অ্যাণ্ড ওয়ার্কস অ্যাক্ট'—খনি ও কারখানা সংক্রান্ত আইন। এই আইনে বলা হল, যন্ত্রপাতি নিয়ে যাকে-তাকে কাজ করতে দেওয়া চলবে না, গভর্নর-জেনারেল বিশেষ নিয়মাবলী (রেগুলেশন্‌স্) অনুসারে যাকে যন্ত্রের কাজ করতে যোগ্য বলে ঘোষণা করে 'কম্পি-টেন্সি সার্টিফিকেট' দেবেন, সেরকম লোককেই ওই কাজে নিয়োগ করা যাবে। রেগুলেশনে বলা হল, খনিতে ডিনামাইট দিয়ে পাথর ফাটানোর (ব্লাস্টিং) কাজ ইউরোপীয় ছাড়া কাউকে দেওয়া চলবে না; এই ধরনের মোট ৩২ রকম কাজ আফ্রিকানদের পক্ষে নিষিদ্ধ করা হল।[৬] এগুলো এর আগে কার্যতঃ নিষিদ্ধ ছিল, এখন আইনতঃ নিষিদ্ধ হল। সঙ্গে আরো ব্যবস্থা হল—আফ্রিকান শ্রমিক ও শ্বেতাঙ্গ শ্রমিকের একটা অনুপাত বেঁধে দেওয়া হল।

ব্যাপারটা আসলে হত, কাজটা আফ্রিকান শ্রমিকরাই করত, কিন্তু একজন শ্বেতাঙ্গ শ্রমিক হাজির থাকত তদারকীর ভারপ্রাপ্ত হয়ে।

ওই শ্বেতাঙ্গ শ্রমিক পেত দক্ষ-শ্রমিকের মজুরী আর আফ্রিকান শ্রমিকরা যে কাজই করুক, মজুরী জুটত কালোমানুষের জন্য বাঁধা হারে—অ-দক্ষ শ্বেতাঙ্গ মজুরের মজুরীর চেয়েও অনেক কম।

১৯২২ সালে যখন শ্বেতাঙ্গ শ্রমিকদের ধর্মঘট হয় তখন মালিকরা চেয়েছিল প্রতি একজন শ্বেতাঙ্গ শ্রমিকের সঙ্গে ১০·৫ জন আফ্রিকান শ্রমিক নিয়োগ করার অধিকার। শ্বেতাঙ্গ শ্রমিকদের দাবী ছিল ১ জন শ্বেতাঙ্গের সঙ্গে ৩·০৫ জনের বেশি আফ্রিকান শ্রমিক নিয়োগ করা চলবে না।[৭]

এ সময় আফ্রিকান শ্রমিককে সপ্তাহে ৬০ ঘণ্টা খাটতে হত, ছয়টা ১০ ঘণ্টার শিফ্‌টে। অনেকক্ষেত্রে দিনে ১২ ঘণ্টাও খাটুনী বাঁধা ছিল। ওভারটাইম খাটুনীর জন্য কোন বাড়তি মজুরী ছিল না। বেশি মজুরীর কাজ যে করছে, তাকে কম মজুরীর খাটুনী খাটালে আপত্তি করার উপায় ছিল না।[৮]

আর খনি-শিল্পে ছিল কম্পাউণ্ড আটকের ব্যবস্থা। আফ্রিকান শ্রমিকরা সবই 'ইনডেনচার্ড', গিরমিটিয়া। গুদামঘরের মতো এক একটা কামরায় বিশ থেকে চল্লিশ জন মানুষকে গাদাগাদি করে রাত কাটাতে হতো, কম্পাউণ্ড-পুলিস যখন-তখন এসে ধাক্কা মেরে তুলতো, তল্লাসী হতো। ভোর হতে না হতে ঠেলে খনির মুখে পাঠিয়ে দেওয়া হতো, সেখানে অপেক্ষা করতে হতো কখন তদারকের ভারপ্রাপ্ত শ্বেতাঙ্গ শ্রমিক বা সুপারভাইজার আসবে, তারপর কাজ শুরু হবে। স্ত্রী-পুত্রপরিবার ছেড়ে এই শ্রমিক চুক্তির কাল কাটাত কোনরকমে; নেশাগ্রস্ত হত, কুসংস্রবে যেত, যৌনব্যাধিতে ভুগত; আর, যক্ষ্মা ও নিউমোনিয়ায় মরত। যে কয়দিন বাঁচত, সে কখনো কখনো গ্রামের বাড়িতে তার পরিবারের জন্য কিছু পয়সা পাঠাত, এক বস্তা জওয়ার বা মকাই পাঠাত, কখনো একখানা কম্বল বা কাপড়ের টুকরো।[৯]

জমি থেকে উচ্ছেদ কালোমানুষ তবুও খনিতে-কারখানাতেই কাজ খুঁজতে যেত, আর উপায় নেই বলে। কিন্তু সবাই কাজ পেত না।

সেমে বা ডুবে বা রুবুসানা খনি-কলকারখানায় বা মাঠে-খামারে আফ্রিকান শ্রমজীবীর এসব কথা বিশদভাবে জানতেন না বা ভাবতেন না। তাঁরা তখনো শাসককুলের প্রচারিত ধারণা নিয়ে চলছিলেন—অশিক্ষা ও কুসংস্কার, সংস্কৃতি ও শীলের অভাব, এসবই আফ্রিকানদের দুর্দশার কারণ, এগুলো যত কমানো যাবে তত আফ্রিকানদের অবস্থা ভালো হবে। আধুনিক শিক্ষা ও সংস্কৃতি দরকার,—কিন্তু তা দিয়ে অধিকাংশ আফ্রিকানদের সমৃদ্ধি ঘটানোর আশা ভ্রান্ত দুরাশা, আসলে শিক্ষা-সংস্কৃতি প্রয়োজন আফ্রিকানদের নিজেদের মুক্তিসংগ্রাম উপযুক্ত ভাবে চালানোর জন্য—এ চেতনা আন্দোলনের প্রথম স্তরে কোথাও থাকে না, দক্ষিণ আফ্রিকাতেও ছিল না।

॥ তিন ॥

আন্দোলনের ওই প্রাথমিক স্তরেই কিন্তু খুব মোটা দাগে লেখা কয়েকটি আইন আফ্রিকানদের সকলকে আঘাত করছিল প্রতি মুহূর্তে। যে আইনটা দরিদ্র বা সচ্ছল সব আফ্রিকানের হাতে-পায়ে শিকলের মত সর্বদা ঝন্‌ঝন্ করে বাজত, তাদের দাসত্বের প্রতীক-চিহ্ন হয়ে সর্বদা বিঁধতো, সে আইন হল পাস্-আইন।

আর, পরের কাছে মেহনৎ বিক্রী ক'রে বা বাঁধা-গোলামী ক'রে যে আফ্রিকানকে বাঁচতে হয়, তার জন্য এর ওপর আরেকটা বড়ো আইন—তার নাম, 'মাস্টার অ্যাণ্ড সার্ভেন্টস্ অ্যাক্ট'। এই আইনেও 'পাস্' রাখতে হবে, না দেখাতে পারলে জেলে যেতে হবে। তার সঙ্গে আরেকটা দিক হল, প্রভুর অবাধ্য হলে, বা আলস্য, শৈথিল্য, দুর্বিনীত আচরণ, অথবা কাজ-ছেড়ে পালানো ইত্যাদি অপরাধ করলে ভৃত্যের শাস্তির বিবিধ ব্যবস্থা; শাস্তির মধ্যে কারাদণ্ড, জরিমানা ছাড়াও চাবুক-মারা একটা বিধি। চাবুকের ঘায়ে কৃষ্ণকায় ভৃত্যের প্রাণনাশের বহু ঘটনা ঘটত, আজো ঘটে। স্মরণ রাখতে হবে, ধর্মঘট এই আইনে দণ্ডনীয় অপরাধ, এবং ভাগচাষীও

এই আইনে ভৃত্যপর্যায়ভুক্ত, এবং ওইসব 'অপরাধে' সমানভাবে দণ্ডনীয়।

এইসব আইন বহাল ছিল। তার ওপর এল ১৯১৩ সালের 'নেটিভ্‌স্ ল্যাণ্ড অ্যাক্ট' নামক ওই ভূমি-আইন। উচ্ছেদ-হওয়া মানুষগুলোর এখন 'পাস্' দেখাতে হবে, অথচ না আছে ঘর-দোর, না আছে জমিজমা, না আছে চাকরী।

নবগঠিত 'সাউথ আফ্রিকান নেটিভ ন্যাশনাল কংগ্রেস' এই আইনের প্রতিবাদ করল। অনেক দরখাস্ত, আবেদন-নিবেদন হল। শাসকরা কর্ণপাত করল না। নেটিভ কংগ্রেস লণ্ডনে পর্যন্ত প্রতিনিধিদল পাঠাল, বৃটিশ সরকারকে ব্যাপারটা বোঝানোর জন্য। বৃটিশ উপনিবেশমন্ত্রীকে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধানমন্ত্রী জেনারেল বোথা যা বুঝিয়েছিলেন তা ছাড়া আর কোন কথা বুঝতে তিনি গররাজী। প্রতিনিধিদল ব্যর্থ হয়ে ফিরে এল।

কিন্তু এদিকে দক্ষিণ আফ্রিকায় শুধু আবেদন-নিবেদন নয়, প্রতিবাদের অন্য ভাষা-ভঙ্গীও দেখা দিয়েছিল।

১৯১৩ সালের জুলাই মাসে অরেঞ্জ প্রদেশে ব্লোয়েমফনটেইন শহরের রাজপথে একদিন সকালবেলা দেখা গেল এক অভূতপূর্ব অকল্পিতপূর্ব মিছিল—৬০০ আফ্রিকান মহিলা একসঙ্গে হাঁটছে। এরা খাটুনী খাটে, শ্বেতাঙ্গ কারখানায়-দোকানে চাকরী-নোকরী করে, শ্বেতাঙ্গগৃহে দাসীবৃত্তি করে, মেথরানী-ধোবানীর কাজ করে, হাসপাতালে দাসী নামে আসলে নার্সের কাজ করে। এই মেয়েদেরও 'পাস্' রাখতে হতো এবং প্রতি মাসে 'পাস্'-এর জন্য এক শিলিঙ করে ফী দিতে হতো। তাদের কালো মুখে-চোখে ক্রোধের রাঙা আগুন, কিন্তু তারা চিৎকার-চেঁচামেচি করেনি, বরফের মত ঠাণ্ডা আর পাথরের মতো দৃঢ় ভাবে তারা পথ হাঁটছিল। মিউনিসিপাল অফিসের সামনে গিয়ে তারা দাঁড়াল—'মেয়রকে চাই'। মেয়র নেই, ডেপুটি মেয়র বেরিয়ে এলেন। মেয়েরা এক বস্তা পাস্ তাঁর পায়ের কাছে

ঢেলে দিয়ে বলল, 'আমরা আর পাস্ কিনব না'। তারপর তারা ঘুরে দাঁড়িয়ে দৃপ্ত পায়ে হেঁটে চলে গেল।[১০]

অন্য এলাকাতেও মেয়েরা হাঁটতে শুরু করল। জ্যাগের্সফন্টেই পল্লীতে ৫২ জন মেয়ে 'পাস্‌বুক' নিয়ে চলতে অস্বীকার করে জেলে গেল, তাদের নেত্রী মোসাম্বিক থেকে আগত এক নিকষকালো মেয়ে এসব অঞ্চলে জেলখানাগুলো ভরে গেল। মেয়েদের কঠিন সশ্রম কারাদণ্ড দিয়ে বড় জেলখানায় চালান করা হল। প্লাতযে ৩৪ জনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দেখলেন তারা শুকিয়ে কঙ্কালসার হয়েছে, শীতের মধ্যে তাদের পায়ের জুতোমোজা কেড়ে নেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর কাছে টেলিগ্রাম করলেন প্লাতযে। কোন ফল হল না।

১৯১৩ সালেই সেপ্টেম্বর মাসে ওদিকে নাটাল থেকে গান্ধীজীর নেতৃত্বে ভারতীয়রা পদযাত্রা শুরু করেছিল ট্রান্সভালের দিকে, ভারতীয়দের প্রবেশ-নিষেধ আইন 'ইমিগ্রেশন অ্যাক্ট'-এর বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ শুরু হয়েছিল। ভারতীয় গিরিমিটিয়া হাঁটছিল, কয়লা-খনিতে ধর্মঘট করছিল। ভারতীয় মেয়েরা জেলে যাচ্ছিল, সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করছিল, কারাদণ্ড ভুগে ষোল বছরের মেয়ে ভালিআম্মা রোগশয্যায় প্রাণ দিয়েছিল।

কিছু যেন হবে। জননী আফ্রিকার গভীর অন্তর থেকে যন্ত্রণার এই মোচ্‌ড়ানিতে বুঝি কিছু সৃষ্টি হবে। বাতাসে বুঝি দূরাগত কোলাহলের প্রথম থর্‌থরানি।

সব মুলতুবী হয়ে গেল। লণ্ডন থেকে ফিরে এসে নেটিভ ন্যাশনাল কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা যখন এক বিশেষ সম্মেলনে তাঁদের আবেদন-নিবেদনের ফলাফল সম্বন্ধে রিপোর্ট দিচ্ছিলেন, সেই সময়েই খবর এল বৃটেন জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করেছে, মহাযুদ্ধ শুরু হয়েছে। আফ্রিকান নেতারা আফ্রিকানদের দাবীগুলো আপাততঃ শিকেয় তুলে বৃটিশরাজকে সর্ববিধ সাহায্য করার সঙ্কল্প ঘোষণা করলেন। ওদিকে ভারতীয়দের নাটাল ইণ্ডিয়ান কংগ্রেসও তাই

করল। বৃটিশরাজের রক্ষার্থে ভারতবর্ষে স্বয়ং গান্ধীজী সৈন্যসংগ্রহে নামলেন 'রিক্রুটিং এজেন্ট' হয়ে।

রুবুসানা দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারকে চিঠি লিখলেন, দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকায় জার্মান সৈন্যদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য ৫০০০ আফ্রিকান সৈন্য তিনি সংগ্রহ করে দেবেন। সরকারের উত্তর এল: 'যারা ইউরোপীয়-বংশজাত নয় তেমন মানুষদের যোদ্ধা হিসাবে কাজে লাগাতে আমরা চাই না। অন্যান্য বিবেচনার বিষয় ছাড়াও, এ যুদ্ধ ইউরোপে শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে যুদ্ধ, শ্বেতাঙ্গদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেটিভদের নিয়োগ পরিহার করার জন্য সরকার উদ্‌গ্রীব।'[১১] সশস্ত্র সৈন্য হিসেবে কালোমানুষদের নেওয়া হল না বটে, কিন্তু গাড়িচালক, আরদালী ও শ্রমিক হিসেবে তাদের বাহিনীতে নেওয়া হল ; তারা যুদ্ধে মরলও, কিন্তু আহত-নিহতের তালিকায় স্থান পেল না। দক্ষিণ-আফ্রিকার সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ৮৪ হাজারেরও বেশি অ-শ্বেতাঙ্গ।

বোয়ার-যুদ্ধের মতো এই মহাযুদ্ধের সময়ও অনেক বড় বড় নীতি ঘোষণা করা হয়েছিল। বিভিন্ন জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার, শান্তি ও সম্প্রীতি ইত্যাদি কথা ছিল। এইসব কথার মাঝে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধানমন্ত্রী স্মাট্‌স্ লণ্ডনে এক বক্তৃতায় বললেন—"দক্ষিণ আফ্রিকাকে শ্বেতাঙ্গ মানুষের দেশে পরিণত করাই আমাদের আদর্শ।" স্মাট্‌স্ বোধহয় খেয়াল করেননি যে তাঁর এই বক্তৃতার বিবরণ কিছু কালোমানুষও পড়বে।

সাউথ আফ্রিকান নেটিভ ন্যাশনাল কংগ্রেসের এসময়ে অবস্থা খুব খারাপ। সেমে সমস্ত কর্তৃত্ব দখল করছিলেন ; ডুবে-র সঙ্গে তাঁর কলহ এমন দাঁড়াল যে ডুবে পদত্যাগ করে চলে গেলেন। সেমে নিজেও কংগ্রেসের কাজকর্ম প্রায় ছেড়ে দিয়ে নিজের আইন-ব্যবসায়ে মগ্ন হয়ে গেলেন। তবু সংগঠনকে কোনরকমে ধরে রাখার মতো কয়েকজন মানুষ ছিলেন, তাঁরাই প্রদীপটুকু জ্বালিয়ে রাখলেন।

॥ চার ॥

দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে অনেক দূরে, রুশদেশে, ১৯১৭ সালে বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব এক মশাল জ্বালিয়েছিল। কিন্তু আফ্রিকান নেতাদের কাছে সে মশালের আলো তখন পৌঁছয়নি। সে আলোর ঝলক লেগেছিল কয়েকজন শ্বেতাঙ্গের মনে। তাঁরা 'ইণ্টারন্যাশনাল সোসালিস্ট লীগ' নামে এক প্রতিষ্ঠান গঠন করেছিলেন; 'ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্কার্স অব্ আফ্রিকা' নামে আরেকটি প্রতিষ্ঠান গঠন করে তাঁরা শ্রমিকদের সংগঠিত করার চেষ্টা করছিলেন কালো আফ্রিকান শ্রমিকদের কাছেও তাঁরা যাতায়াত করছিলেন ১৯১৮ সালে আফ্রিকান শ্রমিকদের নিজেদের বিক্ষোভের সঙ্গে এসব প্রচেষ্টা জড়িয়ে গেল।

যুদ্ধের সময় জিনিসপত্রের দাম বেড়েছিল হুহু করে, কিন্তু শ্রমিকদের মজুরী সে তুলনায় বাড়েনি। তার ওপর গ্রামাঞ্চলের খামার-বাড়ি থেকে দরিদ্র শ্বেতাঙ্গ-সন্তানরা শহরাঞ্চলে চাকরী-মজুরীর খোঁজে আসছিল, বেকারসমস্যার বিপদ দেখা দিয়েছিল। শ্বেতাঙ্গ মজুরদের মজুরী সামান্য বাড়লেও আফ্রিকান মজুরের মজুরী এক পয়সাও বাড়েনি।

১৯১৮ সালের মে মাসে জোহানেস্‌বার্গে মিউনিসিপালিটি শ্বেতাঙ্গ শ্রমিকরা ধর্মঘট করে দাবী আদায় করে নিল। আফ্রিকান শ্রমিকরা ১৯১৮ সালের জুন মাসে ধর্মঘট করল—দক্ষিণ আফ্রিকায় আফ্রিকান শ্রমিকের প্রথম ধর্মঘট, নানারকম আইনের নিষেধের প্রাচীর ভেদ করে। মিউনিসিপালিটির এই আফ্রিকান শ্রমিকদের কাজ ছিল ধাঙড়ের কাজ—খাটা পায়খানা থেকে মলমূত্রের বালতি সরানো। দৈনিক মজুরী ছয় পেনী বৃদ্ধির দাবীতে এদের এই ধর্মঘট 'ডাউন বাকেট্‌স্' ধর্মঘট বলে পরিচিত হয়ে আছে। ১৫২ জন ধর্মঘটী শ্রমিককে গ্রেপ্তার করে দুই মাসের কঠোর সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হল। নেটিভ ন্যাশনাল কংগ্রেস এবং ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্কার্স

অব্ আফ্রিকা এক সাধারণ ধর্মঘট ডাকল। সঙ্গে সঙ্গে পুলিস কংগ্রেসের পাঁচজন নেতাকে এবং ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্কার্স অব আফ্রিকা সংগঠনের সিডনী বান্টিং ও আরো দুইজন শ্বেতাঙ্গ নেতাকে গ্রেপ্তার করল—হিংসাত্মক কার্যকলাপে উসকানি দেওয়ার অভিযোগে। প্রমাণ অভাবে পুলিস মামলা চালাতে পারল না, এঁরা খালাস পেলেন; কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার ইতিহাসে একটা নতুন পর্বের সূচনা হল—রাজনৈতিক মামলায় শাদা-কালো একসঙ্গে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াল।[১২]

১৯১৯ সালের মার্চ-এপ্রিল মাসে দক্ষিণ অফ্রিকায় নেটিভ ন্যাশনাল কংগ্রেস শান্তিপূর্ণ গণবিক্ষোভের পথে পা বাড়াল। বিক্ষোভের বিষয় 'পাস্'-আইন। বিক্ষোভের কেন্দ্র স্বর্ণখনি-শহর জোহানেস্বার্গ। বাড়ি বাড়ি গিয়ে স্বেচ্ছাসেবকেরা আফ্রিকানদের কাছ থেকে পাস্ চেয়ে নিল। তারপর কয়েক হাজার আফ্রিকান জড়ো হয়ে বস্তাভর্তি পাস্ কর্তৃপক্ষের কাছে ফেলে দিয়ে চলে গেল। ধর-পাকড় চলল। প্রথম দফায় দু'শো মানুষকে আদালতে হাজির করা হল। আদালতের সামনে বিশাল জনতার ভীড়। তারা সম্পূর্ণ শান্তভাবে আদালতের রায় জানবার জন্য অপেক্ষা করছিল, অনেক মেয়ে এসেছিল বন্দী স্বামী বা বাপ বা ভাইয়ের জন্য খাবার নিয়ে। হঠাৎ ঘোড়সওয়ার পুলিস ছুটল, বেত চলল, ব্যাটন পড়তে থাকল মানুষগুলোর ওপর। শ্বেতাঙ্গ গুণ্ডারাও ছুটে এল 'নিগার' ঠ্যাঙাতে।

কংগ্রেস নেতারা অনেকে গ্রেপ্তার হলেন, কারাদণ্ড ভোগ করলেন। কয়েকদিন ধরে প্রতিবাদ-আন্দোলন চলে তারপর থিতিয়ে গেল।

পাস্‌বিরোধী বিক্ষোভে মেয়েরাই পথিকৃৎ ছিল। তারা আবার বিক্ষোভ শুরু করেছিল। গ্রেপ্তার হয়ে জেল খাটছিল। তাদের নেত্রী মিসেস শার্লট মাখেকে—প্রসিদ্ধ গায়িকা এবং মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের গ্র্যাজুয়েট। তাঁর নেতৃত্বে ন্যাশনাল কংগ্রেসের মহিলা-শাখা গঠিত হয়েছিল। মঞ্চের ওপর উঠে অনর্গল দৃপ্ত বক্তৃতা করা আফ্রিকান মেয়েদের কাছে তখনো একটা নতুন ব্যাপার ছিল।

১৯২০ সালের ফেব্রুয়ারীতে জোহানেস্‌বার্গে এক বিপুল তরঙ্গ আছড়ে পড়ল। অকস্মাৎ ৭১ হাজার আফ্রিকান খনিশ্রমিক মজুরী বৃদ্ধির দাবীতে ধর্মঘটে নামল।[২৩] ওয়াকার এই ধর্মঘটকে 'বম্বশেল্‌' বলে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু ধর্মঘট ঠিকভাবে সংগঠিত হয়নি, এত বড় ধর্মঘটের অভিজ্ঞতা ও শত্রুর কৌশল সম্বন্ধে জ্ঞান আফ্রিকানদের মধ্যে ছিল না। শ্বেতাঙ্গ শ্রমিকরা এই ধর্মঘটের শুধু বিরোধিতা করেই ক্ষান্ত থাকল না, খনি চালু রেখে এবং আফ্রিকানদের মারপিট করে ধর্মঘট ভাঙার কাজে লাগল। তাতেও হল না, শ্বেতাঙ্গ নাগরিকরা এসে আফ্রিকান শ্রমিকদের জমায়েতের ওপর গুলী চালাল, খুন জখম করল। ধর্মঘটীরা হেরে গেল।

জোহানেস্‌বার্গে খনিশ্রমিকরা হেরে গেলেও আফ্রিকান শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন কিন্তু এরপর দ্রুততালে বাড়তে থাকে। কেপ্‌টাউন বন্দরের আফ্রিকান ডক্‌-শ্রমিকদের মধ্যে এসময়ে একজন অসাধারণ বেগবান ও কর্মচঞ্চল সংগঠকের আবির্ভাব হয়েছিল। ক্লিমেন্‌স্‌ কাডালির জন্মভূমি নিয়াসাল্যাণ্ড; সেখান থেকে জীবিকার অন্বেষণে কেপটাউনে এসে তিনি আধা-কেরানী, আধা-শ্রমিকের কাজ নিয়েছিলেন। ১৯১৮ সালে মাত্র ২৪ জন ডক্‌-শ্রমিক সদস্য নিয়ে তিনি 'ইণ্ডাস্ট্রিয়াল অ্যাণ্ড কমার্সিয়াল ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন' (আই-সি-ইউ) প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২৫ সালে আই-সি-ইউ'র কেন্দ্রীয় অফিস জোহানেস্‌বার্গে নিয়ে যাওয়ার সময় তার সদস্য-সংখ্যা প্রায় ৫০ হাজার; ১৯২৭ সালে আই-সি-ইউ যখন সাউথ আফ্রিকান ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত হবার জন্য দরখাস্ত করে তখন তার সদস্যসংখ্যা ১ লক্ষ বলে ঘোষণা করেছিল।

খনিশ্রমিকদের মধ্যে আই-সি-ইউকে ঢুকতে দেওয়া হয়নি, তবুও সদস্যসংখ্যা এভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। কাডালি'র নেতৃত্বে আই-সি-ইউ এ সময়ে বিভিন্ন জায়গায় আফ্রিকান শ্রমিকদের অসংখ্য ছোট ছোট ধর্মঘট পরিচালনা করেছিল। এ সময়ে আই-সি-ইউ শুধু ট্রেড

ইউনিয়ন নয়, আফ্রিকানদের রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবেও প্রভাব-শালী হয়ে উঠেছিল।[১৪] মারপিট করে, গুলী চালিয়ে, ধর্মঘট ভেঙে আই-সি-ইউকে দমানো যায়নি। ১৯২০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে খনিশ্রমিকদের ধর্মঘট ভাঙল, সেই বৎসরেই অক্টোবর মাসে দক্ষিণে সমুদ্রতীরে পোর্ট এলিজাবেথ বন্দরে স্থানীয় আই-সি-ইউ শাখার সভাপতি মাসাবালালা অ-শ্বেতাঙ্গ শ্রমিকদের বিশাল জমায়েতে ধর্মঘটের জন্য আহ্বান জানান। সাতদিনের মধ্যে মাসাবালালা বিনা ওয়ারেণ্টে গ্রেপ্তার হলেন। থানার সামনে অ-শ্বেতাঙ্গ শ্রমিকরা জড়ো হয়ে মাসাবালালাকে জামিনে ছাড়তে অনুরোধ করল। তাদের সে অনুরোধ পুলিস শুনল না। ইতিমধ্যে একদল শ্বেতাঙ্গ থানার মধ্যে ঢুকে পুলিসের বন্দুকগুলো নিয়ে জনতার ওপর গুলী চালাতে শুরু করল। ২৪ জন শ্রমিক নিহত হল। এই হত্যাকাণ্ডের কোন বিচার হল না।[১৫]

তবুও শ্রমিকদের সংগঠন বিস্তৃত হচ্ছিল। ক্লিমেন্স কাডালি শ্বেতাঙ্গ ট্রেড ইউনিয়ন মহলে খাতির পেতে শুরু করেছিলেন। শ্বেতাঙ্গ উদারনীতিকরা তাঁর পিঠ চাপ্‌ড়াচ্ছিল। বৃটিশদের বিরুদ্ধে কাডালিকে কাজে লাগাবার জন্য প্রধানমন্ত্রী হার্টৎসগ পর্যন্ত কাডালির সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার করছিলেন।

এরই মধ্যে শ্বেতাঙ্গ-সরকার দুটো বড় হত্যাকাণ্ড ঘটাল। আফ্রিকানদের মধ্যে তখন নানা ধর্মসম্প্রদায়—এক খ্রীস্টান ধর্মেরই ১৬০টা আফ্রিকান সম্প্রদায় সৃষ্টি হয়েছে। এই রকম একটা সম্প্রদায় নিজেদের "ইস্রায়েলী" বলত। এরা ইহুদী নয়, নিকষকালো আফ্রিকান ; কিন্তু খ্রীস্টান বাইবেলে ইস্রায়েলীদের দুঃখকাহিনী আছে, সেই সঙ্গে আছে ঈশ্বরের প্রতিশ্রুতি—ইস্রায়েলীরা ঈশ্বরের বিশেষ অনুগ্রহভাজন, একদিন তাদের সব দুর্দশার অবসান হবে, তারা অতুলনীয় সমৃদ্ধির অধিকারী হবে ; অত্যাচারিত বঞ্চিত আফ্রিকানরা কেউ কেউ নিজেদের এই ইস্রায়েলী ভেবে সান্ত্বনা খুঁজত। সিস্‌কেই

অঞ্চলে, বুলহোয়েক নামে একটা জায়গায় আফ্রিকান 'ইস্রায়েলী'রা জড়ো হয়ে তাঁবু খাটিয়ে, ঝুপ্‌ড়ি ঘর মাটির কুঁড়ে বানিয়ে বসবাস করতে শুরু করেছিল। ওখানে বসবাস করার অনুমতি এদের দেওয়া হয়নি। ১৯২১ সালের মে মাসে পুলিস এসে বন্দুক উঁচিয়ে এদের ওঠাবার চেষ্টা করে। এরা ওঠেনি। পুলিস ফিরে যায়। ধর্মীয় উন্মাদনাগ্রস্ত 'ইস্রায়েলী'দের ধারণা হয় যে তারা ঈশ্বর-আশ্রিত বিশেষ বিভূতিধারী, বন্দুকের গুলী দ্বারা অভেদ্য, সেইজন্যই পুলিস গুলী চালাতে পারল না। এরপর সৈন্যবাহিনী আসে, ৮০০ রাইফেলের মুখে 'ইস্রায়েলী'রা ঝাঁপিয়ে পড়ে। আমাদের দেশে সাঁওতাল বিদ্রোহের সময় অথবা তিতুমীরের বিদ্রোহের সময় এই রকম ঘটনা ঘটেছিল বলে লোকশ্রুতি আছে; বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ করার পর কেউ খুন-জখম হল না দেখে "গুলো আমরা খেয়ে লিলম্‌" বলে বিদ্রোহীরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল বলে শোনা যায়। 'ইস্রায়েলী'রা ১৬৩ জন নিহত হয় এবং প্রায় ২০০ জন আহত হয়। এ হত্যাকাণ্ড শুধু একটা ক্ষুদ্র ধর্মীয় সম্প্রদায়ের ব্যাপার রইল না, আফ্রিকান বেদনার ইতিহাসে একটা বড় স্থান নিল, জাতীয় জাগরণের উপাদান স্বরূপ আরেকটা বড় আঘাত হল।

পরের বছর আবার মে মাসেই দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকায় যে হত্যাকাণ্ড হল, তাতে হতাহতের হিসেব রইল না। ওদেশের দক্ষিণ প্রান্তে পুরনো বাসিন্দা খয়-খইন জাতির 'নামা' গোষ্ঠীর একটা শাখা বাস করত—শ্বেতাঙ্গরা তাদের বলত 'বনডেল-সোয়ার্টস'। শুকনো ডাঙায় পশু চরিয়ে আর কিছু পশুপাখী শিকার করে এরা কোনরকমে বাঁচত, দুর্দশার অন্ত ছিল না। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকায় জার্মান রাজত্ব খতম করার জন্য এদের কাজে লাগানো হয়েছিল। যুদ্ধের পর দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার শাসক হল দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার। তখন শ্বেতাঙ্গ-খামারে গোলামী করতে বাধ্য করার জন্য এদের ওপর ট্যাক্স চাপানো হল—কুকুর-ট্যাক্স। এরা

পশুপালক শিকারী জাত, কুকুর এদের অবশ্য-প্রয়োজনীয় নিত্যসঙ্গী। সেই কুকুরের জন্য ট্যাক্স দিতে হবে—১টি কুকুর থাকলে ১ পাউণ্ড, ২টি থাকলে ২½ পাউণ্ড, ৪টি থাকলে ৭ পাউণ্ড, ৫টি থাকলে ১০ পাউণ্ড, এইরকম ক্রমবর্ধমান হারে।

যাদের খেতে-পরতে জোটে না তারা এই পয়সা কোথা থেকে দেবে? শ্বেতাঙ্গ খামারে গোলামী করে ট্যাক্সের পয়সা জোগাড় করার উপদেশ নিঃশব্দে মেনে না নিয়ে এরা প্রতিবাদ করেছিল, ট্যাক্স দিতে অস্বীকার করেছিল। অতএব, ১৬শে মে তারিখে এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা শুরু হল। এই নিরস্ত্র দরিদ্র প্রায়-সর্বহারা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সেদিন গোলন্দাজ-বাহিনী, মেসিনগান, এবং এরোপ্লেন পাঠানো হয়েছিল। হতাহতের কোন হিসেব পাওয়া যায়নি।[১৬]

॥ পাঁচ ॥

১৯২৪ সালের নির্বাচনে 'ন্যাশনাল'-'লেবার' জোটকে সমর্থন করে দক্ষিণ আফ্রিকার কমিউনিস্ট পার্টি পার্লামেন্টারী সুবিধাবাদের চরম কু-দৃষ্টান্ত দেখিয়েছিল। কিন্তু নির্বাচনের অল্পকাল পরে কমিউনিস্ট পার্টি ঘুরে দাঁড়াল। অ্যান্টনী স্যাম্‌সন ও মেরী বেন্‌সন্ উভয়েই লিখেছেন যে শ্বেতাঙ্গ শ্রমিকদের চালচলন দেখে কমিউনিস্টদের মোহভঙ্গ হয়েছিল, তাই তাঁরা অতঃপর কালোমানুষদের দিকে এলেন, আফ্রিকান শ্রমিকদের মধ্যে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনের শিক্ষা ও রাজনৈতিক শিক্ষা জোগানোর কাজে মনোনিবেশ করলেন। এরিক ওয়াকার লিখেছেন, শ্বেতাঙ্গ-রাজনীতির কোন মহলেই প্রবেশ করতে না পেরে কমিউনিস্টরা কালোমানুষদের সংগঠনে প্রবেশ করলেন।[১৭]

এগুলো হয়তো প্রত্যক্ষ কারণ। কিন্তু ১৯২৪ সালে এই সময়ে কমিউনিস্টদের কার্যক্রম পরিবর্তনের পিছনে সম্ভবতঃ আরো একটা কারণ ছিল। দক্ষিণ আফ্রিকায় নির্বাচন হয়েছিল ১৯২৪ সালের জুন

মাসে ; আর, ১৭ই জুন থেকে ৮ই জুলাই পর্যন্ত মস্কোয় অনুষ্ঠিত হয়েছিল কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের ৫ম বিশ্ব-সম্মেলন। সেই সম্মেলনের নানা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের মধ্যে একটা সিদ্ধান্তে পরাধীন দেশগুলিতে ও সাম্রাজ্যবাদের উপনিবেশগুলিতে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রতি কমিউনিস্টদের কর্তব্য পালনের জোরাল আহ্বান ছিল। বৃটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলি এ বিষয়ে তাদের কর্তব্যপালন করছে না বলে অভিযোগ উঠেছিল। ভিয়েৎনামের হো চি মিন তীব্র অভিযোগ করেছিলেন—বৃটেন, ফ্রান্স, হল্যাণ্ড, বেলজিয়ম প্রভৃতি দেশের ধনিকশ্রেণী যে ঔপনিবেশিক আক্রমণ-অভিযান চালাচ্ছে তার বিরুদ্ধে ওইসব দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলি বিশেষ কিছুই করছে না।[১৮] বৃটিশ কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে কড়া অভিযোগ উঠেছিল। ভারতের এম্ এন্ রায় বৃটিশ কমিউনিস্ট পার্টির অসুবিধা ব্যাখ্যা করে বলেন—"বৃটিশ শ্রমিকশ্রেণী বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের মধুরসে আপাদমস্তক সিক্ত হয়ে আছে।[১৯]

এই সব সমালোচনার ফলেই হোক, বৃটিশ কমিউনিস্ট পার্টির নতুন নির্দেশের ফলেই হোক, বা নিজেদের আত্মোপলব্ধির ফলেই হোক, দক্ষিণ আফ্রিকার কমিউনিস্ট পার্টি ঘুরে দাঁড়ালেন এবং ক্লিমেন্স কাডালি'র আই-সি-ইউ সংগঠনে যোগ দিলেন। এরপর তাঁরা অন্যান্য ব্যাপারে ভুল করেছেন, কিন্তু কালোমানুষের পক্ষে থেকেছেন অবিচলিতভাবে, এ ব্যাপারে তাঁদের আর পদস্খলন হয়নি।

কমিউনিস্টদের কর্মদক্ষতা, সংগঠনের জ্ঞান ও রাজনৈতিক আদর্শ-বোধ আই-সি-ইউকে অনেক শক্তি জুগিয়েছিল। কমিউনিস্টদের নিজেদের প্রভাবও অনেক বেড়েছিল। আই-সি-ইউ'র কেন্দ্রীয় পরিষদে ১৯২৬ সালে ১১জন সদস্যের মধ্যে ৫জন কমিউনিস্ট ছিলেন।[২০] সিড্‌নী বান্টিং, বিল্ অ্যাণ্ডরুজ, এমিল সাখ্‌স্ প্রভৃতি শ্বেতাঙ্গ কমিউনিস্ট নেতারা শুধু নিজেদেরই দান করেননি, আফ্রিকান মুক্তি-সংগ্রামের অনেক কর্মী ও নেতাকে গড়ে তুলেছিলেন।

আই-সি-ইউ'র সদস্যসংখ্যা বাড়ছিল, শক্তি বাড়ছিল, 'কাডালি'র খাতির-কদর বাড়ছিল। কিন্তু কাডালি'র অধঃপতন শুরু হয়ে গিয়েছিল। শ্বেতাঙ্গ রাজনীতিক মহলের কেউ কেউ এসময়ে কাডালি'র পরামর্শদাতা হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁদের পরামর্শ দুটো —(১) ধীরে চলো, নরম-মেজাজে চলো, এমন কিছু ক'রো না যাতে শ্বেতাঙ্গ সহানুভূতিশীলদের সহানুভূতি নষ্ট হয় বা শত্রুভাবাপন্নদের শত্রুতা বাড়ে ; আর, (২) কমিউনিস্টদের সংস্রব ছাড়। কমিউনিস্টদের সংস্রব বর্জন করলে 'ইণ্টারন্যাশনাল ফেডারেশন অব্ ট্রেড ইউনিয়নস' নামক সংস্থায় আই-সি-ইউ ঠাঁই পাবে এবং প্রভূত অর্থ-সাহায্য পাবে, এই আশ্বাসও কাডালিকে দেওয়া হয়েছিল।[২১]

অপরদিকে, সাংগঠনিক বিষয়ে কাডালি খুব ঢিলেঢালা ধরনে চলতেন, নিয়মপদ্ধতি বিশেষ মানতেন না। টাকাপয়সার হিসেব ছিল এলোমেলো, তহবিল-তছরুপেরও অভিযোগ ছিল। আফ্রিকান শ্রমিকদের সাহায্য ও কল্যাণ করার উদ্দেশ্যে আই-সি-ইউ বেহিসেবী ভাবে একটা জামাকাপড় তৈরীর কারখানা খুলেছিল, একটা সংবাদ-পত্র চালাচ্ছিল, এবং জমিজমা কিনে বসতি স্থাপনের পরিকল্পনায় টাকা ঢালছিল। টাকাপয়সা উঠছিল অনেক ; কিন্তু খরচ হচ্ছিল তার চেয়েও বেশি। স্বভাবতই কেন্দ্রীয় পরিষদে এসব নিয়ে অসন্তোষ, কথা-কাটাকাটি, হিসেব-দাখিলের দাবী ও নিয়মপদ্ধতি মেনে চলার দাবী নিয়ে ঝগড়া হচ্ছিল।[২২]

এর সঙ্গে মিশেছিল কাডালি'র নরম-পন্থা নিয়ে অন্যদের অসন্তোষ ও সমালোচনা। আই-সি-ইউ এ সময়ে দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী দুটি ধারার দ্বন্দ্বের মঞ্চ হয়ে উঠেছিল।

১৯২৬ সালের ডিসেম্বরে দুই ধারার দ্বন্দ্ব চরমে পৌঁছল। প্রচণ্ড তর্কবিতর্ক ও ঝগড়ার পর কাডালি প্রস্তাব পাস করিয়ে নিলেন—আই-সি-ইউ'র কোন সদস্য কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হতে পারবে না। কমিউনিস্টদের বহিষ্কার করা হল। আই-সি-ইউ'র ভাঙন শুরু হল।

কাডালি বৃটেনে গিয়ে বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের কাছে খাতির সংবর্ধনা পেয়ে আরো নরমপন্থী হয়ে ফিরেছিলেন। একজন সমর্থক নাকি বলে উঠেছিলেন—'কাডালি, তুমি বিলেতে যাবার সময় ছিলে কালোমানুষ, ফিরে এলে কি শাদামানুষ হয়ে?"[২৩] ১৯২৮ সালে প্রধানমন্ত্রী হার্ৎসগ যখন বর্ণবৈষম্যের আরো নতুন আইন প্রস্তাব করলেন, আই-সি-ইউ দপ্তরে প্রশ্ন উঠল, কি করা যায়? কাডালি বললেন, এর প্রতিবাদে একদিন প্রার্থনাদিবস পালন করা হোক। টমাস ম্‌বেকি চিৎকার করে উঠেছিলেন—"প্রার্থনা অনেক হয়েছে, এখন সংগ্রাম চাই। ঈশ্বরের দোহাই কাডালি, তুমি রঙবদলের বহুরূপী হয়ো না।"[২৪] এই কাডালি-ই এক সময়ে খ্রীস্টান মিশনারীদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রচার চালিয়েছিলেন, "ওরা আফ্রিকানদের চোখ মাটির বাস্তবতা থেকে সরিয়ে আকাশের দিকে নিবদ্ধ রাখতে চায়, যে স্বর্গের অস্তিত্বের কোন প্রমাণ ওরা দিতে পারে না সেই স্বর্গের দিকে তাকিয়ে থাকতে বলে।"[২৫]

কাডালি চলে গেলেন ইউরোপে। তাঁর অনুপস্থিতি সত্ত্বেও অনেকগুলো স্বতঃস্ফূর্ত খণ্ড ধর্মঘট হল, সেগুলো অল্পদিনের মধ্যেই নিভে গেল। বৃটিশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস আই-সি-ইউ'র জন্য পরামর্শদাতা-পরিচালক পাঠালেন; তিনিও সংগঠন গুছোতে গিয়ে কাডালি'র সঙ্গে বিবাদ এড়াতে পারলেন না। নাটালে কাডালি'র দক্ষিণহস্ত ছিলেন জুলু শ্রমিকনেতা জর্জ চ্যাম্পিয়ন; তিনি কাডালি'র সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে নাটাল প্রদেশে আলাদা আই-সি-ইউ চালাতে থাকলেন। অবশেষে কাডালি নিজেই আই-সি-ইউ ত্যাগ করে নিজের স্বতন্ত্র আই-সি-ইউ প্রতিষ্ঠা করলেন। আই-সি-ইউ টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে গেল। কাডালিও শেষ হয়ে গেলেন।

আই-সি-ইউ একটা পুরোদস্তুর ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন হয়ে ওঠেনি, আবার রাজনৈতিক সংগঠনও হয়ে ওঠেনি। কিন্তু একটা বিশাল গণভিত্তিক রাজনৈতিক পার্টি বা মঞ্চ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা

আই-সি-ইউ'র ছিল। খনিশ্রমিকদের মধ্যে বা ক্ষেত-খামারের শ্রমিকদের মধ্যে আই-সি-ইউ পেঁাছতে পারেনি, তবু যত জায়গায় আই-সি-ইউ পৌঁছেছিল, অন্য কোন সংগঠন তার কাছাকাছি ছিল না। যতদিন আই-সি-ইউ তেজীয়ান ছিল, নেটিভ ন্যাশনাল কংগ্রেস বা অন্য সংগঠনগুলো ক্ষীণ ও নিষ্প্রভ হয়ে গিয়েছিল।

আই-সি-ইউ প্রসঙ্গে আরেকটি কথা উল্লেখযোগ্য। আই-সি-ইউ বা আফ্রিকান শ্রমিকদের কোন ট্রেড ইউনিয়নই আইন-অনুযায়ী রেজিস্টার্ড ট্রেড ইউনিয়ন ছিল না। ১৯২৪ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার 'ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কনসিলিয়েশন অ্যাক্ট' নামে যে আইন জারী করেন তাতে 'এমপ্লয়ি'দের (শ্রমিক-কর্মচারীদের) ট্রেড ইউনিয়ন গড়ার অধিকার স্বীকৃত হয় এবং ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্টার করার নিয়মাবলী স্থির করে দেওয়া হয়। সেই আইনে 'এমপ্লয়ি' শব্দটির সংজ্ঞা এমনভাবে ধার্য করে দেওয়া হয়েছিল যাতে আফ্রিকানরা ও অধিকাংশ ভারতীয়রা 'এমপ্লয়ি' বলে গণ্য হতে পারত না; কৃষি-শ্রমিকদেরও 'এমপ্লয়ি' সংজ্ঞার বাইরে রাখা হয়েছিল। এইভাবে এমপ্লয়িদের অধিকাংশকে 'এমপ্লয়ি নয়' বলে দেওয়া হয়েছিল এবং ট্রেড ইউনিয়ন রেজিস্টার করার অধিকার দেওয়া হয়েছিল শুধু শ্বেতাঙ্গ শ্রমিক-কর্মচারীদের।[২৬]

॥ ছয় ॥

১৯২৫ সালের সম্মেলনে নেটিভ ন্যাশনাল কংগ্রেসের নাম পরিবর্তন করে নতুন নাম হল 'আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস', সংক্ষেপে এ-এন-সি। সাংগঠনিকভাবে তখন এ-এন-সি খুবই দুর্বল।

১৯২৬ সালে হার্টৎসগ সরকার 'মাইন্‌স্ অ্যাণ্ড ওয়ার্কস' আইনের এক সংশোধনী আইন পাস করাল। ১৯১১ সালের এই আইনের বর্ণবৈষম্যমূলক কয়েকটি ধারাকে আদালত ১৯২৩ সালে অবৈধ বলে নাকচ করে দিয়েছিল। সেই ধারাগুলিকে আবার চালু করার জন্য

এই সংশোধনী আইনে স্পষ্ট করে বলে দেওয়া হল আফ্রিকান শ্রমিকরা অনেকগুলি দক্ষ কাজের অযোগ্য, তাদের দক্ষতা থাকলেও এইসব কাজে তাদের নিয়োগ নিষিদ্ধ।

এ-এন-সি এবং আই-সি-ইউ এই নতুন আইনের প্রতিবাদ করল বটে, কিন্তু প্রতিবাদ নিস্তেজ।

প্রতিবাদ নিস্তেজ হলেও শাসকগোষ্ঠী ক্ষান্ত হয় না। ১৯২৭ সালে আরেক আইন পাস হল—'নেটিভ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অ্যাক্ট'। এই আইনে গভর্ণর-জেনারেল সমস্ত আফ্রিকান গোষ্ঠীগুলির সর্বোচ্চ গোষ্ঠীপ্রধান (সুপ্রীম চীফ) হয়ে বসলেন। যে কোন আফ্রিকান গোষ্ঠীর প্রধানকে পদচ্যুত করার ক্ষমতা, যে কোন আফ্রিকান গোষ্ঠীকে বা গোষ্ঠীর অংশকে বা আফ্রিকান ব্যক্তিকে স্থানান্তরিত করার ক্ষমতা এবং স্থানান্তরে যাওয়া নিষেধ করার ক্ষমতা, ইত্যাদি বহু ক্ষমতা গভর্ণর-জেনারেল, অর্থাৎ সরকার, দখল করলেন।

এই আইনের একটি ধারায় বলা হল, যেসব কথাবার্তা বললে বা কাজ করলে ইউরোপীয় ও নেটিভদের মধ্যে অসদ্ভাব সৃষ্টি হতে পারে, সেরকম কথাবার্তা যদি কেউ বলে বা সেরকম কাজ করে, তাহলে তার শাস্তি হবে জরিমানা ও কারাদণ্ড।[২৭] প্রধানমন্ত্রী হার্টৎসগ থেকে শুরু করে 'ন্যাশনাল' পার্টির ও 'লেবার' পার্টির অনেক নেতা যেসব কথাবার্তা বলছিলেন ও যেসব অপকর্ম করছিলেন তাতে এই আইনে তাঁদের প্রতিদিন একবার করে দণ্ড হওয়া উচিত। কিন্তু এই আইন তাঁদের থামাবার জন্য করা হয়নি, কালোমানুষের বিরুদ্ধে বর্ণবিদ্বেষ প্রচার থামাবার জন্য করা হয়নি। এ-এন-সি ও কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি লক্ষ্য করে এই আইন করা হয়েছিল, বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রচার বন্ধ করার জন্য করা হয়েছিল। ১৯২৭ সালের জুন মাসে এইসব আইনের প্রতিবাদে এ-এন-সি, আই-সি-ইউ, ভারতীয় কংগ্রেস ও অন্যান্য সংগঠনের এক যৌথ সম্মেলন হল। কিন্তু এখান থেকে কোন আন্দোলন সৃষ্টি হল না।

১৯২৭ সালে এ-এন-সি'র নবনির্বাচিত সভাপতি জেম্‌স গুমেডে বেলজিয়মের ব্রাসেল্‌স্ শহরে গেলেন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী লীগের সম্মেলনে যোগ দিতে। সেখানে তিনি সোভিয়েট রুশ সরকারের আমন্ত্রণ পেলেন—'আমাদের দেশটা দেখে যাও।' রাশিয়ায় গিয়ে গুমেডে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। নিজের দেশে কালোচামড়ার জন্য তিনি অনেক দুঃখলাঞ্ছনা ভোগ করেছিলেন; রাশিয়ায় বর্ণবৈষম্যের চিহ্ন না দেখে তিনি অভিভূত হয়েছিলেন। দেশে ফিরে তিনি বলেছিলেন—'খ্রীষ্টধর্মে পাপকলুষমুক্ত নব-জেরুজালেমের আশ্বাস আছে, আমি নব-জেরুজালেম দেখে এলাম।' আমাদের দেশের রবীন্দ্রনাথও সে সময়কার রাশিয়াকে 'তীর্থ' আখ্যা দিয়েছিলেন।

কিন্তু এ-এন-সি'র মধ্যে 'কমিউনিজম' ও রাশিয়ার সম্বন্ধে বিরোধিতা প্রবল ছিল। রাশিয়ার বিরুদ্ধে পাশ্চাত্ত্য প্রচার তো ছিলই, তাছাড়া এ-এন-সি'র প্রাচীনপন্থী গোষ্ঠীপ্রধানরা রুশ বিপ্লবকে মোটেই ভালো চোখে দেখেননি। খ্রীস্টধর্মের প্রভাবাচ্ছন্ন বহু শিক্ষিত জাতীয়তাবাদীও কমিউনিজমকে নাস্তিক মতবাদ ও 'বৈদেশিক মতবাদ' বলে বিরোধিতা করতেন। যাঁরা পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে বৃটিশ বা মার্কিন রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থাকে আদর্শ মনে করছিলেন, তাঁরাও কমিউনিজমকে ঘোর বিপজ্জনক মতবাদ মনে করছিলেন।

আই-সি-ইউয়ের মতো এ-এন-সি'তেও প্রস্তাব উঠল, কমিউনিস্টদের সঙ্গে সংস্রব ছাড়তে হবে। গুমেডে চোখে আঙুল দিয়ে দেখালেন, হার্টৎসগ কমিউনিস্টদের ঘোর শত্রু বলে বর্ণনা করছেন; সরকার, খনিমালিকদের সমিতি, শ্বেতাঙ্গদের রাজনৈতিক দলগুলো, সবাই কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে আক্রোশে ভরা; এদের আক্রোশের কারণ, কমিউনিস্টরা জনসাধারণের পক্ষে এবং অত্যাচারের বিপক্ষে। গুমেডের আবেদনের পর প্রস্তাব প্রত্যাহার করা হল বটে, কিন্তু অসন্তোষ ও কমিউনিস্ট-বিরোধিতা রয়ে গেল

কমিউনিস্টরা এসময়ে এ-এন-সি'র ভেতরে কাজ করছিলেন।

তাছাড়া ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনও বিস্তার করছিলেন। বিল অ্যাণ্ডরুজ অল্পকালের মধ্যে স্বর্ণখনি অঞ্চলেই পোশাক-তৈরীর কারখানা, ধোবি-কারখানা, পাঁউরুটি-কারখানা, ফার্ণিচার-কারখানা প্রভৃতির আফ্রিকান শ্রমিকদের নিয়ে ১২টা ইউনিয়ন গড়েছিলেন। এই ইউনিয়নগুলোর ৩০০০ সদস্য নিয়ে 'নন্‌-ইউরোপীয়ান ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন' গঠিত হয় (ইউরোপীয়ানদের সঙ্গে আফ্রিকানদের একত্র ইউনিয়ন আইনতঃ নিষিদ্ধ ছিল) ; বারো মাসের মধ্যে এই ফেডারেশনের সদস্য-সংখ্যা ১০ হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছিল।[২৮]

॥ সাত ॥

ওদিকে সরকার প্রতিবৎসরই নতুন নতুন দমনমূলক ও বৈষম্যমূলক আইনের দড়াদড়ি বানাচ্ছিল।

১৯১২-১৩ সালে পিক্‌স্‌লি সেমে যখন কিছু জমি কিনে আফ্রিকান কৃষকদের আধুনিক কৃষিবিদ্যা ও ফার্মিং শেখাবার চেষ্টা করছিলেন, তখন অরেঞ্জ প্রদেশের বোয়াররা পার্লামেন্টসদস্য ও অরেঞ্জ প্রদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী আব্রাহাম ফিশার-এর কাছে তার বিরুদ্ধে নালিশ করতে গিয়েছিল। ফিশার নিজে ঘোর প্রতিক্রিয়াশীল ছিলেন। কিন্তু এই বোয়ারদের আব্দার শুনে তিনিও অতিষ্ঠ হয়ে বলেছিলেন— "তোমরা চাও কি ? সমস্ত 'কুলী'-আইন আর সমস্ত 'কাফির'-আইন আমরা তো পাস করে দিয়েছি। সরকার তোমাদের জন্য আর কি করতে পারে ?"[২৯] ফিশার জানতেন না যে তারপরে আরো বহু 'কুলী'-আইন ও বহু 'কাফির'-আইন পাস করতে হবে, প্রতিবৎসর নতুন নতুন আইন হবে, পুরনো আইনে নতুন ধারা যোগ করতে হবে, এবং শ্বেতাঙ্গ-রাজ কোনদিনই এ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে পারবে না, কোনদিন স্বস্তি পাবে না।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটা আইন উল্লেখ করা যাক। শহরাঞ্চলে কালো-মানুষদের প্রবেশ কমানো ও নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে ১৯২৩ সালে

আইন করা হয়েছিল—'নেটিভস (আর্বান এরিয়াজ) অ্যাক্ট।' এ আইনের সংশোধন করে কড়াকড়ি বাড়ানো হল ১৯৩০, ১৯৩৪, ১৯৩৭, ১৯৪১, ১৯৪৩ এবং ১৯৪৪ সালে মোট ছয়টি সংশোধনী আইন পাস ক'রে। ১৯৪৫ সালে আইনটাকে আগাগোড়া পুনর্লিখন ক'রে নতুন আইন হল 'নেটিভস (আর্বান এরিয়াজ) কনসলিডেশন অ্যাক্ট।' সেই বছরেই নতুন আইনের আবার সংশোধন করতে হল, এবং ১৯৪৬, ১৯৪৭, ১৯৫২, ১৯৫৫, ১৯৫৬, ১৯৬৪ সালে আরো ছয়বার সংশোধন করতে হল।[30]

আরো নানা আইন। সেগুলোর ধারাবাহিক বর্ণনা একঘেয়ে ও ক্লান্তিকর হবে। সবচেয়ে অসহ্য হয়ে উঠেছিল 'পাস্-আইনে'র কড়াকড়ি। এতরকম পাস্-আইন হচ্ছিল, আর সেগুলো এমন জটিল হয়ে উঠেছিল যে পুলিস পর্যন্ত আর বুঝে উঠতে পারছিল না কাকে কোন আইনের কোন ধারায় গ্রেপ্তার করে শাস্তি দিতে হবে। ১৯৩০ সাল নাগাদ পাস্-আইন ভঙ্গ করার অপরাধে প্রতিবৎসর ৪০ হাজার আফ্রিকান সাজা পাচ্ছিল। ইম্ভো'র মতো 'সুবোধ-সুশীল' আইনভক্ত পত্রিকাও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল—শিক্ষিত আফ্রিকান ভদ্রলোকরাও তো পাস্-আইনে সাজা পাচ্ছিলেন! ইম্ভো সরকারকে ভয় দেখাল—'অমন যদি কর, তাহলে আমরা কমিউনিস্টদের সঙ্গে হাত মেলাব।' ইম্ভো লিখেছিল—"আমরা কমিউনিস্টদের ভালবাসি না। কিন্তু একজন শ্বেতাঙ্গ ভদ্রলোকও তো জলে ডুবতে থাকলে অস্পৃশ্য 'নিগার'-এর কালো হাত আঁকড়ে ধরতে পারলে ছাড়েন না। কালোমানুষের দাসত্বের জোয়াল নামাতে যে সাহায্য করবে, সে কমিউনিস্টই হোক বা যে কোন ঘৃণ্য লোকই হোক, কালোমানুষ তার সাহায্য নিতে ইতস্ততঃ করবে না।"[31]

ইম্ভো-র জুজু-দেখানোয় সরকার ভীত হল না। অস্ওয়াল্ড পিরো তখন বিচারমন্ত্রী—কাফির, কুলী, কমিউনিস্ট সবাইকে শায়েস্তা করার জন্য তিনি তাণ্ডব চালাচ্ছেন তখন। ১৯২৯ সালের নভেম্বরে

পিরো এরোপ্লেনে উড়ে ডারবান শহরে গেলেন আফ্রিকানদের কাছ থেকে ট্যাক্স আদায় করতে—সঙ্গে ৫০০ শ্বেতাঙ্গ পুলিস, ২০০ কালো পুলিস, রাইফেল বেয়নেট, মেশিনগান। ৫০০০ মানুষের বাড়ি ঢুকে তল্লাসী হল, ২০০ জনের কারাদণ্ড হল, কাঁদুনে-গ্যাস ছাড়া হল।[৩২] ১৯৩০ সালে 'রায়টার্ট্ অ্যাসেম্বলী অ্যাক্ট' আইন হলঃ কোন লোক শ্বেতাঙ্গ আর অ-শ্বেতাঙ্গদের মধ্যে অসদ্ভাব সৃষ্টি করছে বলে যদি মন্ত্রীর মনে হয়, তাহলে মন্ত্রী সেই লোককে যেকোন এলাকা থেকে বহিষ্কৃত ও নির্বাসিত করতে পারবেন। এ-এন-সি, আই-সি-ইউ, কমিউনিস্ট পার্টি সবাই এ সময়ে পিরো'র কুশপুত্তলিকা পোড়াচ্ছিল, সেইসঙ্গে হার্ৎসগ এবং স্মাট্সেরও।

অসন্তোষ চতুর্দিকে, কিন্তু দেশজোড়া বিক্ষোভ দানা বাঁধে না। ১৯৩০ সালের ডিসেম্বরে পাস্-পোড়ানো আন্দোলন শুরু হল। কিন্তু শুধু এক ডারবান শহরেই ব্যাপক আন্দোলন দেখা গেল। এখানে তরুণ জুলু কমিউনিস্ট কর্মী জোহানেস্ ঙ্‌কোসি'র নেতৃত্বে চালিত এক বিশাল জমায়েতে পুলিস গুলী চালাল। আহত ঙ্‌কোসি এবং আরো দুইজন পরের দিন মারা গেলেন। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রথম কমিউনিস্ট শহীদ সম্ভবতঃ এই তরুণ জুলু গণসংগঠক।

ডারবান অঞ্চলে পিরো'র নতুন আইনের দাপট চলছিল, বহিষ্কার-নিষেধাজ্ঞা আর দেশান্তর-আদেশ মামুলী ব্যাপার হয়ে উঠেছিল। মোসাম্বিক, রোডেশিয়া প্রভৃতি প্রতিবেশী দেশ থেকে জীবিকার সন্ধানে আগত ২০০ জন আফ্রিকানকে নির্বাসন দিয়ে পিরো বললেন, এরা সব কমিউনিস্ট, এদের তাড়িয়ে দিলেই ডারবানে কমিউনিজমের বনেদ ভেঙে যাবে। এরা সবাই কমিউনিস্ট ছিল না। সরকারের উক্তির ফল হল উল্টো, আফ্রিকান সংগ্রামীরা কমিউনিস্টদের প্রতি আরো আকৃষ্ট হল, ভাবল—"তাহলে তো এরা ভালো যোদ্ধা!"[৩৩]

কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি এই পরিস্থিতির সদ্ব্যবহার করতে পারল না। ১৯৩০-এর দশকের প্রথম পাঁচ বছর বিশ্বের সর্বত্র কমিউনিস্ট

আন্দোলনের সঙ্কটকাল চলছিল। ১৯২৭ সালে চীনে কমিউনিস্ট পার্টির ওপর চিয়াং কাই শেকের বীভৎস প্রতিবিপ্লবী আক্রমণ ও কমিউনিস্ট পার্টির বিপর্যয়, সোভিয়েট কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বের তীব্রতা ও কুটিলতা বৃদ্ধি, জার্মানীতে হিটলারের ক্ষমতা দখল—নানাদিক থেকে প্রচণ্ড আঘাত পড়ছিল। সেই সঙ্গে যোগ হয়েছিল ১৯২৮ সালে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের ৬ষ্ঠ বিশ্ব সম্মেলনে গৃহীত অতি-বাম সঙ্কার্ণতাদুষ্ট বিভিন্ন সিদ্ধান্ত। একদিকে দক্ষিণপন্থী সোশাল-ডেমোক্রাটিক ঝোঁক, আরেকদিকে ত্রৎস্কীপন্থী অতি-বাম ঝোঁক, এই দুইয়ের বিরুদ্ধে লড়তে গিয়ে দেশে দেশে কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর অনেকেই ভারসাম্য হারিয়েছিল।

দক্ষিণ অফ্রিকার কমিউনিস্ট পার্টি এই আবর্তে প্রায় তছনছ হয়ে গিয়েছিল। বৃটেন থেকে ডাগ্‌লাস্ ওল্‌টন, মলি ওল্‌টন এবং লাজার বাখ্ দক্ষিণ আফ্রিকার কমিউনিস্ট পার্টির পরিচালক হয়ে এসে ১৯৩১ সালে সিডনী বান্টিং, বিল্ অ্যাণ্ডরুজ, এমিল সাখ্‌স্ প্রভৃতি অনেককে পার্টি থেকে বহিষ্কৃত করেন। এঁদের বিরুদ্ধে নাকি দক্ষিণপন্থী বিচ্যুতির অভিযোগ ছিল। ১৯৩৩ সাল নাগাদ দক্ষিণ আফ্রিকায় কমিউনিস্ট পার্টির কাজকর্ম প্রায় উবে গেল। সেসময় পার্টির সদস্য-সংখ্যা দেড়শো'র মতো, প্রায় সবাই শ্বেতাঙ্গ। পার্টি তছনছ হয়ে যাবার পর ওল্‌টন্-রা বৃটেনে ফিরে গেলেন।[৩৪]

॥ আট ॥

আই-সি-ইউ ভাঙল, কমিউনিস্ট পার্টি তছনছ হল, এ-এন-সি'র অবস্থাও ভাল নয়। জেম্‌স গুমেডে এ-এন-সি থেকে কমিউনিস্ট বিতাড়নের প্রস্তাব রুখেছিলেন, কিন্তু তাঁর বিরোধীরা তাঁকে রেহাই দিল না। ১৯৩০-এর দশকের গোড়ায় এ-এন-সি'র সভাপতি পদে গুমেডের বদলে নির্বাচিত হলেন পিক্‌স্‌লি সেমে। সেমে ইতিমধ্যে প্রতিক্রিয়াশীল রক্ষণপন্থী হয়ে উঠেছিলেন। হরতাল-ধর্মঘট বা বয়কট

বা পাস্‌-বর্জন ইত্যাদি ব্যাপক গণ-আন্দোলনের পদ্ধতিগুলো তাঁর পছন্দ ছিল না। তাঁর নেতৃত্বে এ-এন-সি জনতার থেকে বিচ্ছিন্ন মধ্যবিত্ত শিক্ষিত উচ্চাভিলাষীদের সংগঠন হয়ে রইল। ওদিকে নাটাল-ট্রান্সভালে ভারতীয় কংগ্রেস-সংগঠনেরও সেই দশা—এটা ভারতীয় ব্যবসায়াদের প্রতিনিধি-সংগঠন হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ভারতীয় শ্রমজাবীদের সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল খুব ক্ষীণ, আফ্রিকান জনতার সঙ্গে সংযোগ ছিলই না।

সরকার আইনের পর আইন বানাচ্ছিল। 'নেটিভস (আর্বান এরিয়াজ) অ্যামেণ্ডমেন্ট অ্যাক্ট (১৯৩০)' শহরাঞ্চলে আফ্রিকানদের যাতায়াত আরো খর্ব করল। ১৯৩১ সালে লোকগণনার সময় খরচা কমানোর অজুহাতে ইউরোপীয় ছাড়া কাউকে গণনা করা হল না। ১৯৩২ সালে 'নাটাল নেটিভ কোড' জারা হল, কোন আফ্রিকানকে পুলিস গ্রেপ্তার করলে তিন মাস পর্যন্ত তা নিয়ে কোন আদালত কিছু বলতে পারবে না। ১৯৩২ সালে 'নেটিভ সার্ভিস কণ্ট্রাক্ট অ্যাক্ট' বলল, শ্বেতাঙ্গ জমিদারদের জমিতে যেসব আফ্রিকান ভাগচাষী বা ক্ষেতমজুর কুঁড়েঘর বেঁধে বাস করে তারা যে মালিকের জন্য বৎসরে অন্ততঃ ৯০ দিন থেকে ১৮০ দিন খাটুনি খাটে তার প্রমাণ দিতে না পারলে উঠে যেতে হবে ; ১৯৩৫ সালে 'নেটিভস ট্রাস্ট অ্যাণ্ড ল্যাণ্ডস অ্যাক্ট' চাকরান-খাটুনীর পরিমাণ অন্যূন ১৮০দিন ধার্য করে দিল ; সেই সঙ্গে 'মাস্টার্স অ্যাণ্ড সার্ভেণ্টস অ্যাক্টে' নতুন ধারা যোগ হল, অবাধ্যতার অপরাধে ১৮ বছরের কমবয়সী আফ্রিকান বালক ভৃত্যকেও চাবুক মারা হবে, এবং কোন আফ্রিকান চাকরী বা গোলামার শর্ত ভঙ্গ করলে তার পরিবারও তার অপরাধের জন্য দায়ী হবে। আফ্রিকানদের বসবাসের জন্য জমি জোগাড় করে দেওয়ার কথা হল ; জমি অবশ্য জোগাড় হল নামমাত্র। দেড় কোটি একর জমি জোগাড় করার যেখানে কথা ছিল, সেখানে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত বিশ বছরে মাত্র ৫১ লক্ষ ৬ হাজার ৫০০ একরের মতো জমি

জোগাড় হয়েছিল[৩৫]—তা থেকেই জমি নিয়ে ছলনার একটা দিক বেশ ধরা পড়ে।

১৯৩৫ সালে ভোটার-তালিকা থেকে আফ্রিকানদের বাদ দেওয়ার পাকাপাকি ব্যবস্থার প্রস্তাব উঠলে এ-এন-সি'র নেতারা প্রতিবাদ জানাতে গেলেন কেপ্ টাউনে। সেখানে পাকেচক্রে পড়ে তাঁরা শ্বেতাঙ্গ 'উদারনীতিক'দের পীড়াপীড়িতে যে আইনে সায় দিয়ে এলেন, তাতে আফ্রিকান ভোটারদের পৃথক তালিকা করার ব্যবস্থা হল, এবং সেই ভোটারদের পরোক্ষ ভোটে চারজন শ্বেতাঙ্গ সিনেট-সদস্য এবং প্রত্যক্ষ ভোটে তিনজন শ্বেতাঙ্গ অ্যাসেম্বলী-সদস্য নির্বাচনের ব্যবস্থা রইল; এ ছাড়া সরকার-মনোনীত ও পরোক্ষভাবে নির্বাচিত আফ্রিকান সদস্যদের নিয়ে 'নেটিভস রিপ্রেজেণ্টেটিভ্ কাউন্সিল' নামে এক পরামর্শদাতা পরিষদ করা হল। 'নেটিভরাই এই প্রস্তাব দিয়েছে' ব'লে সোরগোল করে এই আইন ১৯৩৬ সালের ৬ই এপ্রিল ১৬৯-১১ ভোটে পাস হয়ে গেল, দুই-তৃতীয়াংশের অনেক বেশি সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে। এ নিয়ে প্রচুর ক্ষোভ প্রকাশ করেও 'ব্যাপারটা পরখ করে দেখা যাক' বলে আফ্রিকান নেতারা এই কাউন্সিলের নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করলেন। ডক্টর জন ডুবে, টমাস মাপিকেলা, সেলোপে থেমা প্রভৃতি নির্বাচিত হলেন। কাউন্সিলটা যে একেবারেই ক্ষমতাবিহীন এবং সরকার যে তার কোন পরামর্শ কান দিয়ে শোনেও না, তা অল্প পরেই বোঝা গেল। তবুও অনেক আফ্রিকান নেতা এই কাউন্সিলের পদমর্যাদার মোহ ছাড়তে পারেননি, ১৯৫০ সাল পর্যন্ত এই কাউন্সিলের সদস্যপদ রেখেছিলেন। ১৯৫১ সালে মালান সরকার কাউন্সিল তুলে দিয়ে এই পর্বের সমাধি দেয়।

মিশ্রবর্ণের মানুষদের ওপর হামলা শুরু হয়েছিল। এতদিন পর্যন্ত হার্ট্‌ৎসগ ও অন্যান্য শ্বেতাঙ্গ রাজনীতিকরা মিশ্রবর্ণের মানুষদের পিঠ চাপড়াতেন—ওরা তো প্রায় ইউরোপীয় হয়ে উঠেছে, একটু একটু করে ওদের শ্বেতাঙ্গ সমাজের সামিল করে নেওয়া হবে। ১৯৩৮ সালে

বিভিন্ন শহরে মিউনিসিপাল কর্তৃপক্ষ নিয়মজারী করে মিশ্রবর্ণ মানুষদের পৃথক এলাকা নির্দিষ্ট করে দেওয়া শুরু করল। 'কেবলমাত্র শ্বেতাঙ্গদের জন্য' চিহ্ন দেওয়া বাসে-ট্রামে, পার্কে-থিয়েটারে-পানশালায়-হোটেলে মিশ্রবর্ণদের প্রবেশ নিষেধ হতে থাকল। কেপ প্রদেশে মিশ্রবর্ণদের মধ্যে ত্রৎস্কীবাদীরা একটা সংগঠন গড়েছিলেন ; সেখান থেকে তাঁরা সমস্ত অ-শ্বেতাঙ্গদের একটা যৌথ মোর্চা গড়ার জন্য আলোড়ন শুরু করেন। ওদিকে মালানের পার্টি এবং অন্যান্য শ্বেতাঙ্গ পার্টির সভ্যসমর্থকরা অনেকে প্রকাশ্যে মিশ্রবর্ণ মানুষদের সম্পূর্ণ পৃথকীকরণের জন্য আলোড়ন করছিল। এইসব আলোড়নের মুখে স্মাট্‌স্ প্রস্তাব করলেন, মিশ্রবর্ণের মানুষরা যেখানে আছে এবং যেমন আছে থাকুক, কিন্তু নতুন কোন পাড়ায় তাদের আর বসবাস বিস্তার করতে দেওয়া হবে না, এবং রাজনৈতিক অধিকারও বাড়ানো হবে না। ইংরেজীতে একে বলে 'পেগিং' আইন—খুঁটি পুঁতে সীমানা বেঁধে দেওয়া। মিশ্রবর্ণের মানুষরা চাইছিল তাদের জন্যও সার্বজনীন ভোটাধিকার দিতে হবে। সেস্থলে এল 'পেগিং' এবং পৃথকীকরণের ব্যবস্থা।

১৯৩৯ সালের ২৮শে মার্চ কেপ্‌ টাউনে মিশ্রবর্ণের মানুষদের এক জমায়েত এসব ব্যবস্থার প্রতিবাদ জানাল। জমায়েতের পর মিছিল যখন পার্লামেণ্ট-প্রাসাদের পাশ দিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল, তখন পুলিস এসে তাদের পিটিয়ে ছত্রভঙ্গ করে দিল। সেই রাত্রে কেপ্‌ টাউন শহরে প্রচণ্ড হাঙ্গামা হল, মারপিট ভাঙচুর হল অনেক।[৩৬]

স্বাভাবিকভাবেই ভারতীয়দের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটছিল, এবং সাবেকী জায়গায় তাদের আর স্থান সঙ্কুলান হচ্ছিল না। তারা কেউ কেউ নতুন শহরে নতুন পাড়ায় বাড়িঘর বাঁধছিল, দোকান-পাট বসাচ্ছিল। তাই নিয়ে বর্ণবিদ্বেষী শ্বেতাঙ্গমহলে যেসব কথাবার্তা বলা হচ্ছিল তা শুনলে মরা মানুষেরও গায়ে জ্বালা ধরার কথা। ভারত থেকে বৃটিশ সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে ছিলেন সৈয়দ সার রেজা আলি।

শ্বেতাঙ্গ সরকারের ভাবগতিক দেখে তিনি সরকারকে বেশ স্থূলভাবেই ভয় দেখালেন, "অমন যদি করো তাহলে ভারতীয়েরা নন-ইউরোপীয়ান ফ্রন্টে যোগ দিয়ে আফ্রিকানদের সঙ্গে এক হয়ে দাঁড়াবে।[৩৭]

॥ নয় ॥

শ্বেতাঙ্গ শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়নগুলোকে 'শুদ্ধীকরণ' এবং দখল করার জন্য ব্রোয়েডেরবন্ড ১৯৩৯ সালে এক 'শ্বেতাঙ্গ শ্রমিক রক্ষা সমিতি' (Blankewerkersbeskermingsbond, সংক্ষেপে বি-ডবলিউ-বি-বি) গঠন করেছিল। ট্রেড ইউনিয়ন নিয়ে এদের বিশেষ মাথাব্যথার কারণ ছিল। ১৯৩৯ নাগাদ দক্ষিণ আফ্রিকাতে শাদা-কালো-বাদামী, রেজিস্টার্ড আর আন-রেজিস্টার্ড সবরকম ট্রেড ইউনিয়ন মিলিয়ে ট্রেড ইউনিয়ন সদস্যদের মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল, ২ লক্ষ ১৬ হাজার।[৩৮] এমিল সাখ্‌স্‌ 'গার্মেণ্ট ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন' নামে পোশাক-কারখানার শ্রমিক-কর্মচারীদের শক্তিশালী ঐক্যবদ্ধ ইউনিয়ন গড়েছিলেন। কমিউনিস্টরা ভারতীয় শ্রমিকদের মধ্যে কাজ শুরু করেছিলেন, এবং ১৯৩৭ সালে একটা শহরে লোহাকারখানায় আফ্রিকান ও ভারতীয় শ্রমিকরা ঐক্যবদ্ধ ধর্মঘট করেছিল।

বি-ডবলিউ-বি-বি যখন ট্রেড ইউনিয়ন দখল করতে ও ভাঙতে নামল, তখন স্বভাবতই তাদের প্রধান লক্ষ্য হলেন সাখ্‌স্‌। সাখ্‌সের ইউনিয়ন শক্ত ছিল, তাকে ভাঙা গেল না। সাখ্‌সের বিরুদ্ধে নানা কুৎসা প্রচার করতে গিয়ে এরা হেরে গেল ; সাখ্‌স্‌ প্রতিটি ক্ষেত্রে মামলা করে মানহানির ক্ষতিপূরণ ও মামলার খরচা বাবদে মোটা টাকা আদায় করেছিলেন।

কিন্তু সাখ্‌স্‌ একাই আক্রমণের লক্ষ্য ছিলেন না। শ্বেতাঙ্গ খনিশ্রমিকদের ইউনিয়নটাকে দখল করার জন্য বি-ডবলিউ-বি-বি সবরকম কৌশলই খাটাচ্ছিল। ১৯৩৯ সালের জুন মাসে এই

ইউনিয়নের সেক্রেটারী চার্লি হ্যারিসকে তাঁর ইউনিয়ন-অফিসের দোরগোড়ায় খুন করা হল। বি-ডবলিউ-বি-বি'র প্রচার শুনে উন্মত্ত এক বোয়ার যুবক নাকি হ্যারিসকে হত্যা করেছিল 'সাময়িক উত্তেজনাবশে'।[৩৯]

কিন্তু এই হত্যাকাণ্ড একটিমাত্র বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল না। ১৯৪১ সালে যখন 'আফ্রিকানের'-জাতীয়তাবাদীদের বিভিন্ন সংগঠনের মধ্যে কলহ-বিবাদ চলছিল, এবং ড্যানিয়েল মালান যখন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী নেতাদের এক এক করে হঠাচ্ছিলেন, তখন তিনিই 'ও-বি' সম্পর্কে পার্লামেণ্টে প্রকাশ্য অভিযোগ করেছিলেন যে এই সংগঠন গুপ্ত-চক্রান্ত, বিবিধ দুর্নীতি ও বিশ্বাসঘাতকতার আড্ডা, এবং এরা মাঝে মাঝে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডও করে থাকে।[৪০]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বছরগুলোয় নাৎসীবাদী 'ও-বি' ইত্যাদি সঙ্কুচিত হয়ে গেল। অপরদিকে আফ্রিকান মুক্তি-আন্দোলন নতুন শক্তির উপাদান পেল। কমিউনিস্ট পার্টিও পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠল। ভারতীয় কংগ্রেস সংগঠনে এবং এ-এন-সি সংগঠনে তরুণ বুদ্ধিজীবী বামপন্থীদের সমাবেশ ঘটতে থাকল। শ্রমিকদের মধ্যে নতুন চাঞ্চল্য ও তেজ সৃষ্টি হল।

নবম অধ্যায়

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, নব-জাগৃতি

। এক ॥

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গোড়ার দিকটায় বিভিন্ন দেশে, বিশেষতঃ পরাধীন দেশগুলোয়, মুক্তিসংগ্রামীদের মধ্যে একটা স্বাভাবিক বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়েছিল। যুদ্ধ বাধার কথা ছিল সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে জার্মানীর, এবং বৃটেন ফ্রান্স মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলোর জার্মানীর পক্ষে থাকার কথা। কিন্তু যুদ্ধ প্রথমে শুরু হল জার্মানীর সঙ্গে বৃটেন-ফ্রান্সের। যেসব দেশ বৃটেন ও ফ্রান্সের অধীন, সেসব দেশে স্বাধীনতা-সংগ্রামীরা স্বাভাবিকভাবেই বৃটিশ-ফরাসী যুদ্ধপ্রচেষ্টার বিরোধিতা করেন। 'আমার শত্রুর যে শত্রু, সে আমার মিত্র' এই সহজ হিসেব থেকে এঁরা কেউ কেউ হিটলার-অনুরাগী ও ফাসিস্ট-অনুরাগীও হয়ে উঠেছিলেন।

এরকম বিভ্রান্তির রসদ কমিউনিস্ট পার্টিগুলিও জোগাচ্ছিলেন। হিটলারের বিরুদ্ধে, নাৎসীবাদ ও ফাসিজমের বিরুদ্ধে তাঁরা একসময় অক্লান্ত প্রচার করেছিলেন; সেসময় বৃটিশ ও ফরাসী শাসকদের বিরুদ্ধে তাঁদের প্রচারের একটা প্রধান বিষয় ছিল—এরা হিটলার-তোষণ করছে, ফাসিজমকে প্রশ্রয় দিচ্ছে ও পরোক্ষ সমর্থন করছে। কিন্তু ১৯৩৯ সালের ২৩শে অগস্ট তারিখে জার্মানীর সঙ্গে সোভিয়েট রুশের অনাক্রমণচুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর কমিউনিস্ট পার্টিগুলির কথাবার্তা অন্যরকম হতে থাকল। যুদ্ধ যখন বাধল তখন কমিউনিস্ট পার্টিগুলি বৃটিশ-ফরাসী যুদ্ধপ্রচেষ্টার বিরোধিতা করতে থাকলেন; কোথাও কোথাও তাঁরা হিটলারের সপক্ষে ওকালতীও করতে থাকলেন। সোভিয়েট কূটনীতির একটা কৌশলকে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রতি নির্দেশ বলে গণ্য করার এই বিভ্রান্তি পরেও দেখা গেছে। যেসব ফাসিস্ট-বিরোধী মানুষ ইতিপূর্বে স্পেনের

গৃহযুদ্ধের সময় কমিউনিস্ট পার্টির খুব নিকটে এসেছিলেন, তাঁরা অনেকে এসময় বীতশ্রদ্ধ হয়ে কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেন।

১৯৪১ সালের ২২শে জুন হিটলার সোভিয়েট রাশিয়াকে আক্রমণ করার পর কমিউনিস্ট পার্টিগুলি ঘুরে দাঁড়াল। প্রথম দিকটায় কমিউনিস্টদের এই ঘুরে দাঁড়ানো অকস্মাৎ ডিগ্‌বাজীর মতো হয়েছিল, এবং অনেক জায়গায় শ্রদ্ধার পরিবর্তে অশ্রদ্ধার কারণ হয়েছিল। এই অশ্রদ্ধা কেটে গিয়ে আবার বিপুল অনুরাগ এসেছিল নাৎসী জার্মানীর বিরুদ্ধে সোভিয়েট লাল ফৌজের অতুলনীয় শৌর্য-বীর্যের অনুপ্রেরণায়, হিটলারের চরণ-শায়িত ইউরোপের দেশে দেশে কমিউনিস্টদের কঠিন প্রতিরোধ-সংগ্রামের উজ্জ্বল দৃষ্টান্তে, চীনে কমিউনিস্টদের অবিচলিত একাগ্র সংগ্রামের দৃষ্টান্তে।

দক্ষিণ আফ্রিকায় এই পরম্পরার ব্যতিক্রম হয়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথম দিকে মালানের 'ন্যাশনাল' পার্টি এবং নাৎসীবাদী সংগঠনগুলো যুদ্ধপ্রচেষ্টার বিরোধিতা করছিল, কমিউনিস্ট পার্টিও যুদ্ধপ্রচেষ্টার বিরোধী ছিল। আফ্রিকান জাতীয়তাবাদী মহলেও যুদ্ধ-প্রচেষ্টার বিরোধী এবং প্রায় ফাসিস্ট-অনুরাগী মনোভাব ছিল।

পক্ষাপক্ষ-নির্ণয়ের সমস্যা জটিল ও ভ্রান্তিজনক হলেও মহাযুদ্ধের অর্থনীতি এবং ফাসিস্ট-বিরোধী প্রচার দক্ষিণ আফ্রিকায় এক নব-জাগৃতির ভিত্তি গড়ছিল প্রায় সবার অগোচরে।

মহাযুদ্ধের অর্থনীতি অকস্মাৎ হাজার হাজার আফ্রিকান গ্রামবাসীকে শহরের শিল্পাঞ্চলে টেনে আনল। যুদ্ধের অস্ত্রশস্ত্র ও রসদ সরবরাহের প্রয়োজনে কল-কারখানা বাড়ল, শ্রমিকের চাহিদা বাড়ল। এ সময়ে শ্বেতাঙ্গ শ্রমিকরা আফ্রিকান শ্রমিকের সংখ্যাবৃদ্ধির বিরুদ্ধে আপত্তি তোলেনি।[১] বেকার-সমস্যা ছিল না, বেকার-সমস্যার আশঙ্কাও সামনে ছিল না, কাজেই শ্বেতাঙ্গ শ্রমিকের আপত্তিও মুলতুবী হয়ে গিয়েছিল। খনিতে আফ্রিকান শ্রমিকের সংখ্যা বিশেষ

বাড়েনি, কিন্তু অন্য কল-কারখানায় আফ্রিকান শ্রমিক-কর্মচারীর সংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকে। ১৯৩৯ সালে এদের মোট সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ২৬ হাজার; ১৯৪৯ সালে সংখ্যা দাঁড়ায় ২ লক্ষ ৯২ হাজার।[২] এমিল সাখ্‌স্‌ কয়েকটি বাছাই-করা শিল্পে নিযুক্ত বিভিন্ন জাতির শ্রমিকদের সংখ্যার যে তুলনামূলক হিসেব দিয়েছেন তাতে দেখা যায় ১৯৩৮-৩৯ সাল থেকে ১৯৪৩-৪৪ সালে আফ্রিকান শ্রমিক-কর্মচারীর সংখ্য শতকরা ৫০ ভাগ থেকে ১০০ ভাগ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল। ধাতুশিল্প, ইঞ্জিনীয়ারিং ও মেশিনারীশিল্পে সংখ্যাবৃদ্ধি হয়েছিল ৪১,০৪৮ থেকে ৬৪,৪৯৮, শতকরা ৫৭'১ ভাগ বৃদ্ধি; খাদ্য ও পানীয় শিল্পে ২০,০৭৮ থেকে ৩২,৪৫৩—শতকরা ৬১'৬ ভাগ বৃদ্ধি; মিশ্রবর্ণ শ্রমিকদের সংখ্যাও প্রায় এইরকম হারে বেড়েছিল।[৩]

যেসব আফ্রিকান যুদ্ধে গিয়েছিল তারা নতুন অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরেছিল। তারা শ্বেতাঙ্গ সৈন্যদের পালে পালে মরতে দেখেছিল, ভয়ে কাঁপতে দেখেছিল, ছুটে পালাতে দেখেছিল। লণ্ডন, প্যারিস, নেপলস্‌-এর রাস্তায় তারা শ্বেতাঙ্গ মেয়েদের বেশ্যাবৃত্তি করতে দেখেছিল, শ্বেতাঙ্গ কুলী-মজুর দেখেছিল।[৪] শ্বেতাঙ্গদের দেবতা মনে করার আর কোন কারণ এদের কাছে ছিল না। যুদ্ধের ধ্বংসকাণ্ড ও হত্যাকাণ্ড এদের মনের অনেক বাধানিষেধকেও ভেঙে দিয়েছিল, জঙ্গী মেজাজ তৈরী করেছিল।

ফাসিস্ট অত্যাচারের নিন্দা করা হচ্ছিল, হিটলার-মুসোলিনীর অপকর্মের বর্ণনা করা হচ্ছিল। সেই প্রচার দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেত-শাসনের বিরুদ্ধে নতুন উপাদান তৈরা করছিল, কারণ ওইসব অত্যাচার-অপকর্ম এঁরাও করছিলেন।

॥ দুই ॥

যুদ্ধের সময় আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসের নেতৃত্ব পরিবর্তন হয়েছিল। ১৯৪০ সালে সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন ডাক্তার

আলফ্রেড ক্ষুমা। ক্ষুমা বিপ্লববাদী ছিলেন না, মধ্যবিত্ত সংস্কারপন্থী নেতাই ছিলেন। কিন্তু এ সময়ে এ-এন-সি-তে যে কর্মচাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছিল, তার পেছনে ক্ষুমার দান ছিল। নতুন গতিবেগের জন্য সমস্ত কৃতিত্ব ক্ষুমার একলার নয় নিশ্চয়ই, এই গতিবেগের ক্ষেত্র তৈরী করেছিল বিশ্বযুদ্ধ এবং গতিবেগের অনেকটা নিয়ে এসেছিল নবজাগ্রত যুবশক্তি। কিন্তু ক্ষুমার কৃতিত্বও অবশ্যস্বীকার্য।

১৯৪৩ সালে ক্ষুমার প্রস্তাব অনুসারে এ-এন-সি'র ১৯১২ সালের পুরনো গঠনতন্ত্র বাতিল করে নতুন গঠনতন্ত্র রচিত হল। পুরনো গঠনতন্ত্রে বৃটিশ পার্লামেন্টের হাউস অব্ লর্ডস-এর অনুকরণে 'হাউস অব্ চীফ্‌স্' নামে গোষ্ঠীপ্রধানদের একটি কক্ষ ছিল; এই গোষ্ঠী-প্রধানরা সরকারের বেতনভোগী ছিলেন, কোন তেজী আন্দোলনের কর্মসূচীতে তাঁদের অধিকাংশের সমর্থন পাওয়ার আশা দুরাশামাত্র ছিল। নতুন গঠনতন্ত্রে এই 'হাউস অব চীফ্‌স্' বাদ দেওয়া হল। এক আধুনিক গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক পার্টির উপযোগী করে নতুন গঠনতন্ত্র রচনা করা হয়েছিল।[৫] এই গঠনতন্ত্র রচনায় ক্ষুমা এক তরুণ শ্বেতাঙ্গ কমিউনিস্ট ব্যারিস্টারের সাহায্য নিয়েছিলেন।[৬] এই ব্যারিস্টারটির নাম আব্রাহাম ফিশার, অরেঞ্জ প্রদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বোয়ার-নেতা আব্রাহাম ফিশার এঁর পিতামহ। পিতামহ ঘোর প্রতিক্রিয়াশীল ছিলেন, পৌত্রটি ঘোর কমিউনিস্ট। কৃষ্ণকায় জনতার কাছে কিছুদিনের মধ্যে এঁর আদরের ডাকনাম হয়ে উঠেছিল ব্র্যাম্। ১৯৬৪ সালে ব্র্যাম্‌কে গ্রেপ্তার করে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের অভিযোগে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়; ১৯৭৫ সালে ক্যান্সার মরণাপন্ন অবস্থায় তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয় মার্চ মাসে, মে মাসে তাঁর মৃত্যু হয়।

১৯৪১ সালে স্বর্ণখনি এলাকায় আফ্রিকান খনিশ্রমিকদের সংগঠন আফ্রিকান মাইন-ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন গঠিত হল। এ কাজটা সহজ কাজ ছিল না, যুদ্ধকালীন অবস্থা বলেই হয়তো সম্ভব হয়েছিল। এ

সময়ে আফ্রিকান শ্রমিকদের ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন দ্রুতবেগে বিস্তৃত হয়েছিল। বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে একজোট করে 'নন্‌-ইউরোপীয়ান ট্রেড ইউনিয়ন কাউন্সিল' নামে একটি কেন্দ্রীয় সংস্থাও গঠিত হয়। তখন দেড় লক্ষ সংগঠিত শ্রমিক এই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিল।[৭]

পরপর কয়েকটা ধর্মঘট হল। প্রধানমন্ত্রী স্মাট্‌স্‌ যুদ্ধকালীন বিশেষ আইন জারী করে ১৯৪২ সালে ঘোষণা করলেন, 'যেকোন অবস্থায় হোক, যেকোন কারণেই হোক, কোন আফ্রিকান শ্রমিক ধর্মঘট করলেই তা বে-আইনী হবে, এবং সেজন্য কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে।' ১৯৪৩ সালে আরেক আইন জারী হল—খনি-কোম্পানীর এলাকার মধ্যে বিনা অনুমতিতে কুড়িজনের বেশি লোক কোন বৈঠক বা সভা করতে পারবে না। এসব নানা নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও ১৯৪৪ সালের মধ্যে আফ্রিকান শ্রমিকরা প্রায় ৬০টি ধর্মঘট করেছিল।[৮]

১৯৪৩ সালের অগস্ট মাসে এক নতুন ঘটনা ঘটল। জোহানেসবার্গ শহর থেকে নয় মাইল দূরে আলেকজান্ড্রা নামে একটা জায়গা, সেখানে আফ্রিকান শ্রমিক-কর্মচারীদের বসতি। জোহানেসবার্গ শহরেই তাদের জীবিকা, কিন্তু তাদের শহরে থাকা নিষিদ্ধ। ওরা প্রতিদিন বাসে চেপে নয় মাইল পেরিয়ে এসে খাটুনা খাটত, আবার বাসে চেপে নয় মাইল পার হয়ে বাসায় ফিরত। অগস্ট মাসে বাস-কোম্পানী বাসের ভাড়া বাড়াল, ৪ পেনী থেকে ৫ পেনী করল। মোটে ১ পেনী ভাড়াবৃদ্ধি শুনতে সামান্য, এবং বাস-কোম্পানী যুদ্ধকালীন ব্যয়বৃদ্ধি ইত্যাদি অনেক সঙ্গত যুক্তি দেখাতে পারত। কিন্তু প্রতিদিন ২ পেনী করে যাদের খরচা বাড়ল, তাদের গড়পড়তা মাসিক উপার্জন ছিল ৫ পাউণ্ড ২ শিলিঙ ১১ পেনী, অর্থাৎ ১২৩৫ পেনী।[৯] সেসময়ে ওই অঞ্চলে শ্রমিকদের ঘরভাড়া দিতে হত মাসে ৪০৫ পেনী, সরকারী বার্ষিক ট্যাক্স বাবদে মাসে ২০ পেনী

রাখতে হত ; আর একটা পরিবারের খোরাকী বাবদে খরচা হবার কথা কম করেও প্রতি মাসে ১৮১২ পেনী, যা এরা জোগাতে পারত না।[১০]

আলেকজান্ড্রার বাসিন্দারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাসে চড়া বয়কট করল। নয়টা দিন ধরে ১৫০০০ নরনারী নয় মাইল রাস্তা হেঁটে কাজে গেল, খাটুনী-শেষে আবার নয় মাইল হেঁটে বাসায় ফিরল। তাদের পাশ দিয়ে ফাঁকা বাসগুলো বারবার ভেঁপু বাজিয়ে যাতায়াত করল, কেউ বাসে উঠল না। বাস-কোম্পানা নয়দিন পরে মাথা নীচু করল, ভাড়াবৃদ্ধি রদ হল। ১৯৪৪ সালে কোম্পানী আবার ভাড়া বাড়াল, মানুষগুলো আবার বাস বয়কট করে রোদ আর বৃষ্টির মধ্যে আঠারো মাইল হাঁটতে থাকল। সাত সপ্তাহ বয়কট চলার পর কোম্পানী আবার মাথা নীচু করল। আফ্রিকানদের আন্দোলনে জয়ের আস্বাদ এল। যত ছোটই হোক, যত তুচ্ছই হোক, আন্দোলনের পক্ষে এই জয়ের আস্বাদটুকু অত্যন্ত মূল্যবান।

জয়ের আস্বাদ আরেকদিক থেকেও এল। জোহানেসবার্গের চারপাশে আলেকজান্ড্রার মতো আরো অনেকগুলি আফ্রিকান বস্তি-শহর গড়ে উঠেছিল। যুদ্ধ-অর্থনীতি বহু মানুষকে কলকারখানায় ও শহরাঞ্চলে টেনে এনেছিল, তাদের ঠাঁই ছিল এইসব বস্তি-শহর। এসব বস্তিতে মানুষের দুর্দশার অন্ত ছিল না, মিউনিসিপালিটি এদের কিছুই দিত না, কিছুই দেখত না। চটের বা পেস্টবোর্ডের দেওয়াল, কেরোসিন-টিনের পাত দিয়ে ছাউনী, গুদামঘরের মতো এক একটা ঘরে ৫০।৬০ জন মানুষের গাদাগাদি, ২০।২৫টা ঘরের জন্য একটা জলের কল, কাঁচা নর্দমা, বিদ্যুৎ নেই, দুর্গন্ধ, ময়লা, নোংরা, অন্ধকার ; তারই মধ্যে মানুষের ভীড় ; আরো ভীড় বাড়ছিল।[১১] এই রকম এক বস্তি-শহর 'অর্লাণ্ডো'—হাজার হাজার মানুষের রাত-কাটানোর, উনুন-জ্বালানোর, বাচ্চা-জন্মানোর, রোগে-ধুঁকবার ঠাঁই।

১৯৪৪ সালের এপ্রিল মাসে এই নরকের আগল ভেঙে ১৫ হাজার মানুষ দল বেঁধে সুশৃঙ্খলভাবে বেরিয়ে এল, খানিকটা দূরে পাহাড়ের গায়ে মিউনিসিপালিটির ফেলে রাখা জমি দখল করে তার ওপর নিজেরাই কুঁড়েঘর বেঁধে বসল; তাদের আওয়াজ 'সফাসঙ্কে'— 'আমরা সবাই একসঙ্গে মরব।' তাদের নেতা জেম্‌স্ ম্‌পান্‌জা—কেউ কেউ তাঁকে আধ-পাগলা লোক-ক্ষেপানো বক্তৃতাবাজ বলে বর্ণনা করেছেন।[১২] জেম্‌সের নামই হয়ে গিয়েছিল 'জেম্‌স্ সফাসঙ্কে'। আধ-পাগলাই হোন আর যাই হোন, জেম্‌স্ সফাসঙ্কে সেদিন একটা রাস্তা দেখিয়েছিলেন।

কয়েকটা দিন গোটা অঞ্চলটা প্রায় রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করল— এবার কি হয়! জোহানেসবার্গ মিউনিসিপালিটি পুলিস পাঠাল— কুঁড়েঘরগুলো ভেঙে গুঁড়িয়ে মানুষগুলোকে তাড়াতে হবে। মেয়েরা দাঁড়াল সার বেঁধে, সবচেয়ে বেপরোয়া মরিয়া মা-বউ-বোনের দল; তাদের সঙ্গে দাঁড়াল পুরুষরা, ছেলে বুড়ো সবাই। তারপর চলল ইঁট আর পাথর। 'একসঙ্গে মরব' বলে যারা পণ করেছে, পুলিস তাদের হঠাতে পারল না। সন ১৯৪৪, তখনো যুদ্ধ চলছে—দক্ষিণ আফ্রিকার পুলিসবাহিনীর অনেক মানুষই তখন কালোমানুষ,— হয়তো সেই জন্যই বন্দুক-কামান, সাঁজোয়া গাড়ি, হেলিকপ্টার, এরোপ্লেন ছুটে এল না। মিউনিসিপালিটি মাথা নীচু করল, নতুন আফ্রিকান বসতিকে স্বীকার করে নিল। নতুন জায়গার নাম হল 'মোরোকা'।[১৩]

১৯৪৩-৪৪ সাল। আলেকজানড্রা। অর্লাণ্ডো। মোরোকা। জোহানেসবার্গ, প্রিটোরিয়া, কেপ্ টাউন, ব্লোয়েম্‌ফন্টেইন, ডারবান, পোর্ট এলিজাবেথ, ইস্ট লণ্ডন—শহর-বন্দরগুলোর চারপাশে বস্তিতে বস্তিতে হাজার হাজার অশান্ত পায়ের আওয়াজ।

অনেক দূরের বাতাসে বিশ্বযুদ্ধের কামানের আর বোমারু বিমানের

গর্জন। ১৯৪৩-এর ফেব্রুয়ারী, স্তালিনগ্রাদে জার্মান বাহিনীর আত্ম-সমর্পণ। ১৯৪৪-এর ফেব্রুয়ারী, আড়াই বৎসর দীর্ঘ জার্মান অবরোধের অবসানে লেনিনগ্রাদ শহরে মুক্তি-উৎসব। ১৯৪৪-এর জুন, ইটালীতে মার্কিন-বৃটিশ বাহিনীর রোম প্রবেশ। ১৯৪৪-এর অগস্ট, পোল্যাণ্ড, চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী, বুলগারিয়া, রুমানিয়া, যুগোশ্লাভিয়ায় বিজয়ী লালফৌজ এবং মুক্তিযোদ্ধাদের দৃপ্ত পায়ের আওয়াজ।

জোহানেসবার্গের ভারতীয় পাড়ায় একটি সাধারণ বাড়ির একটি সাধারণ ফ্ল্যাট-ঘরে কয়েকটি তরুণকণ্ঠে উত্তপ্ত বিতর্কের আওয়াজ। কখনো বা উচ্চ হাসির কলরোল। কখনো ক্রোধের নিরুদ্ধ গর্জন। কখনো নরম-গলায় বন্ধুর নাম ধরে ডাকা। ইসমাইল মীর-এর ফ্ল্যাটে জড়ো হয়েছে বন্ধুরা—জয়দেব নাজিব সিং, রুথ ফার্স্ট, জো স্লভো, নেলসন মাণ্ডেলা। কখনো একটু বয়স্ক কণ্ঠস্বর শোনা যায়—ডাক্তার ইউসুফ দাদু এসেছেন, বা গোভান ম্বেকি এসেছেন।

সোনার খনি এলাকায় রাতের অন্ধকারে কাঁটাতারের বেড়া ডিঙিয়ে শ্রমিক-কম্পাউণ্ডে মানুষ ঢুকছে। অন্ধকারে সে কথা বলছে ফিস্‌ফিস্ করে, শ্রোতাদের মুখ দেখছে না, শুধু মাঝে মাঝে চাঁদের আলোয় ঝিকমিক করে উঠছে খনি-শ্রমিকের মাথার হেলমেট, কখনো বা আলো ঠিকরে পড়ছে চোখের মণি থেকে। মাটির নীচে দু'মাইল গভীরে খাদের ভেতর ইলেকট্রিক ড্রিল-এর ঘর্ঘর আর গাঁইতির ভোঁতা আওয়াজের সঙ্গে, শ্রমিক-বুকের দম-ফেলার আওয়াজের সঙ্গে, চাপা কথার আওয়াজ। কয়েকটা নাম শোনা যাচ্ছে মাঝে মাঝে—জন মার্কস, মোজেস্ কোটানে, ব্র্যাম্ ফিশার, অ্যাণ্টন লেম্‌বেডে, ওআলটার সিস্থলু…।

॥ তিন ॥

১৯৪৩-৪৪ সালে জোহানেসবার্গে ইসমাইল মীর-এর ফ্ল্যাটে জড়ো হয়ে যাঁরা তর্কবিতর্ক করছিলেন,—বহু কাপ চা আর মাঝে মাঝে

ইণ্ডিয়ান রাইস-কারী এসেও যাঁদের আলোচনায় ছেদ ঘটাতে পারছিল না, তাঁরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়কার নবজাগ্রত তরুণ। এই আড্ডায় এক বিচিত্র সমাবেশ ঘটেছিল—ইসমাইল মীর ভারতীয় মুসলমান ঘরের ছেলে, তাঁর পরমবন্ধু জয়দেব নাজিব সিং ভারতীয় হিন্দু ঘরের ছেলে; জো স্লভো, রুথ ফার্স্ট লিথুয়ানিয়া-থেকে-চলে-আসা উদ্বাস্তু ইহুদী ঘরের ছেলেমেয়ে; নেলসন মাণ্ডেলা ট্রান্সকেই অঞ্চলের খোশা-ভাষী আফ্রিকান খ্রীস্টান ঘরের ছেলে, খোশা-জাতির তেমবু-শাখার গোষ্ঠীপ্রধানের বংশে তাঁর জন্ম, রাজবংশজাত বলা চলে। দক্ষিণ আফ্রিকার অগ্নিকটাহে নানা জাতি নানা ভাষা নানা সংস্কৃতির বিভিন্ন ধাতুগুলো গলে-মিশে যে নতুন ধাতু তৈরী হচ্ছিল, এঁরা সেই নতুন ধাতুর মানুষ। দক্ষিণ আফ্রিকা এঁদের স্বদেশ, সেই স্বদেশের মুক্তির উপায় এঁরা খুঁজছিলেন, তাই নিয়েই তর্কবিতর্ক। এ-এন-সি'র সংস্কারপন্থী নেতৃত্বের সমালোচনায় এঁরা মুখর, নূতন সংগ্রামী কার্যক্রম ও উপযুক্ত নেতৃত্ব চাই। কিভাবে সে নেতৃত্ব আসবে?[১৪]

এখানে দুটো ধারা মুখোমুখি দাঁড়িয়েছিল। এই দুটো ধারার মধ্যে বিরোধ থাকার কথা নয়, কিন্তু বিরোধ হচ্ছিল। ইসমাইল, রুথ, জো এঁরা কমিউনিস্ট; নেলসন আফ্রিকান জাতীয়তাবাদী। আফ্রিকান জাতীয়তাবাদীরা এসময়ে আফ্রিকান মুক্তি-আন্দোলনের সংগঠনের ভেতরে ভারতীয়দের বা শ্বেতাঙ্গদের প্রবেশের তীব্র বিরোধিতা করছিলেন, কমিউনিস্টদের 'বিদেশী-প্রভাবিত' 'জাতীয়তা-বাদ-বিরোধী' বলে সন্দেহ করছিলেন। কমিউনিস্টরাও আফ্রিকান জাতীয়তাবাদীদের সঙ্কীর্ণ বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী বলে সন্দেহ করতেন, মুক্তি-আন্দোলনকে সঠিক পথে রাখার জন্য নিজেরাই নেতৃত্ব দখল করার উদ্দেশ্যে কৌশল খাটাতেন, মাঝে মাঝে অপকৌশলেরও আশ্রয় নিতেন। বিবাদ-সংঘর্ষ হত, যদিও শাসকশ্রেণীর দমন-পীড়নের ফলে বিবাদ-সংঘর্ষের ক্ষেত্র সঙ্কুচিত হয়ে সংগ্রামী ঐক্যের ক্ষেত্রই প্রশস্ত হচ্ছিল।

এসময়ে আফ্রিকান জাতীয়তাবাদের প্রধান তেজী প্রবক্তা ছিলেন অ্যান্টন লেম্‌বেডে। দীর্ঘকায় কর্কশ-দর্শন আবেগচঞ্চল এই জুলু তরুণ এসেছিলেন ক্ষেতমজুরের ঘর থেকে। অনেক কষ্টে লেখাপড়া শিখে ১৯৪৩ সালে ৩০ বছর বয়সে ইনি জোহানেসবার্গে এসে আইন ব্যবসার শিক্ষানবিশী করছিলেন পিকসলি সেমে'র অফিসে। তাঁরই মতো শিক্ষানবিশ ছিলেন অলিভার তাম্‌বো, ট্রান্সকেইয়ের পণ্ডো এলাকার কৃষকঘরের ছেলে ; তাম্‌বোকে আইনব্যবসায়ে শিক্ষানবিশীর যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছিলেন ওআলটার সিস্‌লু। অ্যান্টন, অলিভার, ওআলটার একসূত্রে বাঁধা হয়েছিলেন এ-এন-সি'র যুবলীগের মধ্যে।

তখনকার যুবমানসের পশ্চাৎপট বোঝার পক্ষে ওআলটার সিস্‌লু'র পশ্চাৎপট একটা উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। ট্রান্সকেই অঞ্চলে অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন চাষীর ঘরে ওআলটারের জন্ম হয়েছিল ১৯১২ সালে। প্রায় জন্ম থেকেই বিদ্রোহী বালক শ্বেতাঙ্গ দেখলে যথোচিত নতমস্তকে নম্রকণ্ঠে কথা বলত না, দুর্বিনীত অবাধ্য ব'লে গুরুজনদের বকুনী খেত। ষোল বছর বয়সে তার অভিভাবক কাকা মারা গেলেন। ওআলটার গ্রাম ছেড়ে জোহানেসবার্গের খনিতে কাজ খুঁজতে গেল। প্রথম যাত্রায় কাজ জুটল না, ফিরে আসতে হল ; কিন্তু রেলগাড়ি, বিদ্যুতের আলো, জলের কল, শ্বেতাঙ্গদের প্রাসাদতুল্য ঘরবাড়ি-অফিস, খনি-এলাকার বিশাল যন্ত্রপাতি,—এসব দেখা হল, মানুষটা খানিক বদলে গেল। দ্বিতীয়বারের চেষ্টায় খনিতে কাজ জুটল। চার মাস কম্পাউণ্ডে বাস, এক মাইল গভীরে খাদে নেমে পাথর কাটা, শ্বেতাঙ্গ 'বস্' এবং তার কৃষ্ণাঙ্গ অনুচর 'বস্-বয়'-এর অত্যাচার, কম্পাউণ্ড-ম্যানেজারের বর্বর জুলুম—সবই অভিজ্ঞতার ঘরে জমা হল। ঘৃণা, ক্রোধ, হতাশা এবং নির্বাক আকুতির প্রচণ্ড যন্ত্রণা নিয়ে ওআলটার গ্রামে ফিরল। কিন্তু গ্রামে মন টেকে না, জীবিকাও অপ্রতুল। আবার জীবিকা ও জীবনের পথসন্ধান। এবার ইস্ট লণ্ডনে, রন্ধনশালার ভৃত্যের চাকরী।

তখন ইস্ট লণ্ডনে ক্লিমেন্স কাডালির আই-সি-ইউ-এর জমজমাট আসর। ওআলটার কাডালির বক্তৃতা শুনে অভিভূত হয়ে পড়ে, কিন্তু ঠিক যেন পথ পায় না, তাকে যে নিজে কিছু করতে হবে সে কথাটা সামনে আসে না। তখন মন্দা চলছে, মজুর ছাঁটাই হচ্ছে। ওআলটার রান্নাঘরের কাজ ছেড়ে কারখানার কাজ খুঁজতে গিয়ে শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের ব্যঙ্গ শুনল—'আমাদের কাছে কেন হে বাপু? কাডালির কাছে যাও, কাডালি কাজ দেবে।'

ইস্ট লণ্ডন থেকে আবার জোহানেসবার্গ। ওআলটারের মা এখানে শ্বেতাঙ্গ পরিবারের জামাকাপড় কেচে দিন চালাচ্ছিলেন। ওআলটার শেষ পর্যন্ত এক রুটি-কারখানায় কাজ পেলেন। ওই কারখানাতেই এক বৃদ্ধ শ্রমিকের কাছে ওআলটার ট্রেড ইউনিয়ন ব্যাপারটা কি তা শুনলেন। প্রায় তৎক্ষণাৎই রুটি-কারখানার মজুরদের জড়ো করে মজুরীবৃদ্ধির দাবীতে ওআলটার এক ধর্মঘট বাধিয়ে দিলেন। মজুরদের প্রত্যেককে মালিক আলাদা করে ডেকে কথাবার্তা বলে ধর্মঘট ভেঙে কাজে পাঠিয়ে দিল। শুধু ওআলটারের চাকরী গেল। এই হল তাঁর প্রথম রাজনৈতিক শিক্ষা।

তারপর চাকরী খোঁজা। জুতোর কারখানায়, রঙের কারখানায়, তামাক কারখানায়। কিছুদিন কাজ, তারপর শ্বেতাঙ্গ মালিকের সঙ্গে বা ম্যানেজারের সঙ্গে কথা-কাটাকাটি, তারপর বরখাস্ত বা ইস্তফা। এর ফাঁকে ফাঁকে দু'একটা প্রবন্ধ লেখা; 'বান্টু ওয়ার্লড' পত্রিকায় সে প্রবন্ধ ছাপা হয়েছিল। একটা ব্যবসার চেষ্টা। বছর-দুইয়ের মধ্যে দেনার দায়ে ব্যবসা উঠে গেল।

যখন যুদ্ধ বাধল, ওআলটার যুদ্ধবিরোধী প্রচারক—আফ্রিকানদের সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেওয়ার বিরুদ্ধে প্রচার করছিলেন। জাপানীরা যখন জিতছিল, শাদা-চামড়ার দর্পচূর্ণ দেখে ওআলটার উল্লসিত। ইতিমধ্যে ১৯৪০ সালে এ-এন-সি'র সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ঘটেছিল।

১৯৪৪ সালে এ-এন-সি'র যুবলীগ প্রতিষ্ঠিত হল—অ্যান্টন

লেমবেডে প্রেসিডেন্ট, অলিভার তামবো সেক্রেটারী, ওআলটার সিসুলু ট্রেজারার। এঁরা আরো অনেক যুবককে টেনে আনলেন। ওআলটার যাঁদের আনলেন, তাঁদের মধ্যে একজন নেলসন মাণ্ডেলা।

১৯৪১ সালে নেলসন তেইশ বছর বয়সে কলেজ থেকে বিতাড়িত হয়ে, এবং বাড়ি থেকে পালিয়ে জোহানেসবার্গে এসে কাজ খুঁজছিলেন। ওআলটার নেলসনকে এক আইনব্যবসায়ী ফার্মে কেরানীর কাজ জোগাড় করে দিলেন। করেসপণ্ডেন্স কোর্সে পড়াশুনা করে নেলসন ১৯৪২ সালে একটা বি. এ. ডিগ্রী অর্জন করলেন, তারপর ভিট্‌ভাটার্সরান্‌ড বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন পড়তে ঢুকলেন। ১৯৪৪ সালে যখন তিনি এ-এন-সি'তে যোগ দিলেন, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রমহলে তিনি বেশ পরিচিত। দীর্ঘ সুদর্শন আকৃতি, পরিপাটি ফ্যাশন-দুরস্ত ইউরোপীয় পোশাকে সজ্জিত, হাস্যকৌতুকে উজ্জ্বল, ক্রীড়াদক্ষ, মুষ্টিযোদ্ধা, তেজীস্বভাব নেলসন সবারই দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। কিন্তু সেসময় অনেকেই তাঁকে হাল্কা প্রকৃতির ফুর্তিবাজ ছোকরা বলে মনে করত।

যুবলীগের সদস্যরা চাইছিলেন সংগ্রামী কার্যসূচী, হরতাল-ধর্মঘট প্রভৃতি ব্যাপক গণবিক্ষোভের পরিকল্পনা ও সংগঠন। সেইসঙ্গে তাঁদের কথা ছিল, আফ্রিকানদের নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে, শ্বেতাঙ্গ বা ভারতীয় পরামর্শদাতার প্রভাব বর্জন করতে হবে। আফ্রিকান জাতির বৈশিষ্ট্য, আফ্রিকান সংস্কৃতি ও মানসিকতা—এগুলোর ওপর এঁরা খুব জোর দিতেন। মার্কসবাদ এবং কমিউনিজমের তত্ত্ব আফ্রিকায় অবান্তর বলে তাঁরা মনে করতেন; শ্রেণীসংগ্রামের কথাটা আফ্রিকায় খাটে না বলে তাঁদের মনে হত—শ্বেতাঙ্গ শ্রমিকের বর্ণবিদ্বেষী সঙ্কীর্ণতা দেখে শ্রমিকশ্রেণীর ভূমিকা সম্বন্ধে তাঁদের প্রত্যয় হয়েছিল অন্যরকম। এঁদের চিন্তা অবশ্য এখানেই থেমে থাকেনি, আফ্রিকান মুক্তিআন্দোলনের ধাপে ধাপে এঁদের চিন্তা স্বচ্ছ ও বলিষ্ঠ

হচ্ছিল, শক্তিবৃদ্ধি ও আত্মবিশ্বাস-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে স্পর্শকাতরতা কাটছিল।

॥ চার ॥

১৯৪৩-৪৪ সালে কমিউনিস্ট পার্টিরও পুনরুজ্জীবন ঘটছিল। আফ্রিকান কমিউনিস্ট নেতা মোজেস কোটানে, জন মার্কস্, ভারতীয় কমিউনিস্ট নেতা ইউসুফ দাদু প্রভৃতি নতুন শক্তির সন্ধান এনে দিয়েছিলেন। মোজেস কোটানে'র পশ্চাৎপটও একটা উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত।

মোজেস এর জন্ম হয়েছিল ১৯০৫ সালে। মা-বাবা ছিলেন ট্রান্সভালের ৎসোআনা-ভাষী খ্রীস্টান। ছেলেবেলায় গরুমহিষের রাখালগিরি করে আর মাঝে মাঝে খুচরো মজুরের কাজ করে বছর-পনেরো বয়সে মোজেস বাইবেল-স্কুলে লেখাপড়া শিখতে গেলেন। দু'বছর পরেই জীবিকার সন্ধানে যেতে হল। অনেক রকম টুকরো-টাকরা কাজ করার পর এক রুটি-কারখানায় কাজ জুটল,—এরই ফাঁকে ফাঁকে একটু একটু করে লেখাপড়া শেখা। ১৯২৭ সালে এ-এন-সি'তে যোগ দিয়ে মোজেসের মন অতৃপ্তিতে ভরে গেল। তিনি দেখলেন এ সংগঠনে তাঁর মতো লোকের একমাত্র কাজ সভায় গিয়ে ভীড় বাড়ানো আর প্রস্তাবের পক্ষে হাত তোলা। এ-এন-সি তাঁদের মতো মানুষকে কিছু শেখাত না। মোজেসের এটা বড় অভিযোগ। রুটি-কারখানার শ্রমিক ইউনিয়নে যোগ দিয়ে মোজেস কমিউনিস্ট পার্টির সংস্রবে এলেন। কমিউনিস্ট পার্টির সাংগঠনিক কৌশল তাঁর ভালো লাগেনি; একদিন একটা শাখা-কমিটির সাধারণ সভায় গিয়ে তিনি অকস্মাৎ শুনলেন তাঁকে পার্টির সদস্য করে নেওয়া হচ্ছে। এ ব্যাপারটা তাঁর কাছে খুব অসৎ বলে মনে হয়েছিল।[১৫] কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টি তখন বয়স্ক আফ্রিকানদের জন্য যে অবৈতনিক নৈশ-বিদ্যালয় চালাত, সেটা ভালো ছিল। মোজেস এখানে লেখাপড়ার

সুযোগ পেলেন, আরো দশটা বিষয়ে জানবার-বুঝবার সুযোগ পেলেন। এতে তিনি তৃপ্তি পেয়েছিলেন। পার্টির উদ্দেশ্য ভাল বুঝে তিনি পার্টিতে রইলেন।

এরপর কয়েকটা বছর কাটল ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন ক'রে, নৈশ-বিদ্যালয়ে মাস্টারী ক'রে, পার্টির অন্যান্য কাজ ক'রে। 'ইনকুলুলেকো' (স্বাধীনতা) নামে কমিউনিস্ট পার্টির একটা পত্রিকা ছিল, মোজেস তার ছাপাখানায় কম্পোজিটরের কাজ করলেন কিছুদিন, আফ্রিকান ভাষার অংশটুকু সম্পাদনাও করলেন।

১৯৩১ সালে কমিউনিস্ট পার্টি তাঁকে মস্কো পাঠিয়ে দিল। সেখানে দু'বছর ধরে পড়াশুনা করে ও রাজনৈতিক শিক্ষা নিয়ে ১৯৩৩ সালে দেশে ফিরে মোজেস দেখলেন পার্টি তছনছ হয়ে যাচ্ছে। ডাগলাস্ ওল্‌টন এবং লাজার বাখ্ তখন পার্টি থেকে দক্ষিণপন্থী বিতাড়ন চালাচ্ছেন। সিড্‌নী বান্টিংকে মোজেস শ্রদ্ধা করতেন, তাঁকে পার্টি থেকে বহিষ্কার করা মোজেস সমর্থন করতে পারেননি। লাজার বাখ্ অবিসংবাদিত পার্টি-কর্তৃত্ব চালাতে গিয়ে ট্রেড ইউনিয়নগুলোকেও শেষ করে এনেছিলেন। বাখ্ একটা শস্তা 'কৌশল' শেখাচ্ছিলেন; খনি-শ্রমিকদের সভায় হয়তো মোটে পাঁচজন শ্রমিক হাজির ছিল, বাখ্ পার্টি-সদস্যদের নির্দেশ দিলেন যে বলতে হবে একশো শ্রমিক ইউনিয়নে যোগ দিয়েছে। মোজেস সে সময়ে পার্টির জোহানেস-বার্গ কমিটির সম্পাদক; তিনি এই হীন 'কৌশল'-এর ও মিথ্যা ভাষণের প্রতিবাদ করলেন। লাজার বাখ্ তৎক্ষণাৎ মোজেসকে "দক্ষিণপন্থী সোসাল-ডেমোক্রাটিক বিচ্যুতি আনয়নকারী" বলে নিন্দাবাদ শুরু করলেন। মোজেস পার্টি ছাড়তে চাননি, ঝগড়া এড়াবার জন্য জোহানেসবার্গ ছেড়ে কেপ্ টাউনে চলে গেলেন।[১৬]

১৯৪০-এর দশকে মোজেস কোটানে ও জন মার্কস্ এ-এন-সি'র মধ্যেই কাজকর্ম করছিলেন। জন মার্কস্ খনি-শ্রমিকদের সংগঠন গড়ছিলেন ট্রান্সভাল প্রাদেশিক এ-এন-সি'র কাজকর্মের অঙ্গ

হিসেবেই। কমিউনিস্ট পার্টি এ সময়ে দলীয় সঙ্কার্ণতা ছেড়ে ধৈর্য ও অধ্যবসায় নিয়ে পরিশ্রম করছিল। কর্মদক্ষতা, রাজনৈতিক জ্ঞান ও আদর্শবোধের দ্বারা কমিউনিস্টরা বহু মানুষের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিলেন, নেতৃত্বকামী কিছু লোকের ঈর্ষাও কুড়িয়েছিলেন।

ভারতীয় যুবকদের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টি এসময়ে অনেক সদস্য ও সমর্থক পেয়েছিল। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চিকিৎসাবিদ্যায় পারদর্শী হয়ে ডাক্তার ইউসুফ দাদু জোহানেসবার্গে ফিরেছিলেন; ট্রান্সভাল ভারতীয় কংগ্রেসে তাঁর প্রভাব বাড়ছিল। ইসমাইল মীর তাঁর ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন। ভারতীয় কংগ্রেসের মধ্যে এ সময় একটা সুস্পষ্ট বামপন্থী ধারা গড়ে উঠছিল। ব্যবসায়ী-মহলের গণ্ডী কেটে এবং পুরনো নেতৃত্বের নিষ্ক্রিয়তা ভেঙে ভারতীয় কংগ্রেসে বাম-পন্থী ছাত্র, যুবক ও শ্রমিকদের সংখ্যা বাড়তে থাকে।

নাটাল প্রদেশে ভারতীয় কংগ্রেসের নেতা ডাক্তার গঙ্গাধর নাইকার গান্ধীবাদী বলে পরিচিত ছিলেন। কিন্তু তিনি তেজী গণ-আন্দোলনের পক্ষে ছিলেন, সঙ্কীর্ণ শুচিবায়ুগ্রস্ততার বিরুদ্ধে ছিলেন, এবং আফ্রিকানদের সঙ্গে যৌথ আন্দোলনের পক্ষে ছিলেন। দাদু-নাইকার নেতৃত্ব ১৯৪০'এর দশকে ভারতীয় কংগ্রেস সংগঠনের ইতিহাসে নতুন গৌরবজনক অধ্যায় রচনা করেছিল।

শ্বেতাঙ্গদের মধ্যেও একটা ক্ষুদ্র অংশে নতুন চেতনার সঞ্চার দেখা গিয়েছিল। বিশ্বযুদ্ধের শেষের দিকে যুদ্ধ-প্রত্যাগত শ্বেতাঙ্গ সৈনিকদের একটি সংগঠন গড়ে উঠেছিল 'স্প্রিংবক লিজ্যন' (Springbok Legion) নামে। এরা গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য যৌথ আন্দোলনের নীতি গ্রহণ করেছিল। 'ব্রোয়েডেরবন্ড্' বা অন্যান্য নাৎসীবাদী শ্বেতাঙ্গ সংগঠনগুলোর সঙ্গে এদের একাধিক মারামারি-সংঘর্ষ হয়েছিল।[১৭]

।। পাঁচ ।।

১৯৪৫ সাল। ১লা মে সন্ধ্যা ৬টায় সোভিয়েট লাল ফৌজ হিটলারের শেষ দুর্গ বার্লিন শহরের ওপর অভিযান শুরু করল, ৩রা মে ভোর ৬টায় বার্লিনে জার্মান প্রতিরোধ শেষ হল। ব্রহ্মদেশ থেকে জাপানী বাহিনী পশ্চাদপসরণ করছিল, ২রা মে তারিখে বৃটিশ বাহিনী রেঙ্গুন শহর পুনরধিকার করল। ওদিকে প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানী নৌবহর প্রায় সবই ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল, মার্কিন বাহিনী ফিলিপাইন্‌স্‌ পুনরধিকার করে খাস জাপানের ওপর আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল।

৭ই মে জার্মানী মিত্রশক্তির কাছে বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করল। ৬ই অগস্ট জাপানের হিরোশিমা শহরের ওপর প্রথম আণবিক বোমা বর্ষণ হল। ৮ই অগস্ট সোভিয়েট ইউনিয়ন মিত্রশক্তির চুক্তি অনুসারে জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে মাঞ্চুরিয়া অভিমুখে দ্রুত অভিযান শুরু করল। ৮ই অগস্ট জাপানের নাগাসাকি শহরের ওপর আরেক আণবিক বোমা ফেলা হল। দুই দিনে দুটি শহরে চার লক্ষ নরনারী ভস্মসাৎ হল।

১৫ই অগস্ট মিত্রশক্তির নিকট জাপানের বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ স্বাক্ষরিত হল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হল কিন্তু আরো বৃহত্তর যুদ্ধের প্রস্তুতির আবহাওয়ার মধ্যে। ৭ই মে জার্মানী আত্মসমর্পণ করার পর ১০ই মে থেকে ১৪ই মে পর্যন্ত বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল যেসব টেলিগ্রাম ও নির্দেশ পাঠাচ্ছিলেন সেগুলোতে রাশিয়ার বিরুদ্ধে সংঘর্ষের পূর্বপ্রস্তুতির আবহাওয়া সুস্পষ্ট। চার্চিল তাঁর দুর্ভাবনা ও আয়োজনের কথা জেনারেল স্মাট্‌স্‌কে জানিয়ে রাখছিলেন, স্মাট্‌স্‌ তাঁর সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত ছিলেন।[১৮]

ভিয়েৎনামে নতুন যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। ১৫ই অগস্ট জাপান আত্মসমর্পণ করার পর ১৯শে অগস্ট তারিখে হো-চি-

মিনের নেতৃত্বে ভিয়েৎনামী মুক্তি-যোদ্ধারা হানয় শহর দখল করল, ২রা সেপ্টেম্বর স্বাধীন ভিয়েৎনাম সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হল। ১২ই সেপ্টেম্বর বৃটিশ সৈন্যবাহিনী এসে সায়গনে নামল। ২৩শে সেপ্টেম্বর বৃটিশ বাহিনী অকস্মাৎ স্বাধীন ভিয়েৎনাম সরকারের লোকজনকে গ্রেপ্তার ক'রে, অনেক মানুষ মেরে, রক্তের বন্যা বইয়ে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদী সরকারকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করল। ভিয়েৎনাম মুক্তিযুদ্ধের সুদীর্ঘ ইতিহাস আবার শুরু হল।

ছয় ॥

১৯৪৬ সাল। ভারতবর্ষে বৃটিশ সরকার কর্তৃক ক্ষমতা হস্তান্তরের তুমুল জল্পনা-কল্পনা চলছে। জেনারেল স্মাট্‌স্ যুদ্ধোত্তর দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রথম আঘাত হানলেন ভারতীয়দের ওপর। যুদ্ধের সময় ১৯৪৩ সালে ট্রান্সভালে ও নাটালে শ্বেতাঙ্গমহলে রব উঠেছিল যে ভারতীয় ব্যবসাদাররা শ্বেতাঙ্গ পাড়ায় অনেক জমিজমা কিনে নিচ্ছে এবং দোকানপাট বাড়িয়ে অনেক ব্যবসা কব্জা করে ফেলছে। এক তদন্ত-কমিশন বসানো হয়েছিল। কমিশন রিপোর্ট দিয়েছিল, ব্যাপারটা গুরুতর কিছু নয়, কয়েকজন মাত্র ভারতীয় শ্বেতাঙ্গ পাড়ায় জমিজমা কিনেছে। স্মাট্‌স্ তখন এক আইন জারী করেছিলেন, 'ট্রেডিং অ্যাণ্ড অকুপেশন অব ল্যাণ্ড (ট্রান্সভাল অ্যাণ্ড নাটাল) অ্যাক্ট।' আইনে বলা হল, আগামী তিন বৎসর ভারতীয়রা ট্রান্সভালে আর কোন নতুন দোকানপাট বসাতে পারবে না, এবং নাটালে আর কোন জমিজমা কিনতে পারবে না। এ আইন 'পেগিং অ্যাক্ট' বলে পরিচিত, স্থিতা-বস্থার চতুর্দিকে খুঁটি গেড়ে আটকানোর আইন। আইনটা তিন বছরের জন্য, সম্ভবতঃ সেই জন্যই ভারতীয়রা তখন বেশি আন্দোলন করেননি; তাছাড়া যুদ্ধ চলছিল, এবং মাস-তিনেক পরে সাধারণ নির্বাচন, সেসব কারণেও বিষয়টা চাপা পড়ে ছিল।

১৯৪৬ সালে স্মাট্‌স্ 'পেগিং অ্যাক্ট'-এর জায়গায় নতুন আইনের

প্রস্তাব নিয়ে এলেন—'এশিয়াটিক ল্যাণ্ড টেনিওর অ্যাণ্ড ইণ্ডিয়ান রিপ্রেজেন্টেশন বিল্'। আইনের প্রথমভাগে ট্রান্সভালে ভারতীয়দের অবস্থা যথাপূর্বং তথাপরং রাখা হল, নাটালের একটি নির্দিষ্ট এলাকা ছাড়া অন্য কোন এলাকায় মন্ত্রীর অনুমতি ছাড়া ভারতীয়দের কাছে জমি বিক্রী নিষিদ্ধ হল। আইনের দ্বিতীয়ভাগে ভারতীয়দের সান্ত্বনা স্বরূপ বলা হল, অতঃপর নাটাল-ট্রান্সভালের ভারতীয়দের প্রতিনিধি হিসাবে একজনকে সরকার সিনেট-সদস্য মনোনীত করবেন, এবং ভারতীয়দের পৃথক ভোটার-তালিকা অনুসারে ভোট দিয়ে ভারতীয়রা আরেকজনকে নির্বাচনও করতে পারবে ; তাছাড়া ওই পৃথক ভোটার-তালিকা অনুসারে ভোট দিয়ে ভারতীয়রা তিনজন পার্লামেণ্টের অ্যাসেম্বলী-সদস্য নির্বাচিত করতে পারবে, অবশ্য সেই তিনজন শ্বেতাঙ্গ হওয়া চাই ; আর, নাটালের ভারতীয়রা প্রাদেশিক আইনসভায় দুইজন সদস্য নির্বাচন করতে পারবে, তারা ভারতীয়ও হতে পারে।[১৯]

এই তথাকথিত ভোটাধিকারের চিনির মোড়ক জড়িয়ে বর্ণ বৈষম্য ও জাতিবৈষম্যের বিষবড়ি গেলানোর অপচেষ্টায় ভারতীয়দের আপত্তি হওয়া স্বাভাবিক। ১৯৪৩-এর আইনে তিন বৎসরের জন্য সাময়িক নিবারণ ছিল, ১৯৪৬-এর আইন স্থায়ী ব্যবস্থা। এই আইনের বিরুদ্ধে প্রবল বাধা না দিলে দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়রা চিরকালের মতো হীন শ্রেণীর বাসিন্দা বলে চিহ্নিত হয়। এরিক ওয়াকারের মতো ইতিহাস-লেখকও এ কথাটা খেয়াল করেননি—ভারতীয়দের প্রতিবাদ তাঁর কাছে মনে হয়েছে অকারণে উগ্র ; ভারতীয়দের যা-হোক একরকম ভোটাধিকার দেওয়া হচ্ছিল, এটাই ওয়াকারের বিবেচনায় আগের চেয়ে উন্নতি মনে হয়েছে। ওয়াকার ভারতীয় কংগ্রেসের প্রতিবাদের উৎস খুঁজেছেন কমিউনিস্ট ও বামপন্থীদের চাপ-এর মধ্যে। ওয়াকার লিখেছেন, নাটাল ইণ্ডিয়ান কংগ্রেসের একসিকিউটিভ কাউন্সিলে এ সময় ৪৬ জন বামপন্থী সদস্য ছিল এবং তার মধ্যে ১২ জন কমিউনিস্ট ; এদেরই চাপে বাধ্য হয়ে নাটাল

ইণ্ডিয়ান কংগ্রেসের সভাপতি (ডাঃ নাইকার) ট্রান্সভাল ইণ্ডিয়ান কংগ্রেসের 'র‍্যাডিক্যাল' নেতা ডাঃ ইউস্থফ দাত্বর সঙ্গে একত্রে স্মাট্‌সের প্রস্তাবকে 'মেকী ভোটাধিকারের ধাপ্পাবাজ প্রস্তাব' বলে আক্রমণ করেছিলেন।[২০]

মূল প্রশ্নটা জমি কেনার অধিকার নিয়ে ছিল না, ভারতীয়দের মধ্যে নতুন জমি কেনার সামর্থ্য বেশি লোকের ছিল না। মূল লড়াইটা ছিল নীতিগত, বর্ণবৈষম্য-জাতিবৈষম্যমূলক আইনের বিরুদ্ধে সমানাধিকারের গণতান্ত্রিক নীতির লড়াই। ওয়াকার একথাটাকে গুরুত্ব দেননি।

১৯৪৬ সালের জুন মাসে বিশ্বরাষ্ট্রসংঘের অধিবেশনে ভারত সরকারের প্রতিনিধি শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত এবং সোভিয়েট সরকারের প্রতিনিধি আন্দ্রেই ভিশিন্‌স্কি এই আইনের প্রশ্ন তুলে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারকে তীব্র আক্রমণ করেন। স্মাট্‌স্ মর্মাহত হয়েছিলেন। বিশ্বরাষ্ট্রসংঘের মানবিক অধিকার সনদের তিনি অন্যতম প্রধান রচয়িতা। তাঁর আশা ছিল, বিশ্বরাষ্ট্রসংঘের অধিবেশনে তাঁর একটা বিশেষ সম্মানের আসন থাকবে--তার পরিবর্তে তাঁকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে ওই সনদেরই মাপকাঠি দিয়ে তাঁর বিচার হচ্ছিল। শ্রীমতী পণ্ডিত দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণবৈষম্য ও জাতি-বৈষম্যের কথা তুলে অভিযোগ করায় স্মাট্‌স্ জবাবে বলেছিলেন—"একজন ব্রাহ্মণের ভগ্নীর মুখে অপরের বিরুদ্ধে এসব অভিযোগ শোভা পায় না।"[২১] ভারতের হিন্দুসমাজে বর্ণবৈষম্য ও অস্পৃশ্যতার দিকেই স্মাট্‌স্ এভাবে অঙ্গুলিনির্দেশ করেছিলেন। এ অঙ্গুলিনির্দেশ অবশ্যই আমাদের প্রাপ্য।

বিশ্বরাষ্ট্রসংঘের এই অধিবেশনেই দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার প্রস্তাব করেছিল যে দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা দেশটাকে দক্ষিণ আফ্রিকার অন্তর্ভুক্ত করে নিতে দেওয়া হোক। সাধারণ পরিষদ ৩৬-০ ভোটে এই প্রস্তাব বর্জন করেছিল।

ভারতীয়দের প্রতিবাদ উপেক্ষা করে ১৯৪৬ সালের জুন মাসে স্মাট্‌স্‌ তাঁর আইন পাস করালেন। দিল্লীর সরকার (ভারতে তখনো বৃটিশরাজ) দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে তাদের হাই কমিশনার সরিয়ে নিল এবং জুলাই মাসে দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছেদ করল।

জুন মাসেই ডারবান শহরে ভারতীয় কংগ্রেসের প্রতিরোধ আন্দোলন শুরু হল। তেত্রিশ বৎসর পরে দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়রা আবার প্রকাশ্য গণবিক্ষোভের পথে নামল।

ভারতীয় মহলে আন্দোলনের নীতি-পদ্ধতি নিয়ে মতভেদ ছিল। গান্ধীজীর নীতি অনুসারে আন্দোলন হওয়া উচিত 'সত্যাগ্রহ' এবং আন্দোলনকারীদের প্রত্যেকের কায়মনোবাক্যে 'সত্যাগ্রহী' হওয়া উচিত। এই শর্ত পূরণ করে কোন গণ-আন্দোলন হতে পারে না, গান্ধীজী নিজেও গণ-আন্দোলনে এই অবস্থা পুরো পাওয়া যায় না বলে উল্লেখ করেছেন। তথাপি বিতর্ক চলত। দক্ষিণ আফ্রিকায় আন্দোলনকারীরা বিতর্ক এড়ালেন 'সত্যাগ্রহ' শব্দটা বাদ দিয়ে। 'প্যাসিভ্‌ রেজিস্টান্স'—নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ—শব্দটা গৃহীত হল। এই শব্দটাও ঠিক উপযোগী নয়, গান্ধীজী সঙ্গতভাবেই 'প্যাসিভ্‌' বা 'নিষ্ক্রিয়' শব্দটা অপছন্দ করতেন। তথাপি আন্দোলনের পদ্ধতি যে শান্তিপূর্ণ থাকবে, সেকথাটা বোঝাবার জন্য ওই অনুপযোগী শব্দটাই চালু হল। তবুও কট্টর গান্ধীবাদীরা সমালোচনা ছাড়লেন না, আন্দোলনকারীদের অধিকাংশের নৈতিক দুর্বলতার কথা তুললেন; কারাবরণের স্বেচ্ছাব্রতী সংগ্রহ করার জন্য লোককে বলা হচ্ছে 'বেশি দিন জেলে থাকতে হবে না, বড়জোর তিন থেকে ছয় সপ্তাহ'—এ সমালোচনাও হল।[২২]

কিন্তু আন্দোলন সাড়া জাগিয়েছিল। প্রায় ২০০০ মানুষ কারা-বরণ করেছিল। কারাবরণের চেয়েও কঠিন পরীক্ষা তাদের হয়েছিল—গুণ্ডাপ্রকৃতির শ্বেতাঙ্গ ছোকরাদের তাদের ওপর লেলিয়ে

দিয়ে পুলিস মজা দেখছিল ; অচৈতন্য না হওয়া পর্যন্ত স্বেচ্ছাব্রতীরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এদের হাতে প্রচণ্ড মার খেতো। সাহস, সহ্যশক্তি ও দৃঢ়পণ দেখিয়ে ভারতীয় স্বেচ্ছাব্রতীরা আফ্রিকান জনতার কাছে নতুন সম্মান অর্জন করেছিল, স্নেহ ও শ্রদ্ধা পেয়েছিল। আফ্রিকান-ভারতীয় ঐক্যের ভিত্তি তৈরী হয়েছিল। আন্দোলনের খবরাখবর নিতে এসেছিলেন ইংরেজ রেভারেণ্ড মাইকেল স্কট। গুণ্ডাদের মারের মুখে দাঁড়িয়েও আন্দোলন চালিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত যেদিন হল, সেদিন নাইকার ও দাদু'র সঙ্গে মাইকেল স্কট ভারতীয় কংগ্রেসের অফিসে। পরের দিন স্কট আন্দোলনকারীদের সঙ্গে গিয়ে দাঁড়ালেন, মার খেলেন, গ্রেপ্তার হলেন, এক মাস সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ করলেন।[২৩]

আইন চালু হল। কিন্তু ভারতীয়দের ভোটার-তালিকা করা গেল না। ভারতীয়রা ওই ভোট বয়কট করেছিল, সে বয়কট সম্পূর্ণ সফল হয়েছিল।

॥ সাত ॥

১৯৪৬ সালের অগস্ট মাস। ডারবানে তখনো ভারতীয়দের প্রতিরোধ আন্দোলন চলছে। ট্রান্সভালে আফ্রিকান স্বর্ণখনি-শ্রমিকদের বিশাল ধর্মঘট ফেটে পড়ল।

আফ্রিকান মাইনওয়ার্কার্স ইউনিয়ন ১৯৪১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৯৪২ সালে কয়েকটা স্বতঃস্ফূর্ত ধর্মঘটের পর সরকার যুদ্ধকালীন জরুরী আইন জারী করে আফ্রিকান শ্রমিকদের ধর্মঘট নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল। সেই সঙ্গে আফ্রিকান খনিশ্রমিকদের অবস্থা বিচার করে তদনুযায়ী সুপারিশ করার জন্য এক সরকারী তদন্ত কমিশন নিয়োগ করা হয়েছিল। এই ল্যান্সডাউন কমিশন ১৯৪৩ সালে রিপোর্ট পেশ করেছিল। মজুরীর হার সম্বন্ধে কমিশনের রিপোর্টে যে তথ্য ছিল তাতে দেখা যায় ১৯২৫ সালে আফ্রিকান শ্রমিকরা গড়পড়তায় প্রতি শিফ্‌টে মাথাপিছু মজুরী পেত ২৬'৮

পেনী, ১৯৪৩ সালের জানুয়ারী মাসে সেটা হয়েছিল ২৭ পেনী। জীবনযাত্রা নির্বাহের ব্যয় ইতিমধ্যে সাধারণভাবে শতকরা ৫০ ভাগ বেড়েছিল।[২৪]

১৯১০-১২ সাল থেকে ১৯৪২ সালের মধ্যে খনিমালিকদের মুনাফা চতুর্গুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল, এবং খনি থেকে সরকারের আয় বেড়েছিল ১৮ গুণ। আফ্রিকান শ্রমিকদের রক্তমাংসহাড় দিয়ে এই মুনাফা ও সরকারী আয় হচ্ছিল।

কমিশন শ্রমিকদের জন্য প্রতি শিফ্‌টে ৩ পেনী করে মহার্ঘ-ভাতা দেওয়ার এবং মজুরীও সামান্য বাড়াবার সুপারিশ করেছিল। মাটির ওপরের মজুরদের জন্য ২৫ পেনীর জায়গায় ২৬ পেনী, এবং খাদের ভেতরে যারা খাটবে তাদের জন্য ২৭৬ পেনীর জায়গায় ২৯ পেনী— এই ছিল সুপারিশ। এই সামান্য সুপারিশও মালিকরা পুরোটা মানল না।

শ্রমিকরা ১৯৪৩-৪৪ সালে ধর্মঘট করার জন্য ইউনিয়নকে চাপ দিয়েছিল। ইউনিয়ন-নেতারা সে সময়ে যুদ্ধপ্রচেষ্টায় বিঘ্ন ঘটাতে চাননি, অনেক ক'রে শ্রমিকদের শান্ত রেখেছিলেন। ১৯৪৬ সালে সব ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। ইউনিয়ন ধর্মঘট এড়াতে অনেক চেষ্টা করেছিল, বারবার মালিকদের চেম্বার অব্‌ মাইন্‌সের কাছে চিঠি দিয়ে আলোচনার প্রস্তাব পাঠিয়েছিল,—একটা চিঠিরও কোন জবাব আসেনি। আফ্রিকান শ্রমিকদের ইউনিয়নকে কোন রকম পাত্তা দেওয়া চেম্বার অব মাইনসের নীতিবিরুদ্ধ।

শ্রমিকরা ১০ শিলিঙ (১২০ পেনী) ন্যূনতম দৈনিক মজুরী দাবী করেছিল। ২৭।২৮ পেনী থেকে একলাফে ১২০ পেনী দাবী করা অবাস্তব মনে হতে পারে; কোন কোন শ্রমিক-দরদীও সেকথা বলেছিলেন; কিন্তু জীবনধারণের জন্য ওই মজুরীই প্রয়োজন ছিল, এবং শ্বেতাঙ্গ শ্রমিকদের ইউনিয়ন অনেকদিন আগেই অ-দক্ষ শ্বেতাঙ্গ শ্রমিকদের জন্য ওই হারে মজুরী দাবী করেছিল।

দাবী ন্যায্য। কিন্তু প্রতিপক্ষ অনড় এবং প্রবল শক্তিমান। অপ্রত্যাশিত কিছু একটা না ঘটলে শ্রমিকদের ধর্মঘট ক'রে জেতার আশা ছিল না। ইউনিয়নের নেতা জন মার্কস শ্রমিকদের বলেছিলেন: তোমরা গোটা দেশটার সস্তা-মজুরী অর্থনীতিক বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছ, এ লড়াই সহজ হবে না, অনেক আত্মত্যাগ করতে হবে। শ্রমিকরা পিছিয়ে গেল না। এমন হয়, পরাজয় ধ্রুব জেনেও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে মানুষ কখনো কখনো আত্মদানের প্রতিজ্ঞা নিয়ে এগিয়ে যায়।[২৫]

১২ই অগস্ট রাত তিনটের সময় এক শিফ্‌টের কাজ শেষ হল। সোনার খনি এলাকায় কয়েকশো খাদের ভেতর থেকে খাটুনী-শেষে ক্লান্ত শ্রমিকরা মাটির ওপর উঠে এল। কন্‌কনে শীতের ঠাণ্ডা হাওয়া। মাটির ওপরে পাতলা কুয়াশার আস্তরণ। মাথার ওপরে পরিষ্কার আকাশে তারার ঝিকিমিকি। কালো শরীরগুলোকে টেনে টেনে শ্রমিকরা ধীর পায়ে হেঁটে গেল কম্পাউণ্ডের বাসাঘরের দিকে। কোন কোন খনিতে তখন পরের শিফ্‌টের শ্রমিকরা কাজে যাচ্ছে। সাতটা বড় খনিতে কিন্তু কেউ কাজে গেল না। ধর্মঘট শুরু হয়ে গেল।

সেদিন ৫০ হাজার শ্রমিক ধর্মঘট করল। পরের দিন ধর্মঘটীর সংখ্যা দাঁড়াল ৭০ হাজার। দক্ষিণ আফ্রিকায় আফ্রিকান শ্রমিকদের এত বড় সংগঠিত ধর্মঘট এর আগে হয়নি।

সশস্ত্র পুলিস দিয়ে সমস্ত কম্পাউণ্ড ঘিরে ফেলা হল। শ্রমিকরা বাইরে আসতে পারে না, সংগঠক-নেতারা ভেতরে যেতে পারে না। পুলিসের নজর এড়িয়ে তার মধ্যেই দু'এক জন যাতায়াত করে। ছোট্ট ইশতেহার, লীফলেট আসে। 'ইকোনা মালি, ইকোনা সেবেন্‌জা' —'পয়সা নেই তো কাজও নেই'।

জন মার্কস ও অন্য নেতাদের গ্রেপ্তার করা হল। তারপর বেয়নেট-লাগানো রাইফেল ও ব্যাটন নিয়ে পুলিসবাহিনী কম্পাউণ্ডের ভেতর ঢুকল। ধর্মঘটী শ্রমিকদের মারতে মারতে খাদে নামানো হল।

শ্রমিকরা খাদে নেমেও কাজ করে না, চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। খাদের ভেতরে সশস্ত্র পুলিস নামল। কয়েক হাজার ফুট নীচে খাদের ভেতরে শ্রমিকদের আবার মারতে মারতে, ঠেলতে ঠেলতে, কাজের জোয়ালে জোতা হল। 'সিটি ডীপ্' খনিতে তারপরেও সমস্যা— শ্রমিকরা খাদ থেকে আর বেরোয় না। তাদের টেনে-হিঁচড়ে মেরেপিটে লিফ্টের খাঁচায় বোঝাই করে তোলা হল। গুলী চলল, ব্যাটন চলল, বেয়নেটের খোঁচায় মানুষের শরীর ক্ষতবিক্ষত হল। ঠিক হিসেব পাওয়া যায় না, অনুমান করা হয়, দশজন শ্রমিক নিহত হল, আহতের সংখ্যা ১২০০।

স্ট্রাইক কমিটি শ্রমিকদের সভা ডেকেছিল। পুলিস এসে সভা ভেঙে দিল। তামাক-কারখানা থেকে ভারতীয় ও মিশ্রবর্ণ শ্রমিকদের একটা সহানুভূতিসূচক মিছিল আসছিল, পুলিস তাদের ফিরিয়ে দিল, আর তারা যখন চলে যাচ্ছে তখন পেছন থেকে ব্যাটন চার্জ করে তাদের পেটালো। ছয়জন মেয়ে-শ্রমিক জখম হয়ে রাস্তায় পড়ল। শ্রমিকদের এরকম আরো মিছিল রাস্তায় রাস্তায় মার খেল। ডারবান থেকে ভারতীয় আন্দোলনকারীরা নিজেদের আন্দোলনের মধ্যেই আফ্রিকান শ্রমিকদের ধর্মঘট-তহবিলে ১০০ পাউণ্ড সাহায্য পাঠাল।

ধর্মঘট ভেঙে গেল। শ্রমিকরা করতে গিয়েছিল ধর্মঘট, সশস্ত্র যুদ্ধ করতে যায়নি। মালিক ও সরকার সশস্ত্র যুদ্ধ করছিল। শ্রমিকরা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়নি, সেরকম প্রস্তুতি তখন সম্ভব ছিল না। কাজেই শ্রমিকরা হারল। এইরকম বহু পরাজয়ের মধ্য দিয়েই চূড়ান্ত বিজয়ের বনিয়াদ গাঁথা হয়।

ধর্মঘট ভেঙে গেল। আফ্রিকান মাইনওয়ার্কার্স ইউনিয়ন ভেঙে গেল। কিন্তু সরকারের 'নেটিভস রিপ্রেজেণ্টেটিভ কাউন্সিল'ও ভেঙে গেল। ১৪ই অগস্ট তারিখে ওই কাউন্সিলের বার্ষিক বৈঠক বসেছিল। খনিশ্রমিকদের ধর্মঘট সম্পর্কে সে বৈঠকে সরকারের তরফ থেকে বিন্দুমাত্র উল্লেখ পর্যন্ত করা হল না। আফ্রিকান সদস্যরা

প্রশ্ন তুললেন। কোন জবাব পেলেন না। ফোর্ট হেয়ার নেটিভ কলেজের প্রিন্সিপাল আন্তর্জাতিক-খ্যাতি-সম্পন্ন পণ্ডিত ডক্টর জ্যাকরায়া ম্যাথুজ এরকম একটা গুরুতর ব্যাপারে সরকারের কোন বিবৃতি নেই দেখে গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করলেন। ওই শান্ত শীতল ভদ্রলোকটির মুখে ওইটুকু কথাই অনেক। অন্য সদস্যরা আরো চড়া কথা বললেন। জেম্‌স্ মোরোকা বললেন, "সরকার আমাদের শিশু ঠাউরেছেন নাকি? এ কিন্তু আমরা সহ্য করব না।" কিছু ফল হল না। পরের দিন আবার একই কথা। আফ্রিকান সদস্যরা বললেন, কি হচ্ছে প্রত্যক্ষ দেখার জন্য তাঁরা খনি অঞ্চলে ঘটনাস্থলে যেতে চান। এ প্রস্তাব সরকার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করল।

হিমালয়-প্রমাণ ধৈর্যেরও এবার বাঁধ ভেঙে গেল। কাউন্সিলটা একটা বিকট তামাশা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। আফ্রিকান সদস্যরা সেকথাটা খোলাখুলি বললেন। পল মোসাকা বললেন,—সরকারকে পরামর্শ দেবার জন্য এই কাউন্সিল, কিন্তু এটা বাচ্চাদের খেলার টেলিফোনের মতো, একটা 'টয়-টেলিফোন', এটা দিয়ে সরকারের কানে কোন কথা পৌঁছনো যায় না। 'টয়-টেলিফোন' কথাটা সেই থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার রাজনীতিতে একটা প্রবাদবাক্য হয়ে আছে।

জেম্‌স্ মোরোকা এক প্রস্তাব তুললেন, সরকারের নীতির প্রতিবাদে কাউন্সিলের অধিবেশন মুলতুবী রাখা হোক। প্রস্তাব পাশ হয়ে গেল। সরকারের মনোনীত তিনজন আফ্রিকান গোষ্ঠী-প্রধানও প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিলেন।

সরকার কাউন্সিলের বৈঠক ডাকলেন আবার। এতকাল কোন মন্ত্রী কাউন্সিলের বৈঠকে যাননি। এবার স্মাট্‌স্-মন্ত্রিসভার দ্বিতীয় নেতা, উদারনীতিক বলে খ্যাত, ইয়ান হফ্‌মেয়ার নিজে কাউন্সিলের সভায় গিয়ে উপদেশমূলক ভাষণ দিলেন। কিন্তু আফ্রিকান সদস্যদের ধৈর্যের বাঁধ সত্যই ভেঙে গিয়েছিল। অধ্যাপক ম্যাথুজ প্রস্তাব করলেন, বর্ণবৈষম্যমূলক নীতি পরিবর্তনের ব্যাপারে সরকার একটু

সন্তোষজনক কথা বলার অবস্থায় না আসা পর্যন্ত কাউন্সিল বন্ধ (সাস্‌পেণ্ডেড) হয়ে থাকুক। সেই প্রস্তাবই গৃহীত হল।

ধর্মঘটের নেতাদের আগেই গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। কমিউনিস্ট পার্টির অন্য নেতাদেরও গ্রেপ্তার করা হল—মোজেস কোটানে, ব্র্যাম ফিশার কেউ বাদ রইলেন না। ইউসুফ দাছু ভারতীয় কংগ্রেসের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আন্দোলনে কারাবরণ করে ডারবানে জেল খাটছিলেন—তাঁকেও নিয়ে এসে মামলায় আসামী করা হল। শাদা-কালো-বাদামী মিলে ৫২ জন একত্রে কাঠগড়ায় দাঁড়ালেন। অভিযোগ—ধর্মঘটী শ্রমিকদের উসকানি দিয়ে দাঙ্গা-হাঙ্গামা করানো। এ অভিযোগ বিচারে টিকল না। কিন্তু আসামীদের মধ্যে কয়েকজন ধর্মঘটী শ্রমিক ছিলেন, ধর্মঘট করার অভিযোগ তাঁরা অস্বীকার করেননি। যুদ্ধকালীন জরুরী আইনে সেটা অপরাধ। যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলেও সে আইন বহাল ছিল। এঁদের দুই-চার মাস করে কারাদণ্ড দেওয়া হল। অন্যরা ছাড়া পেলেন।

কিন্তু ২১শে সেপ্টেম্বর তারিখে আবার ন'টা শহরে কমিউনিস্ট পার্টির অফিস, ট্রেড ইউনিয়ন অফিস, কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যদের বাড়িঘর খানাতল্লাসী হল, এবং মোজেস কোটানে সমেত কমিউনিস্ট নেতাদের আবার গ্রেপ্তার করা হল। এবার রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা। এ মামলাও টিকল না।[২৬]

ধর্মঘটে পরাজিত হবার পর সব জায়গায় যেরকম হয়, এক্ষেত্রেও সেরকমভাবে নেতাদের দোষত্রুটির কথা উঠছিল। এ-এন-সি'র কোন কোন নেতা কমিউনিস্টদের দোষ দেখাচ্ছিলেন ; কেউ বলছিলেন, ধর্মঘট করা ঠিক হয়নি ; কেউ বলছিলেন, সংগঠন আরো মজবুত করে তারপর ধর্মঘটের কথা ভাবা যেত। কমিউনিস্টরা কেউ কেউ এ-এন-সি'র নেতাদের দোষ দেখাচ্ছিলেন,—এত বড় একটা ধর্মঘটের সমর্থনে তাঁরা তো বিশেষ কিছু করেননি! অ্যান্টন লেমবেডে এবং যুবলীগের নেতারা বলছিলেন, ইউনিয়নের সভাপতি জন মার্কস এবং

এ-এন-সি'র সভাপতি ডাঃ ক্ষুমা একত্রে একটা দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট সংগঠিত করলে ভালো হত।

এসব তর্কবিতর্ক সত্ত্বেও ব্যাপক ঐক্যের আবহাওয়া তৈরী হয়েছিল। ভারতীয়দের আন্দোলন একরকম সাড়া জাগিয়েছিল। খনিশ্রমিকদের সংগ্রাম কমিউনিস্ট কর্মীদের সঙ্গে যুবলীগের সহযোগ সৃষ্টি করেছিল। লেমবেডে কোটানে'র সঙ্গে হাত মিলাতে এগিয়ে এসেছিলেন।

এই সন্ধিক্ষণে অকস্মাৎ মাত্র তেত্রিশ বছর বয়সে অ্যান্টন লেম্‌বেডে'র মৃত্যু হল। অ্যান্টনের সহকর্মীরা রইলেন। পরবর্তী দশকগুলোয় ক্রমে তাঁরাই জাতীয় সংগ্রামের নেতা হয়ে উঠলেন।

১৯৪৭ সালের ৯ই মার্চ তারিখে আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসের সভাপতি ডাঃ আলফ্রেড ক্ষুমা, নাটাল ইণ্ডিয়ান কংগ্রেসের সভাপতি ডাঃ গঙ্গাধর নাইকার, এবং ট্রান্সভাল ইণ্ডিয়ান কংগ্রেসের সভাপতি ডাঃ ইউসুফ দাদু এক চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করলেন—গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য, জাতিবর্ণনির্বিশেষে সকলের পূর্ণ ভোটাধিকার ও সমান সুযোগের জন্য তাঁদের তিনটি সংগঠন পরস্পরের সঙ্গে সহযোগিতা করবে। 'তিন ডাক্তারের চুক্তি' নামে এই চুক্তি বিখ্যাত হয়ে আছে।

১৯৪৭ সালের অগস্ট মাসে ভারত ও পাকিস্তান স্বাধীনতা পেল। ১৯৪৬-৪৭ সালের ভারতবর্ষে ভয়াবহ দাঙ্গা ও দেশবিভাগের প্রচণ্ড আঘাতে ভারতীয় জনসাধারণ বিহ্বল হয়ে গিয়েছিল। আফ্রিকার মুক্তি-আন্দোলনেও এ আঘাত লেগেছিল, সাম্রাজ্যবাদী শাসকরা ভারতবর্ষের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলত—'ওই দেখ, কালা আদমীর স্বাধীনতা কেমন!' তথাপি, ১৯৪৭ সালের স্বাধীনতা আফ্রিকার মুক্তি-আন্দোলনে উৎসাহ জুগিয়েছিল।

১৯৪৭ সালের ১২ই মার্চ তারিখে মার্কিন দেশে প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট অন্দোলনের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করলেন—'ট্রুম্যান ডক্‌ট্রিন' নামে কুখ্যাত নীতি চালু হল। মার্কিন

সরকারের ২৫ লক্ষ কর্মচারী, সেনাবাহিনীর ৩০ লক্ষ লোক এবং প্রতিরক্ষা-শিল্পে নিযুক্ত কনট্রাক্টরদের ৩০ লক্ষ শ্রমিক কর্মচারীর তন্ন-তন্নাস এবং রাজনৈতিক চালুনীতে ছাঁকা শুরু হল।[২৭] 'কমিউনিস্ট', 'কমিউনিস্ট-দরদী' এবং 'রাশিয়ার গুপ্তচর' সন্দেহে মার্কিন দেশে হাজার হাজার মানুষের জীবন অতিষ্ঠ হতে থাকল। 'ঠাণ্ডা যুদ্ধ' পুরোদমে শুরু হল।

১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে চেকোশ্লোভাকিয়ায় সংসদীয় গণতান্ত্রিক সরকারের অবসান ঘটিয়ে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সশস্ত্র শ্রমিকবাহিনী ও গণকমিটি ক্ষমতা দখল করার পর ইউরোপে এবং অন্যান্য দেশে কমিউনিস্টবিরোধী প্রচার আরো প্রবল হয়ে উঠল। ১৯৪৯ সালের অক্টোবরে চীনে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে গণমুক্তি ফৌজ পিকিঙ শহরে প্রবেশ ফরল, মার্কিন-সমর্থিত চিয়াং কাই শেক সরকারের পতন হল। মার্কিন দেশে প্রতিক্রিয়া উন্মত্ত হয়ে উঠল। ১৯৫০ সালের ২৫শে জুন কোরিয়ায় যুদ্ধ শুরু হল। ১৯৫১ সালে ভিয়েৎনামে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধ চালানোর খরচা মার্কিন সরকার জোগাতে শুরু করল।

এই আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির প্রথম পর্বেই দক্ষিণ আফ্রিকায় ১৯৪৮ সালের ২৬শে মে তারিখে নির্বাচন হয়েছিল—মালান-হাভেঙ্গার 'ন্যাশনাল + আফ্রিকানের' পার্টির সরকার ক্ষমতায় এসেছিল। দক্ষিণ আফ্রিকায় মালানের শাসনকে আফ্রিকানরা 'মালানাৎসী-রাজ' নাম দিয়েছিল।

দশম অধ্যায়

মালানাৎসী-রাজ

। এক ।

সরকারী অফিসে ঢুকেই মালানের দল ক্ষিপ্রবেগে চারটি কাজ করল—(১) আফ্রিকান শ্রমিক-কারিগরদের কাজ শেখানোর যেটুকু সামান্য ব্যবস্থা ছিল, তা তুলে দিল ; (২) বৃটেন বা অন্যান্য ইংরেজ-ভাষী দেশ থেকে যে শ্বেতাঙ্গরা দক্ষিণ আফ্রিকায় বসতি করতে আসছিল, তাদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধে দেওয়া বন্ধ করে দিল ; বিশেষ সুবিধে দিয়ে এদের আনা হত শ্বেতাঙ্গদের সংখ্যা বাড়াবার জন্য ; মালানের দল এদের সুবিধে দেওয়া বন্ধ করল ইংরেজী-ভাষীদের তুলনায় 'আফ্রিকান্‌স্'-ভাষী শ্বেতাঙ্গদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য ; (৩) ব্রোয়েডেরবন্ড্‌ ও-বি প্রভৃতি গোপন অর্ধ-গোপন নাৎসী সংগঠনে সরকারী কর্মচারীদের সদস্য হওয়া নিষিদ্ধ ছিল, সে নিষেধাজ্ঞা বাতিল করে দিল ; (৪) মহাযুদ্ধের সময় নাৎসী গুপ্তচর বৃত্তির অপরাধে পাঁচজনের কারাদণ্ড হয়েছিল, তাদের খালাস করে দিল। তাছাড়া, আফ্রিকানদের জন্য গৃহনির্মাণের যেসব ক্ষুদ্র পরিকল্পনা বানানো হয়েছিল, সেগুলো খারিজ করা হল ; সমস্ত জায়গায় পোস্টার নোটিস লাগানো হল, যে জাতের জন্য যে প্রবেশপথ, আসন বা কামরা নির্দিষ্ট, তারা যেন সেগুলিই ব্যবহার করে, এক জাতের লোক অন্য জাতের জায়গায় যেন না ঢোকে।[১]

শেষের এই হুকুমটা নব-ঘোষিত 'আপার্টহেইট' তত্ত্বের নির্দেশ। 'আপার্টহেইট' আফ্রিকান্‌স্ ভাষার শব্দ, ইংরেজীতে apart-hood, আক্ষরিক মানে 'পৃথক অবস্থা'। শাদা-কালো-তামাটে মানুষেরা মিলে মিশে যাওয়া ঠিক নয়, যে যার নিজের বৈশিষ্ট্য নিয়ে পৃথকভাবে থাকা উচিত—আপার্টহেইট-তত্ত্বের এ হল একটা কথা। সঙ্গে

আরেকটা কথা হল—দক্ষিণ আফ্রিকা শ্বেতাঙ্গদের দেশ, এখানে অ-শ্বেতাঙ্গরা কখনোই শ্বেতাঙ্গের সমান অধিকার পেতে পারে না; অ-শ্বেতাঙ্গদের জন্য কয়েকটা অঞ্চল পৃথক করে চিহ্নিত করে দেওয়া হবে, শ্বেতাঙ্গ-সরকারের অভিভাবকত্বে ও তত্ত্বাবধানে সেইসব অঞ্চলে তারা ধীরে ধীরে আপন আপন উপজাতীয় বৈশিষ্ট্য রক্ষা ক'রে বিকাশ লাভ করবে।

মোটামুটিভাবে এই কথাগুলো শ্বেতাঙ্গ-মহলে অনেকদিন ধরেই চালু ছিল। এগুলোকে একটা তত্ত্বের আকার দেওয়া হয় ১৯৪৬-৪৭ সালে। 'আফ্রিকানের'-জাতীয়তাবাদের তত্ত্বপীঠ স্টেলেনবশ্ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কতিপয় 'অধ্যাপক' এই তত্ত্বের প্রবক্তা হয়েছিলেন। এসব অধ্যাপকরা অনেক প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার দায় এড়িয়ে গিয়েছিলেন। কালোমানুষরা যদি শাদা এলাকায় আসা-যাওয়া বন্ধ করে তাহলে শাদা মানুষদের চলবে কি করে, কোন কোন অঞ্চল কালোদের জন্য নির্দিষ্ট হবে এবং সেইসব জায়গায় আড়াই কোটি কালো মানুষের সঙ্কুলান হবে কি করে, ভারতীয়রা কোথায় থাকবে, মিশ্রবর্ণরাই বা কোথায় থাকবে, কিভাবে থাকবে—এসব প্রশ্নের জবাব ছিল না। বেশি পীড়াপীড়ি করলে জবাব বেরুত—ভারতীয়রা ভারতে চলে যাক, আর যেসব কালোমানুষের জায়গা কুলোবে না তারা কঙ্গোয় চলে যাক।[২] 'অধ্যাপক' কতরকম হয়!

কোন প্রশ্নেরই উত্তর দেবার দায় মালান-সরকারের ছিল না। তারা এই তত্ত্বকে কাজে দেখাতে থাকল। নেটিভ রিপ্রেজেণ্টেটিভ কাউন্সিল মুলতুবী হয়ে পড়ে ছিল, ওটা তুলে দেওয়া হল। ১৯৪৩ সালে ইয়ান হফ্মেয়ার যখন শিক্ষা ও অর্থ দপ্তরের মন্ত্রী ছিলেন, তখন তিনি জাতিবর্ণনির্বিশেষে সমস্ত স্কুলে শিশুদের জন্য সরকারী খরচে একবেলা আহার দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন; নতুন শিক্ষা-মন্ত্রী শ্বেতাঙ্গ শিশুদের জন্য ব্যবস্থাটা বজায় রেখে আফ্রিকান শিশুদের খাদ্য দেওয়া বন্ধ করে দিলেন। এই সাহায্যটুকু যাদের সবচেয়ে

বেশি দরকার ছিল, খাদ্যাভাবে অপুষ্টিতে যারা মরছিল, তাদেরটাই বন্ধ হল, যাদের প্রয়োজন ছিল না তাদেরটা রইল।[৩]

ট্রেড ইউনিয়নের ওপর সরকারী হস্তক্ষেপ ও হামলা শুরু হল। ১৯৪৪-৪৫ সালে অনেক মারপিট চালিয়েও এমিল সাখ্‌সের গার্মেন্ট ওয়ার্কার্স ইউনিয়ন ভাঙা যায়নি; ১৯৪৮-এর সেপ্টেম্বরে আবার প্রচণ্ড মারপিট শুরু হল; এবার সাখ্‌স ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে নালিশ করে কোন প্রতিবিধান পেলেন না।[৪]

সরকারী কাজের এ হল কয়েকটা নমুনা। এরপর আইনের নমুনা দেখা যাক। দক্ষিণ আফ্রিকায় জাতিবৈষম্যমূলক ও দমন-পীড়নমূলক আইনের তালিকা এমনিতেই সুদীর্ঘ ও ক্লান্তিকর। তার ওপর মালানাৎসী-শাসনে যেসব আইন জারী হতে থাকল, সেগুলোর তালিকা আরো দীর্ঘ এবং আরো ক্লান্তিকর। সবকটা আইনের ক্রমানুযায়ী বর্ণনা দূরে থাক, উল্লেখ করতেই একটা পুরো গ্রন্থ লিখতে হয়। কয়েকটা নমুনাই দেখতে হবে।

১৯৪৮ সালের আইন একটা। স্মাট্‌স্ ১৯৪৬ সালে 'এশিয়াটিক ল্যাণ্ডটেনিওর অ্যাণ্ড ইণ্ডিয়ান রিপ্রেজেণ্টেশন অ্যাক্টে' ভারতীয়দের যে মেকী ভোটাধিকার দিয়েছিলেন, এক সংশোধনী আইন করে সেটা বাদ দেওয়া হল। চিনির মোড়কটা বাদ গেল, বিষবড়িটা রইল। তাতে অবশ্য কারুর কিছু এলো গেলো না, কারণ ভারতীয়রা ওই ভোট তো বয়কট করেছিল।

১৯৪৯ সালের ২৩ নম্বর আইনে দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার জার্মান বাসিন্দাদের নাগরিক অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া হল (যুদ্ধের সময় এরা বন্দী হয়েছিল); ওই দেশের ২৬ হাজার শ্বেতাঙ্গ বাসিন্দার ভোটে পার্লামেণ্টে ছয়জন অ্যাসেম্বলী-সদস্য এবং দুইজন সিনেট-সদস্য নির্বাচনের ব্যবস্থা হল; তাছাড়া এই শ্বেতাঙ্গদের প্রতিনিধি হিসেবে সিনেটে সরকার কর্তৃক মনোনীত আরো দুইজন সদস্যের আসন হল। দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গদের একটু বিশেষ খাতির হল; দক্ষিণ

আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গরা প্রতি ৯০০০ ভোটারে একজন পার্লামেণ্ট-সদস্য নির্বাচন করত, দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গরা প্রতি ৪০০০ ভোটারে একজন পার্লামেণ্ট-সদস্য পেল। মালান এক ঢিলে দুই পাখী মারলেন—বিশ্বরাষ্ট্রসংঘের নির্দেশ অগ্রাহ্য করে দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকাকে দক্ষিণ আফ্রিকার অন্তর্ভুক্ত করা হল, এবং পার্লামেণ্টে মালানের দলের সংখ্যাবৃদ্ধিও হল।

১৯৪৯ সালের ৪৯ ও ৫৩ নম্বর আইনে পোস্ট-অফিসে ও রেলওয়েতে বর্ণপার্থক্যের বন্দোবস্ত কঠোরতর করা হল। ৫৫ নম্বর আইনে সবরকম মিশ্রবিবাহ নিষিদ্ধ ও দণ্ডনীয় অপরাধ হল। ৫৬ নম্বর আইনে বেকার-বীমা ব্যবস্থা থেকে কালোমানুষদের বাদ দেওয়া হল।

নাৎসীরাজের আইনপ্রণয়নের হাত পুরো খুলল ১৯৫০ সালে। ২১ নম্বর আইন—শ্বেতাঙ্গ নরনারীর সঙ্গে অ-শ্বেতাঙ্গ নরনারীর মিলন ঘটলে কঠোর দণ্ড, বেত্রাঘাত সহ। ৩০ নম্বর আইন—'পপুলেশন রেজিস্ট্রেশন অ্যাক্ট'; দেশের প্রত্যেকটি মানুষের জন্মবৃত্তান্ত ও ইতিবৃত্ত নথিভুক্ত করা হবে, এবং সেই রেজিস্টার সম্পূর্ণ হলে প্রত্যেককে ওই ইতিবৃত্তসহ পরিচয়পত্র (আইডেন্টিটি কার্ড) সঙ্গে রাখতে হবে; যেসব মিশ্রবর্ণের লোক শাদা চামড়া দেখিয়ে শ্বেতাঙ্গ সমাজে ঢুকে পড়েছিল, তাদের হল মুশকিল; তাছাড়া, প্রত্যেকটি মানুষকে সরকারী নজরের মধ্যে রাখার ব্যবস্থা হল।

৪১ নম্বর আইন একটা মৌলিক আইন—'গ্রুপ এরিয়াজ অ্যাক্ট', 'আপার্টহেইট'-তত্ত্বের বুনিয়াদী আইন। বলা হল, দেশে তিন জাতের মানুষ আছে—শ্বেতাঙ্গ, মিশ্রবর্ণ (ভারতীয়রা এর মধ্যে পড়ল), এবং 'বান্টু'। কৃষ্ণকায় আফ্রিকানদের 'নেটিভ্' বলার অসুবিধে, তাহলে ওদেরকেই এই দেশের দেশী বলা হয়ে যায়; 'আফ্রিকান' বলাও অসুবিধে, তা বললেও এই দেশের ওপর ওদের দাবী বেশি হয়ে যায়; বোয়ারবংশজাতরা এসময়ে নিজেদেরকেই দক্ষিণ আফ্রিকার সাচ্চা

নেটিভ 'আফ্রিকানের' বলে পরিচয় দিচ্ছিল ; অতএব আফ্রিকানদের নাম দেওয়া হল 'বান্টু'। আইনে বলা হল, এই তিন জাতির মানুষ কোথাও একত্রে বসবাস করতে পারবে না, সরকার আলাদা আলাদা বসবাসের জায়গা ঠিক করে দেবে ; এক জাতের জন্য নির্দিষ্ট এলাকায় অন্য জাতের মানুষ থাকলে সরকার তাদের উঠিয়ে দেবে ; এক জাতের এলাকায় অন্য জাতের মানুষ যাতায়াত করতে হলে 'পাস্' লাগবে। 'বান্টু'দের আবার পৃথক পৃথক জাতিতে ভাগ করে খোশা জুলু তঙ্গা ৎসোআনা প্রভৃতি উপজাতির ভিন্ন ভিন্ন এলাকা নির্দিষ্ট করার ব্যবস্থা থাকল। বান্টুরা একটা ঐক্যবদ্ধ জাতি হবে সরকার তা অবশ্যই চাননি।

শুচিবায়ুগ্রস্ত উন্মাদ একবার স্নান করে স্বস্তি পায় না, তার গায়ে সর্বদা ময়লা লাগে, সে বারবার স্নান করতে দৌড়োয়। মালান সরকার এই উন্মাদ আইন পাস করেও স্বস্তি পেল না, বারবার এই আইনের সংশোধন চলল, ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত পাঁচবার সংশোধন হল, তার মধ্যে ১৯৫৫ সালে দু'বার—তারপর ১৯৫৭ সালেই আবার গোটা আইনটা পুনর্লিখন করা হল।[৫] এই আইনের প্রয়োগ হল ধাপে ধাপে।

যেমন ধরুন, ১৯৫৮ সালে ডারবান শহরের অনেকগুলো পাড়া থেকে ৬০ হাজার ভারতীয়কে সরানো হল শহরের বাইরে দূরে এক গ্রামাঞ্চলে ; ২৫০০০ বাড়িঘর, দোকানপাট, কারিগরী কারখানা লোপাট হল। এর মধ্যে কোন কোন পাড়ায় ভারতীয়রা ৯৩ বছর ধরে বাস করছিল, অন্য কোন জাতের লোক সেখানে বাস করত না। ৬০ হাজার ভারতীয়ের সঙ্গে ৪০ হাজার কালোমানুষ ও মিশ্রবর্ণের মানুষও উৎখাত হল।[৬]

যেমন ধরুন, সোফিয়াটাউন বসতি থেকে আফ্রিকানদের তাড়াবার জন্য বুলডোজার দিয়ে ঘরবাড়িগুলোকে গুঁড়ো করে ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়া হল। আলেকজানড্রা'র আফ্রিকান বস্তিশহরকে লোপ করিয়ে দিয়ে হাজার হাজার মানুষকে তাড়ানো হল।[৭]

১৯৭৪ সালে লণ্ডনের 'ইকনমিস্ট' পত্রিকা লিখল: "দক্ষিণ আফ্রিকায় ১৭ লক্ষ ৫০ হাজারেরও বেশি মানুষকে শিকড় ছিঁড়ে উৎখাত করা হয়েছে এবং খুব শীঘ্রই আরো ৫ লক্ষ উৎখাত হবে।"[৮]

জুলাই মাসের গোড়ার দিকে এল ৪৪ নম্বর আইন—১৯৫০-এর আইনপ্রণয়নের বোমাবাজীর সবচেয়ে সেরা বোমা—কমিউনিজম-দমন আইন, 'সাপ্রেসন অব কমিউনিজম অ্যাক্ট'। নাৎসীরাজের এও একটা বুনিয়াদী আইন, মার্কিন দেশের ট্রুম্যান-ডক্ট্রিনের আশীর্বাদ-প্রসূত।

কমিউনিস্ট পার্টিকে অবৈধ ঘোষণা করা হল। কমিউনিস্ট, বা কমিউনিজমের সঙ্গে সম্পর্কিত কার্যকলাপে লিপ্ত অন্য যে কোন সংগঠনকে অবৈধ ঘোষণা করার ক্ষমতা সরকারকে দেওয়া হল। কমিউনিজমের তত্ত্ব প্রচার করা বা সে তত্ত্বের অনুকূলে যেতে পারে এমন কোন কাজ করা অপরাধ বলে ঘোষণা হল, এবং সে অপরাধে দশ বৎসর কারাদণ্ডের ব্যবস্থা হল।

'কমিউনিজমের তত্ত্ব' কি? এই আইনে যে সংজ্ঞা নিরূপণ হল, তাতে দক্ষিণ আফ্রিকায় কোনরকম রাজনৈতিক অর্থনৈতিক পরিবর্তন বা সামাজিক সংস্কার সাধনের উদ্দেশ্যে আন্দোলন করা বা আইন-অমান্যের কথা বলা কমিউনিজম; সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কথা বলা তো কমিউনিজম বটেই, বিশ্বশান্তির কথা বলাও নিশ্চয়ই কমিউনিজম, শ্রমিকদের মজুরীবৃদ্ধির কথা বলাও কমিউনিজম, বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে কথা বলাও কমিউনিজমের তত্ত্ব-প্রচার। পার্কের বেঞ্চে 'কেবলমাত্র শ্বেতাঙ্গদের জন্য' চিহ্ন দেওয়া আছে; কোন অ-শ্বেতাঙ্গকে যদি কেউ সেই বেঞ্চে বসে আইন অমান্য করতে বলে তাহলে সে কমিউনিজম-অপরাধে অপরাধী।

এই আইনের এক মামলায় ট্রান্সভাল সুপ্রীম কোর্ট অভিযুক্তদের কারাদণ্ড দিয়েও রায়ে মন্তব্য করেছিল—এই আইনে যেসব ব্যাপারকে কমিউনিজম বলে নির্দিষ্ট করা হয়েছে, সেগুলো সচরাচর কমিউনিজম

বলে পরিচিত নয়—অতএব এই কমিউনিজমকে 'স্ট্যাটুটরী কমিউনিজম' বলতে হয়, কমিউনিজম না হলেও এগুলো আইন-মোতাবেক কমিউনিজম।[৯]

কমিউনিস্ট কে? আইনে বলা হল, কমিউনিজমের বিভিন্ন লক্ষ্য এই আইনে যা নিরূপিত হল, তার কোনটার সপক্ষে প্রচার করছে ব'লে গভর্ণর-জেনারেল যাকে কমিউনিস্ট মনে করবেন, সে-ই কমিউনিস্ট। এই আইনে যেসব সংগঠনকে অবৈধ ঘোষণা করা হবে সেসব সংগঠনের পদাধিকারী, সদস্য ও সক্রিয় সমর্থকদের তালিকা প্রস্তুত করার বন্দোবস্ত হল। ওই তালিকায় যার নাম আছে, অথবা কমিউনিজম-প্রচারের অপরাধে যে অপরাধী সাব্যস্ত হয়েছে, সেরকম যে কোন লোককে যে কোন সংগঠন বা যে কোন রাষ্ট্রিক বা সামাজিক প্রতিষ্ঠান থেকে পদত্যাগ করতে হুকুম দেওয়ার ক্ষমতা দেওয়া হল বিচারমন্ত্রীকে ; মিউনিসিপালিটি, রিলিফ কমিটি, স্কুলবোর্ড, দাতব্য চিকিৎসালয় বা নৈশ বিদ্যালয়ের কমিটি ইত্যাদির সদস্য হওয়া থেকে পার্লামেন্টের সদস্য হওয়া পর্যন্ত নিষিদ্ধ করার ক্ষমতা বিচারমন্ত্রীর হাতে এল।

যে কোন সংগঠন বা পত্র-পত্রিকাকে বেআইনী কাজে লিপ্ত বলে মন্ত্রীর যদি সন্দেহ হয় তাহলে তল্লাসী চালানোর ব্যাপক ক্ষমতা থাকল। যে কোন জমায়েতকে নিষিদ্ধ করার ক্ষমতা, এবং যে কোন লোককে যে কোন জায়গায় যে কোন জমায়েতে যোগ দিতে নিষেধ করে হুকুম জারী করার ক্ষমতা থাকল।

জমায়েত কি? একাধিক ব্যক্তি যদি একই উদ্দেশ্যে কোন জায়গায় জড়ো হয় তাহলেই তা 'gathering', জমায়েত। বিভিন্ন আদালতে বিভিন্ন মামলায় এই 'জমায়েত' নিয়ে অনেক তর্কবিতর্ক হতে হতে শেষ পর্যন্ত যা দাঁড়িয়েছে তাতে তাস খেলার জন্য দুই, তিন বা চারজন লোক জড়ো হলে সেটাও 'জমায়েত', এবং যে ব্যক্তিকে কোন জমায়েতে উপস্থিত থাকতে নিষেধ করা হয়েছে, তার বাড়িতে

তার ভাই যদি নিমন্ত্রণে আসে, তাহলে নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করে জমায়েতে হাজির থাকার দায়ে নিষিদ্ধ ব্যক্তির শাস্তি হবে।

পার্লামেন্টে মাত্র ত্রিশ ঘণ্টা আলোচনার পর 'গিলোটিন' প্রয়োগ করে আলোচনা সংক্ষেপ করে দিয়ে এই আইন পাস করা হল।[১০]

এই আইন আসছে জেনে কমিউনিস্ট পার্টি মাস-খানেক আগেই ঘোষণা করেছিল যে কমিউনিস্ট পার্টির আত্মবিলোপ ('ডিস্‌সলভ্‌') করা হল। কমিউনিস্ট নেতারা হয়তো ভেবেছিলেন যে এই কৌশলে কিছু মানুষকে এই আইনের গ্রাস থেকে সরিয়ে রাখা যাবে। পরের বছরেই আইন সংশোধন করে নতুন ধারা যোগ হল—যে লোক কখনো কোনদিন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিল, এখন সদস্য না থাকলেও সে এই আইনে 'কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য' বলে গণ্য হবে।[১১]

পার্লামেন্টে ১৯৩৬ সালের আইন অনুসারে কেপ-প্রদেশের আফ্রিকান ভোটারদের ভোটে নির্বাচিত তিনজন সদস্যের একজন ছিলেন কমিউনিস্ট নেতা স্যাম্ কান্। ১৯৫০-এর এই আইনে তাঁকে পার্লামেন্টের সদস্যপদ থেকে সরানো হল। উপনির্বাচনে জয়ী হয়ে এলেন কমিউনিস্ট ব্রায়ান বান্টিং (সিড্‌নী বান্টিং-এর পুত্র), তাঁকেও সরানো হল। আবার উপনির্বাচনে জয়ী হলেন কমিউনিস্ট মহিলা ট্রেড ইউনিয়ন নেত্রী রে আলেকজাণ্ডার; তাঁকে আসন গ্রহণ করতেই দেওয়া হল না।[১২] ১৯৫৯ সালের ৪৬ নম্বর আইন 'বান্টু সেলফ-গভর্ণমেণ্ট অ্যাক্ট' ১৯৩৬ সালের ওই পুরনো আইনটাকে বাতিল করে দিয়ে আফ্রিকান ভোটার দ্বারা শ্বেতাঙ্গ নির্বাচনের সব বখেড়া চুকিয়ে দিয়েছে, দক্ষিণ আফ্রিকার পার্লামেন্টের কোথাও আফ্রিকানদের কারু কোন ভোট নেই।

কমিউনিজম-দমন আইনে কমিউনিস্টদের সংগঠন অবৈধ হল, পার্লামেন্টের সদস্য পদ গেল, ভোটে দাঁড়াবার অধিকার লোপ হল, পাসপোর্ট বাজেয়াপ্ত হল, হরেক নিষেধাজ্ঞা জারী হল। সরকার-রচিত 'কমিউনিস্টদের তালিকা' প্রায় ৬০০ নামের ফর্দ হল। এই

৬০০ মানুষ নিষেধাজ্ঞার শিকার হলেন। ইউসুফ দাদুকে হুকুম দেওয়া হল জোহানেসবার্গ থেকে বসবাস উঠিয়ে অন্ততঃ ছয়মাস অন্যত্র থাকতে হবে এবং জোহানেসবার্গে কখনো কোন সভায় হাজির থাকা চলবে না।[১৩] এমিল সাখ্‌সের পাসপোর্ট বাজেয়াপ্ত হল।

এঁরা তো কমিউনিস্ট, বা কমিউনিস্ট পার্টির প্রাক্তন সদস্য। কিন্তু যে হাজার হাজার মানুষকে এই আইনে 'নিষিদ্ধ ব্যক্তি' বলে ঘোষণা করে সমস্ত অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে এবং নানারকম দণ্ড দেওয়া হয়েছে তাঁরা সবাই কমিউনিস্ট ছিলেন না। কেউ কেউ 'কমিউনিস্ট-বিরোধী' ছিলেন, এই আইনের চাপে কমিউনিস্ট-দরদী হয়ে গেলে বিস্মিত হবার কিছু নেই। জেম্‌স্ মোরোকা, আলবার্ট লুটুলি, অধ্যাপক ম্যাথুজ, গঙ্গাধর নাইকার, ওআলটার সিস্‌লু, নেলসন মাণ্ডেলা—এই আইনের আওতা থেকে কেউ বাদ পড়েননি। অ্যালান প্যাটনের ১৯৬৮ সালের বইয়ে লিবারাল পার্টির ৪২ জন সদস্যের নাম রয়েছে যাঁরা এই আইনে 'নিষিদ্ধ ব্যক্তি' বলে ঘোষিত।[১৪] এই আইনে অন্যতম 'নিষিদ্ধ ব্যক্তি' ডাঃ নাইকার ১৯৬৬ সালে তাঁর ছেলের লেখাপড়ার বিষয়ে পরামর্শ করার জন্য অ্যালান প্যাটনকে সস্ত্রীক নৈশ আহারে নিমন্ত্রণ করেছিলেন, সেই অপরাধে তাঁর ১৪ মাস কারাদণ্ড হয়েছিল।[১৫]

১৯৫৩ সালের ৩ নম্বর আইন 'পাবলিক সেফ্‌টি অ্যাক্ট'। এই আইনে সরকার দেশে সর্বত্র বা যে কোন অংশে 'জরুরী অবস্থা' ঘোষণা করে অন্য যে কোন আইন বাতিল করে দিয়ে হাইকোর্ট, সুপ্রীম কোর্ট, এমনকি পার্লামেন্টের পর্যন্ত তোয়াক্কা না রেখে শাসন চালাতে পারেন। ১৯৫৩ সালের ৮ নম্বর আইন 'ক্রিমিনাল ল অ্যামেণ্ডমেণ্ট অ্যাক্ট'; তাতে অন্যান্য বন্দোবস্তের সঙ্গে বিধান রাখা হল যে শান্তিপূর্ণ আইন অমান্য করলে বা অপরকে করতে বললে, কারাদণ্ড এবং জরিমানা ছাড়াও বিষয়সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হবে এবং চাবুক মারা হবে। পুরনো 'রায়টাস অ্যাসেম্বলিজ অ্যাক্ট'-এর বিভিন্ন

সংশোধনী একত্র করে ১৯৫৬ সালে আইনটা নতুন করে লিখে পাস করানো হল। ম্যাজিস্ট্রেটরা 'জমায়েত' নিষিদ্ধ করার ক্ষমতা পেলেন। 'জমায়েত'-এর সংজ্ঞা হল, একই উদ্দেশ্য নিয়ে ১২ জন বা ততোধিক মানুষ জড়ো হলে তা 'জমায়েত'। ধর্মঘট-ভঙ্গকারী 'দালাল'দের প্রতি বিদ্রূপ করা বা অপমানসূচক মন্তব্য করা 'অপরাধ' সাব্যস্ত হল, এবং সে অপরাধে শাস্তি নির্দিষ্ট হল ছয় মাস কারাদণ্ড ও ৫০ পাউণ্ড জরিমানা। ১৯৭৪ সালে এই আইনের এক সংশোধনী হয়েছে, তাতে স্থির হয়েছে—১২ জন বা ততোধিক নয়, দুইজন ব্যক্তি জড়ো হলেই তা একটা 'জমায়েত'।[১৬]

সরাসরি দমনমূলক আইনের এগুলো কয়েকটা নমুনা। বর্ণ-বৈষম্যমূলক আইনের কয়েকটা নমুনা দেখা যাক্।

১৯৫৩ সালের ৪৭ নম্বর আইন 'বাণ্টু এডুকেশন অ্যাক্ট'। আইনের নাম 'শিক্ষা-আইন', কিন্তু ব্যবস্থা আফ্রিকান শিশুদের শিক্ষা-সংহারের ব্যবস্থা। আফ্রিকান শিশুদের শিক্ষাব্যবস্থার তদারকী শিক্ষাদপ্তরের হাত থেকে 'নেটিভ' দপ্তরের মন্ত্রীর মুঠোয় গেল। প্রাথমিক বা মাধ্যমিক স্কুলে কি শেখানো হবে, শিক্ষক কে হবে সবই মন্ত্রীর নির্দেশে নির্ধারিত হবে। বেসরকারী স্কুলগুলোকে হুকুম দেওয়া হল, তাদের সব ব্যবস্থা মন্ত্রীর নির্দেশ মতো চালাতে হবে। 'নেটিভ'-দপ্তরের মন্ত্রী ডক্টর ভেরওট আইন পাস করানোর সময় বক্তৃতায় আইনের উদ্দেশ্য পরিষ্কার করে ব্যক্ত করলেন—পাশ্চাত্যশিক্ষা ও উচ্চশিক্ষা দিয়ে 'বাণ্টু' ছেলেমেয়েদের বিগড়ে দেওয়া হচ্ছে, ওসব বন্ধ করে দিয়ে তাদের অবস্থার উপযোগী শিক্ষা দিতে হবে, যাতে তারা উপজাতি গোষ্ঠীর মানসিকতা নিয়েই থাকে এবং শ্বেতাঙ্গ প্রভুদের বাধ্য শান্তশিষ্ট ভৃত্য হতে পারে। খ্রীস্টান মিশনারী স্কুলগুলোর শ্বেতাঙ্গ পরিচালকরা পর্যন্ত এই আইনের তীব্র প্রতিবাদ করেন, এবং এই আইন মেনে চলার চেয়ে স্কুল তুলে দেওয়া সম্মানজনক বিবেচনা করে একাধিক মিশন তাঁদের স্কুল তুলে দেন। দু'জন ইংরেজ খ্রীস্টান ধর্মযাজক এই

আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-আন্দোলনের তেজী প্রচারক ও সংগঠক হয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাসে সম্মানিত স্থান অধিকার করেছেন—জোহানেসবার্গের অ্যাংলিকান গীর্জার বিশপ ডক্টর অ্যামব্রোজ রীভ্‌স্‌ এবং অ্যাংলিকান মিশনারী ফাদার ট্রেভর হাডলস্টন। এঁদের প্রচারের ফলে শেষ পর্যন্ত বৃটেনের খ্রীস্টান গীর্জার দুই সর্বপ্রধান যাজক ক্যাণ্টারবেরি ও ইয়র্কের আর্চবিশপরা বলেছিলেন—'দক্ষিণ আফ্রিকায় এই নয়া হিটলারশাহীর বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করার সময় এসে গিয়েছে।'[১৬]

১৯৫৯ সালের ৪৫ নম্বর আইনের নাম 'বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের শিক্ষা সম্প্রসারণ আইন।' আইনটি আসলে হল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কালো-মানুষদের দূর করার আইন। অ-শ্বেতাঙ্গ ছাত্রদের জন্য আলাদা ইউনিভার্সিটি কলেজ করা হবে ; প্রতিষ্ঠিত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে আর অ-শ্বেতাঙ্গ ছাত্র ভর্তি করা চলবে না। অ-শ্বেতাঙ্গ কলেজগুলোয় কি পড়ানো হবে বা শেখানো হবে তা স্থির করবেন নেটিভ দপ্তরের মন্ত্রী ; শিক্ষকদের নিয়োগ-বরখাস্তের মালিকও তিনি ; তিনি ইচ্ছা করলে যে কোন ছাত্রের প্রবেশ নিষেধ করতে পারবেন।

এই আইন অনুসারে ফোর্ট হেয়ার নেটিভ কলেজ মন্ত্রীর মুঠোর মধ্যে যাবার পর ১৯৫৯ সালে প্রিন্সিপাল অধ্যাপক ম্যাথুজকে বলা হল, 'এ-এন-সি ছাড়, নাহলে চাকরী ছাড়।' আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন এই পণ্ডিতকে আফ্রিকানরা 'দি প্রফ্‌' বলে উল্লেখ করত। 'দি প্রফ্‌' চাকরী ছাড়লেন ; ২৮ বছর আগে ব্যারিস্টারী পাস করেছিলেন, আবার আইনব্যবসায়ে নামলেন। ফোর্ট হেয়ার কলেজের ইংরেজী, দর্শন, রাজনীতি-বিজ্ঞান, ভূগোল ও আইন বিভাগের প্রধান অধ্যাপকরা এবং একজন লেকচারার, লাইব্রেরিয়ান ও রেজিস্ট্রার কর্মচ্যুত হলেন ; ছাত্রসংখ্যা ১২০ থেকে ৬৯-এ নামল।[১৭]

১৯৫২ সালের ৭৬ নম্বর আইনের নাম 'নেটিভস্‌ অ্যাবলিশন অব্‌ পাসেস্‌ অ্যাণ্ড কোঅর্ডিনেশন অব্‌ ডকুমেণ্টস্‌ অ্যাক্ট।' আইনের নাম

হল 'পাস্'-বিসর্জন আইন, আইনের কাজ হল যতো পুরনো পাস্-আইন সবগুলোকে একত্র করে আরো কড়াকড়ি চাপিয়ে একটা আইন করা। 'পাস্' শব্দটা বাদ দিয়ে সে জায়গায় 'রেফারেন্স-বুক' শব্দটা আনা হল, সেই হলো 'পাস্'-বিসর্জন। আইন নিয়ে এমন বিকট তামাশা সচরাচর দেখা যায় না।

আফ্রিকানদের এতরকম আলাদা আলাদা আইনে এতরকম পাস্ রাখতে হত যে পুলিসও সবসময় সবকটা মনে রাখতে পারত না, আদালতও ঠাহর করতে পারত না যে কতরকম শাস্তি দিতে হবে। শাসকদের বিভ্রম কমাবার জন্যই এই নতুন আইন হল। ১৬ বৎসর বয়সের ওপর প্রত্যেক আফ্রিকানকে শ্বেতাঙ্গ-এলাকায় চলাফেরা করতে হলে রেফারেন্স-বুক সঙ্গে রাখতে হবে। এটা একটা মোটা বই—এতে থাকবে মানুষটার ফটোগ্রাফ, আঙ্গুলের টিপ-ছাপ, জাতিবৃত্তান্ত, আদ্যোপান্ত বিবরণ, মনিবের নাম-ঠিকানা ও প্রতি মাসে নতুন করে মনিবের স্বাক্ষর, লেবার-ব্যুরোর অনুমোদনপত্র, ট্যাক্সের রসিদ, এবং অন্যান্য প্রমাণপত্র। আফ্রিকানরা একে 'রেফারেন্স-বুক' বলে না, বলে 'ডম্-পাস্'—অভিশপ্ত পাস্। নতুন আইনে মেয়েদেরও সকলকে এই ডম্-পাস্ রাখতে হবে, এবং ১৬ বছরের কম-বয়সী কেউ যদি চাকরী-মজুরী করে তাহলে তাকেও রাখতে হবে।

এই পাস্-ব্যবস্থার প্রয়োগ বোঝা যায় পাস্ দেখাতে না পারার অপরাধে দণ্ডপ্রাপ্ত মানুষদের সংখ্যা থেকে। ১৯৫১ সালে পুরনো পাস্-আইনে দণ্ডপ্রাপ্ত মানুষের সংখ্যা ছিল ২,৩২,৪০০; ১৯৫২ সালে বৃদ্ধি পেয়ে হল ২,৬৪,৩২৪; তারপর প্রতি বৎসর বৃদ্ধি পেতে পেতে ১৯৫৯ সালে হল ৪,১৩,৬৩৯; ১৯৬০ সালে প্রচণ্ড আলোড়নের মুখে একটু কমে হল ৩,৪০,৯৫৮; তারপর আবার বৃদ্ধি পেতে থাকল।[১৪] ১৯৭৩ সালে ইকনমিস্ট পত্রিকা লিখেছে—"১৯৬৩ সাল থেকে এ পর্যন্ত পাস্-আইন ভঙ্গ করার অভিযোগে অভিযুক্ত মানুষের সংখ্যা ১ কোটি ২১ লক্ষ ২৬ হাজার; গড় হিসাবে ১৬ বছরের বেশি বয়স্ক

প্রত্যেক কৃষ্ণকায় মানুষের মাথাপিছু একাধিকবার মামলা হয়েছে।”[১৯]

পিটার ন্‌থিটে ১৯ বছর বয়সে বেকার-অবস্থায় পাস্‌ দেখাতে না পেরে একদিনে তিনবার গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। প্রথম দুইবার তাঁর মা গিয়ে জরিমানার টাকা দিয়ে ছেলেকে পুলিস হাজত থেকে ছাড়িয়ে এনেছিলেন। তৃতীয়বার হাজতে একরাত এবং পরের দিন জেলখানায় এক রাত কাটাবার পর মা অনেক খোঁজখবর করে সন্ধান পেয়ে এসে আবার জরিমানার টাকা দিয়ে ছেলেকে ছাড়ালেন। পিটার গুণ্ডা-প্রকৃতির বদমায়েস হতে পারতেন, ক্ষ্যাপা জন্তুর মতো হয়ে যেতে পারতেন। পিটার এ-এন-সি'র যুবলীগের তেজী কর্মী ও স্থানায় নেতা হয়ে উঠেছিলেন।[২০]

॥ দুই ॥

আরেক ধরনের আইন হল সংবিধান পায়ে মাড়ানোর এবং আদালতকে জব্দ করার আইন। এ আইনগুলোর সূত্রপাত হল কেপ প্রদেশের মিশ্রবর্ণ ভোটারদের ভোট লোপ করার প্রচেষ্টা থেকে। ১৯১০ সালের সাউথ আফ্রিকা আইনে বলা হয়েছিল কেপ প্রদেশের মিশ্রবর্ণ ভোটারদের ভোটাধিকার বদলাতে হলে পার্লামেণ্টের অ্যাসেম্বলী ও সিনেট উভয় সভার যুক্ত অধিবেশনে সে প্রস্তাবের সমর্থনে অন্ততঃ দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা দরকার হবে। এইভাবে সংরক্ষিত ধারা (এনট্রেঞ্চড ক্লজ) করে এই অধিকারটুকু বাঁচাবার প্রচেষ্টা হয়েছিল। সরকারী ভাষা হিসেবে ইংরেজী এইরকম সংরক্ষিত ধারার আশ্রয়ে ছিল।

১৯৪৮ সালের নির্বাচনে মালান-পন্থীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল সামান্য, দুই-তৃতীয়াংশের অনেক কম। তথাপি ১৯৫১ সালে মিশ্র-বর্ণের ভোটারদের তালিকা পৃথক করা এবং তাদের প্রতিনিধি হিসেবে চারজন শ্বেতাঙ্গ সদস্য নির্বাচন করানোর আইন পাস করা হল। মিশ্রবর্ণরা প্রতিবাদ করল, দাঙ্গাহাঙ্গামা হল।

কেপ প্রদেশের ইংরেজীভাষী শ্বেতাঙ্গমহলেও তীব্র প্রতিবাদ হল —সংবিধানলঙ্ঘন ও বিশ্বাসভঙ্গের অভিযোগ উঠল। মামলা হল। সুপ্রীম কোর্টে আপীল হল। সুপ্রীম কোর্টের আপাল-ডিভিশন ১৯৫২ সালে মার্চ মাসে কঠোর ভাষায় রায় দিল—দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থনে এ আইন পাস হয়নি, অতএব এটা অবৈধ, খারিজ এবং অস্তিত্ববিহীন।

সুপ্রীম কোর্টের এত স্পর্ধা! এপ্রিল মাসে মালান সরকার আইন পাস করালেন—'হাইকোর্ট অব পার্লামেণ্ট অ্যাক্ট'। এই আইনে বলা হল ১৯৩১ সাল থেকে এ পর্যন্ত যত আইন পার্লামেণ্টে পাশ হয়ে 'অ্যাক্ট' হিসাবে নথিবদ্ধ হয়েছে, বা ভবিষ্যতে হবে, সে সবই মান্য করতে হবে, এবং কি পদ্ধতিতে সে আইন রচিত বা অনুমোদিত হয়েছে তা নিয়ে প্রশ্ন করা চলবে না; সুপ্রীম কোর্টের আপীল ডিভিশন বা অন্য কোন আদালত যদি পার্লামেণ্টে গৃহীত কোন আইনকে 'অবৈধ' বলে, তাহলে বিষয়টা পার্লামেণ্টে বিচার হবে, পার্লামেণ্টই সর্বোচ্চ আদালত হিসাবে চূড়ান্ত রায় দেবে; পার্লামেণ্টের সদস্যদের অধিকাংশের মতই সেই রায় ('সিমপল মেজরিটি'; দুই-তৃতীয়াংশের সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাগবে না, একটি ভোটের সংখ্যাগরিষ্ঠতাই যথেষ্ট হবে); এই রায়ের বিরুদ্ধে কোথাও কোন আপাল চলবে না।[২১]

অগস্ট মাসে 'হাইকোর্ট অব্ পার্লামেণ্ট' ঘোষণা করল,—সুপ্রীম কোর্টের আপীল-ডিভিশনের রায় বাতিল, 'সেপারেট রিপ্রেজেণ্টেশন অব ভোটার্স অ্যাক্ট' নামক ওই আইন বৈধ এবং বহাল। ইংরেজী-ভাষী শ্বেতাঙ্গমহল এ সময়ে 'টর্চ কমাণ্ডো' নামে এক সংগঠন করে সংবিধান-ভঙ্গের বিরুদ্ধে বড় বড় মিছিল ও জমায়েত করছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যারা ফাসিজম ও নাৎসীবাদের বিরুদ্ধে সচেতনভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে লড়াই করেছিল সেরকম প্রাক্তন সৈন্যরা এই সংগঠনের প্রধান শক্তি ছিল; তাদের সঙ্গে প্রাক্তন বিচারপতি, ব্যারিস্টার, অধ্যাপক, চিকিৎসক প্রভৃতি অনেকে যোগ দিয়েছিলেন। এ সময়ে এই আইনের

প্রতিবাদে কেপ টাউন শহরে একদিন হরতাল হল—সবাই সে ডাকে সাড়া দিয়েছিল।

সুপ্রীম কোর্টে আবার মামলা। সুপ্রীম কোর্ট বলল, 'হাইকোর্ট অব পার্লামেণ্ট অ্যাক্ট' অবৈধ ও খারিজ, ওই তথাকথিত হাইকোর্টের কোন রায়ের কোন মূল্য নেই। সরকার এই রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করল। আপীল-ডিভিশন সরকারের আপীল অগ্রাহ্য করল।

আদালতকে বাগ মানাতে না পেরে সরকার এবার অন্য রাস্তা ধরল। ১৯৫৫ সালে 'অ্যাপেলেট ডিভিশন কোরাম অ্যাক্ট' পাস হল, সুপ্রীম কোর্টের আপীল ডিভিশনের গঠনতন্ত্রই বদলে দেওয়া হল। এ ব্যাপারটা ১৯১০ সালের সাউথ আফ্রিকা আইনে সংরক্ষিত ধারার মধ্যে ছিল না, এর জন্য তুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রয়োজন ছিল না, সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতাই যথেষ্ট। এ পর্যন্ত আপীল-ডিভিশনে ন্যূনপক্ষে ৪ জন বিচারক একসঙ্গে বসে বিচার করতেন। নতুন আইন হল, পার্লামেণ্টে পাস-করা কোন আইন সম্বন্ধে আপীল-মামলায় ন্যূনপক্ষে ১১ জন জজ বসতে হবে। ১৯৫৫ সালের মার্চ মাসে সরকার পাঁচজন নতুন জজ নিয়োগ করল।[২২] সরকারের অনুকূলে রায় পাওয়ার ব্যবস্থা হল।

ইতিমধ্যে ১৯৫৫ সালের এপ্রিল মাসে নির্বাচন হয়েছিল। মালানের দল আগের চেয়ে বেশি আসন পেল, তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা ৫ থেকে ২৯ হল।[২৩] কিন্তু এবারেও তুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা হল না। বিরোধী দল ইউনাইটেড পার্টি বর্ণবৈষম্যমূলক ও দমনপীড়নমূলক অন্যান্য সব আইন সমর্থন করছিল, কিন্তু মিশ্রবর্ণের ভোটার হঠানোর আইনটার বিরোধিতা করছিল। অতএব, আরেক বন্দোবস্ত হল। ১৯৫৫ সালে 'সিনেট অ্যাক্ট' নামে আইন পাস হল, ৪৮ জন সদস্যের পুরনো সিনেট বাতিল করে দিয়ে ৮৯ জন সদস্যের নতুন সিনেট বানানো হল, তার মধ্যে ১৮ জন সরকারের মনোনীত।

নতুন সিনেটে মালান-পন্থীদের সংখ্যা হল ৮১। দুই-তৃতীয়াংশের ব্যবস্থা হল।

এরপর ১৯৫৬ সালে পার্লামেণ্টের অ্যাসেম্বলী ও সিনেট দুই সভার যুক্ত অধিবেশনে 'সাউথ আফ্রিকা অ্যাক্ট অ্যামেণ্ডমেণ্ট অ্যাক্ট' পাস হল দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে। মিশ্রবর্ণ ভোটারদের সম্বন্ধে ১৯১০ সালের আইনের 'সংরক্ষিত ধারা' বাতিল হল; ১৯৫১ সালের 'সেপারেট রিপ্রেজেণ্টেশন অ্যাক্ট' বৈধ হল; এবং, মানুষকে বাস্তুভিটে থেকে উচ্ছেদ করার পরে তার ভিটেমাটিতে লাঙ্গল চালিয়ে দেওয়ার মতো আরেক পাকাপোক্ত বিধান জারী হল—পার্লামেণ্টে গৃহীত কোন আইনের বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন বিচার করার কোন এখতিয়ার কোন আদালতের রইল না।[২৪]

এই সব আইন পাস করানোর জন্য নির্বাচনের সময় মালানের দল জোর প্রচার চালিয়েছিল। তারা বলছিল, সুপ্রীম কোর্টের বিচারকরা তো জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি নয়, তারা তো বেতন-ভোগী কর্মচারী মাত্র; জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের অধিকাংশের রায় নিয়ে পার্লামেণ্টে যে আইন পাস হয়েছে, তার বৈধতা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলার বা বিচার করার ক্ষমতা এদের থাকবে কেন? জনগণের ইচ্ছাই (volkswil) সর্বোচ্চ আইন, তার ওপর আবার কথা কি?[২৫]

মালান অবশ্য ইতিমধ্যে ১৯৫৪ সালের ৩০শে নভেম্বর তাঁর সুযোগ্য সহচর যোহানেস্ স্ট্রাইডমের হাতে কর্মভার সমর্পণ করে ৮১ বছর বয়সে অবসর গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৫৮ সালে স্ট্রাইডমের মৃত্যুর পর প্রধানমন্ত্রী হলেন ডক্টর হেনড্রিক ভেরওর্ট। ১৯৬০ সালে এক বিকৃতমস্তিষ্ক শ্বেতাঙ্গ কৃষিকর ভেরওর্টকে হত্যা করার চেষ্টা করে গুরুতরভাবে আহত করেছিল; সে যাত্রায় ভেরওর্ট বেঁচে গেলেও ১৯৬৬ সালে আরেকজন বিকৃতমস্তিষ্ক শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীর ছুরিকাঘাতে আহত হয়ে হাসপাতালে মারা গেলেন। তাঁর জায়গায় এলেন ডক্টর বালথাজার জন ফর্স্টার। ভেরওর্ট ও ফর্স্টার যুদ্ধের সময় প্রকাশ্যে

হিটলার-ভক্তি প্রচার করতেন, ফর্স্টার তো ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের জন্য আটক হয়েছিলেন। এঁরা মালানাৎসী-রাজকে আরো শক্ত-পোক্ত করার কাজই চালিয়েছেন।

॥ তিন ॥

প্রতিবাদ-আন্দোলন, বিক্ষোভ যেমন ফেটে পড়েছে, নতুন নতুন আইন সঙ্গে সঙ্গে রচনা হয়েছে। ১৯৬০ সালে এল 'জরুরী অবস্থা', সেইসঙ্গে একঝাঁক আইন। কমিউনিস্ট পার্টি ও কমিউনিস্ট-সম্পর্কিত সংগঠনগুলোকে বেআইনী করা হয়েছিল ১৯৫০'-এর আইনে। ১৯৬০'-এর 'বেআইনী সংগঠন' আইনে অন্য যে কোন সংগঠনকে বেআইনী ঘোষণা করার ব্যবস্থা হল ; আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস ও প্যান-আফ্রিকান কংগ্রেস বেআইনী হয়ে গেল।

১৯৬২ থেকে ১৯৬৪ সালের মধ্যে 'জেনারেল ল অ্যামেণ্ডমেণ্ট অ্যাক্ট' নামে তিনটি সংশোধনী আইন পাস হল। এগুলোর বিধান হল—(১) বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির ওপর বিবিধ নিষেধাজ্ঞা জারী করার এবং বৈঠক-আলোচনা নিষিদ্ধ করার ব্যাপক ক্ষমতা ; (২) পরোয়ানা ছাড়াই গ্রেপ্তার করার ব্যবস্থা, (৩) জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ৯০ দিন পর্যন্ত বিনা-অভিযোগে বিনা-বিচারে পুলিসের হাজতে নির্জন কামরায় আটক রাখার ক্ষমতা, এবং ৯০ দিন পরে খালাস দিয়ে আবার তৎক্ষণাৎ আরেক দফা আটকের ক্ষমতা, এইভাবে অনন্তকাল আটক রাখার ব্যবস্থা ; (৩) বিচারে দণ্ডপ্রাপ্ত মানুষকে নির্দিষ্ট কারাদণ্ড-ভোগের পর খালাস না দিয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্দী করে রাখার ব্যবস্থা ; (৪) দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করার জন্য বিশ্বরাষ্ট্রসংঘ বা কোন বৈদেশিক শক্তির কাছে আবেদন করলে, বা বিদেশে গিয়ে সশস্ত্র সংগ্রামের শিক্ষা নিলে, বা কোন নিষিদ্ধ সংগঠনের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য শক্তিপ্রয়োগের চেষ্টা করলে ন্যূনপক্ষে পাঁচ বৎসর কারাদণ্ড থেকে প্রাণদণ্ড পর্যন্ত শাস্তির ব্যবস্থা, ইত্যাদি।[২৬]

৯০ দিন আটক রাখার আইন ১৯৬৫ সালে সংশোধন করে ১৮০ দিন আটক রাখার আইন হল। এই আইনে বন্দী ২৪ ঘণ্টা নির্জন কক্ষে আটক থাকে। সে অবস্থায় অনেকে উন্মাদ হয়ে যায়, আত্মহত্যাও করে। কিন্তু শুধু আটক নয়, বন্দীর ওপর অবর্ণনীয় নির্যাতন চলে। এ রকম নির্যাতনের কিছু বর্ণনা পাওয়া যায় প্যাট্রিক ডানকানের বইয়ে এবং জেম্‌স্‌ ক্যাণ্টর-এর বইয়ে; ক্যাণ্টর নিজে ৯০ দিন আটক ছিলেন।[২৭] আত্মহত্যার ঘটনা অনেক; তার মধ্যে কতগুলো যে আবার আত্মহত্যা নয়, পুলিস কর্তৃক হত্যা, তা বলা শক্ত।

লুক্‌স্মার্ট ন্‌গুড্‌লে ১৯৬৩ সালের ১৯শে অগস্ট ৯০ দিনের আইনে নির্জন কারা-কক্ষের খাঁচায় ঢুকলেন। ৫ই সেপ্টেম্বর তাঁর ফাঁস-লাগানো ঝুলন্ত মৃতদেহ পাওয়া গেল খাঁচার ভেতর। ১৯৬৪ সালের ২৪শে জানুয়ারী জেম্‌স্‌ টাইটিয়া'র মৃতদেহ পাওয়া গেল অনুরূপ অবস্থায়। ১৯৬৪ সালের সেপ্টেম্বরে ৯০ দিন আইনে আটক ভারতীয় যুবক সুলেমান সালুজী পুলিস-হাজতের আটতলার ওপর থেকে নীচের রাস্তায় ঝাঁপ দিয়ে মৃত্যুবরণ করলেন; ওঁর ডাকনাম ছিল 'বাব্‌লা'।[২৮] ১৯৬৯ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর ১৮০ দিন আইনে আটক ইমাম আব্দুল্লা হারুণের মৃতদেহ পাওয়া গেল ২৭টা ক্ষতচিহ্ন-সমেত।[২৯] ১৯৭১ সালের ২২শে অক্টোবর ভারতীয় তরুণ শিক্ষক আহম্মদ তিমলকে গ্রেপ্তার করে ১৮০-দিন আইনে আটক করা হয়। পাঁচদিন পরে তাঁর মৃতদেহ পাওয়া গেল। পুলিস বলল, ১১-তলার ওপর থেকে লাফিয়ে পড়ে ও আত্মহত্যা করেছে; অন্যসূত্রে জানা গেল, তিমলকে হত্যা করা হয়েছিল, এবং তাঁর চোখ আঙুলের নখ এবং অন্যান্য প্রত্যঙ্গ উপড়ে ছিঁড়ে এবং পিষে দেওয়া হয়েছিল।[৩০] ১৯৭২ সাল পর্যন্ত এই আইনে আটক অবস্থায় প্রাণনাশের সংখ্যা ৬২ —সরকারী হিসেবে।[৩১]

॥ চার ॥

ট্রান্সভাল প্রদেশের পূর্বাঞ্চলে বেথল্ জেলায় শ্বেতাঙ্গ কৃষিকরদের রাজত্ব। শ্বেতাঙ্গ মালিকরা অনেকে কৃষ্ণকায় মজুরদের ওপর খবরদারী-পাহারাদারী করায় কৃষ্ণকায় 'বস্-বয়'দের দিয়ে। ১৯৪৪ সালে বেথল্ জেলার এক খামারে এক কৃষ্ণকায় 'বস্-বয়' এক ক্ষেতমজুরকে চাব্‌কে মেরে ফেলেছিল। মজুরটির অপরাধ, প্রায়-অনাহারে থেকে উদয়াস্ত খাটুনী এবং যখন-তখন প্রহার সইতে না পেরে সে পালাবার চেষ্টা করেছিল। এই হত্যাকাণ্ডের মামলায় বিচারক হত্যাকারীকে নামমাত্র শাস্তি দিয়ে মন্তব্য করেন যে সোনার খনি হীরের খনির মতো কৃষি-ক্ষেত্রেও আফ্রিকান মজুরদের কম্পাউণ্ড-আটক রাখার ব্যবস্থা চালু হয়ে যাচ্ছে, এটা একটা নতুন ব্যাপার।[৩২]

ব্যাপার নতুন হোক আর পুরনো হোক, বেশ ব্যাপকভাবেই চলছিল। ১৯৪৭ সাল নাগাদ নিয়াসাল্যাণ্ড থেকেও শ্রমিকদের নিয়ে এসে খামারে কম্পাউণ্ড-আটক 'কনট্রাক্ট লেবার' করে খাটানো হচ্ছিল। এক বেথল্ জেলাতেই ১৪০০০ শ্রমিক এই অবস্থায় খাটছিল।[৩৩]

১৯৪৭ সালে মাইকেল স্কট ও রুথ ফার্স্ট বেথল্ জেলায় গিয়ে ক্ষেতমজুরদের অবস্থা স্বচক্ষে দেখে এসে সংবাদপত্রে বিবরণ প্রকাশ করে দেন।[৩৪] তারপর সামান্য হৈচৈ হয়—স্মাট্‌সের সরকার বেথ্‌লের শ্বেতাঙ্গ জমিদারদের একটু শাসন করতে চেষ্টা করে। কারু কারু মতে ১৯৪৮ সালের নির্বাচনে স্মাট্‌সের পরাজয়ের এটাও একটা কারণ।[৩৫]

মালানাৎসী-রাজে বেথল্ ও অন্যান্য জেলায় আফ্রিকান কৃষি-শ্রমিকদের ওপর শোষণ ও অকথ্য অত্যাচারের মাত্রা বেড়েছিল। ১৯৫২-৫৪ সালে 'ড্রাম্' পত্রিকায় আবার অনেক তথ্য প্রকাশিত হয়। 'ড্রাম্' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন অ্যান্টনী স্যাম্পসন ; তাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন হেনরী ঙ্‌কুমালো নামে এক অসাধারণ আফ্রিকান

সাংবাদিক। প্রত্যক্ষ বিবরণ সংগ্রহ করার জন্য হেনরী নিজে ক্ষেত-মজুর হয়ে খামারে কাজ করেছিলেন।[৩৬]

প্যাট্রিক ডানকান তাঁর বইয়ে ১৯৬০-৬২ সালের অনেক ঘটনা উল্লেখ করেছেন। তাতে দেখা যায় ক্ষেতমজুরকে পিটিয়ে আধমরা করে দেওয়া, এবং কখনো কখনো মেরে ফেলা পর্যন্ত শ্বেতাঙ্গ কৃষিকর-দের কাছে খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার।[৩৭] কম্পাউণ্ড-আটক 'কন্‌ট্রাক্ট-লেবার' কৃষিশ্রমিকের কথা বলতে গিয়ে মাইকেল স্কট বলেছেন, দাসপ্রথার খাটুনি এর চেয়ে ভালো ছিল।[৩৮]

কিন্তু শ্বেতাঙ্গ-খামারে এরকম কম্পাউণ্ড-আটক কনট্রাক্ট-লেবারই শ্রমের একমাত্র উৎস নয়। আরেকটা বড় উৎস জেলখানা। জেলখানা থেকে আফ্রিকান কয়েদীদের ক্ষেতমজুরের খাটুনী খাটতে পাঠানো হয়, শ্বেতাঙ্গ কৃষিকররা সরকারকে সামান্য ভাড়া দিয়ে সেই কয়েদী-শ্রমিককে খাটিয়ে নেয়। ১৯৬০ সালে একজন সাধারণ ক্ষেতমজুরকে একদিন খাটাতে যেখানে কৃষিকরের ৬ শিলিং থেকে ৮ শিলিং খরচ হত, সেখানে একজন কয়েদী শ্রমিকের জন্য খরচ ছিল দেড় শিলিং থেকে পৌনে দুই শিলিং।[৩৯] মালানাৎসী-রাজ এই ব্যাপারটাকে খুব উৎসাহ দিচ্ছিল। সরকারের জেলখানা বোঝাই হয়ে যাচ্ছিল, শ্বেতাঙ্গ কৃষিকরের জন্য সস্তা শ্রমিক জোগানও বাড়ছিল।

আরেকটি ব্যবস্থা মালানাৎসী-রাজের বিশেষ সৃষ্টি—'ফার্ম-জেল'। এই ব্যবস্থায় কোন শ্বেতাঙ্গ কৃষিকর ইচ্ছে করলে নিজের এলাকাতে একটা জেলখানা বানিয়ে নিতে পারে। ওই ফার্ম-জেলে সরকার কৃষিকরের প্রয়োজনমতো কয়েদী পাঠিয়ে দেবে, পাহারাদার সেপাই-সান্ত্রী পাঠিয়ে দেবে, জল-বিদ্যুৎ ও কয়েদীদের জন্য বরাদ্দ খাদ্য সরবরাহ করবে। সরকারকে সামান্য পয়সা দিয়ে কৃষিকর ওই ফার্ম-জেলের কয়েদীদের বিনা মজুরীতে খাটিয়ে নেবে।

১৯৫৩-৫৪ সালে মালানাৎসী সরকার প্রায় এক লক্ষ কয়েদীকে কৃষিকরদের ক্ষেত-খামারে খাটাচ্ছিল।[৪০] ১৯৪৯ সালে বিচারমন্ত্রী

সোআর্ট বেথল্ জেলাতে যে ফার্ম-জেলটির উদ্বোধন করেন, সেটি ওই জেলার পাঁচ নম্বর ফার্ম-জেল।[৪১] ১৯৫৬ সালে ফার্ম-জেলের সংখ্যা ছিল ১৫ ;[৪২] অল্পদিনের মধ্যে সংখ্যা হল ২৫।[৪৩]

মালানাৎসী-বন্দোবস্তে শ্বেতাঙ্গ কৃষিকর আরো একটি উপায়ে সস্তায় ক্ষেতমজুর পায়। কৃষিকর নিজের এলাকায় আফ্রিকান শিশুদের জন্য একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কুঁড়েঘর বানিয়ে দিল। তারপর বাণ্টু শিক্ষা দপ্তর বাকীটার ব্যবস্থা করবে। বাচ্চাগুলোকে 'প্রাথমিক বিদ্যালয়' নামক গুদামঘরে পোরা হল। কৃষিকরের যখনই প্রয়োজন হবে, বাচ্চাগুলোকে নিয়ে গিয়ে মাঠের কাজে জুতে দেওয়া হবে—সেটাই 'শিক্ষা ব্যবস্থা' এবং আইন-অনুসারে বাধ্যকরী ব্যবস্থা। বাচ্চাগুলোকে খাটুনীর জন্য একটা পয়সা দেওয়া হয় না, এক মুঠো খেতেও দেওয়া হয় না। মাস্টার যদি আপত্তি করে তাহলে তার চাকরী যায়।[৪৪]

একাদশ অধ্যায়

আইন-অমান্য, মুক্তিসনদ

॥ এক ।

নাৎসীরাজের এক বৎসর শাসনই সংগ্রামী মেজাজের মানুষকে অতিষ্ঠ করে তোলার পক্ষে যথেষ্ট। ১৯৪৯ সালে এ-এন-সি'র যুবলীগের সদস্যরা অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন।

ইতিমধ্যে এক বীভৎস ঘটনা ঘটে গিয়েছিল। চতুর্দিক থেকে যারা নিষ্পিষ্ট ও বঞ্চিত হয়, সেসব মানুষের মনে ক্রোধ ও আক্রোশ জমে; তাদের সামনে যদি সংগ্রামের ভরসা জাগানোর মতো কোন সঠিক কার্যসূচী না থাকে, তাহলে গুম্‌রে-মরা নিরুপায় দিশাহারা আক্রোশ ভ্রান্ত পথে ফেটে পড়ে, শত্রুকে মারতে না পেরে নিজেকেই মারে। ১৯৪৯ সালের ১৩ই জানুয়ারী ডারবান শহরে এক জুলু বালকের সঙ্গে এক ভারতীয় কিশোরের সামান্য ঝগড়া থেকে অকস্মাৎ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বেধে গেল। মানুষ খুন হল, ঘরবাড়ি জ্বলল, দোকানপাট লুট হল, মেয়েরা লাঞ্ছিত হল, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হলে যেসব বীভৎস কাণ্ড হয় সবই হল। আফ্রিকান ও ভারতীয় নেতারা ছুটে গেলেন, একত্র মিলে প্রাণপাত পরিশ্রম করে দাঙ্গা থামালেন। পুলিস, মিলিটারী, নৌ-সেনা এল, গুলীগোলা চালাল। দাঙ্গা থামল। কিন্তু ততক্ষণে ৫০ জন ভারতীয় এবং ৮৭ জন জুলু প্রাণ হারিয়েছে; হাজারের ওপর মানুষ জখম, তাদের মধ্য থেকে আরো ৫৮ জন মারা গেল।

কিছু শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তিকে—তাদের মধ্যে কিছু স্ত্রীলোক—দাঙ্গার সময় রাস্তায় রাস্তায় দেখা গিয়েছিল। তারা উন্মত্তভাবে নাচতে নাচতে জুলুদের উৎসাহিত করছিল—'কুলী পেটাও' বলে।[১] দাঙ্গা-হাঙ্গামা অন্যত্রও হচ্ছিল, শ্বেতাঙ্গদের সঙ্গে আফ্রিকানদের সংঘর্ষ হচ্ছিল প্রায়ই। এসব সংঘর্ষের শেষ পর্বে পুলিস এসে আফ্রিকানদের মারত।

বাতাস অশান্তিতে ঠাসা। তার মাঝে অশুভ আত্মঘাতী হিংসার গন্ধ। অস্থির নিরুদ্ধ জনশক্তি কল্যাণকর প্রকাশের পথ না পেলে অন্ধ বিস্ফোরণের শেষে পড়ে থাকবে শুধু ভস্মরাশি আর গ্লানির কর্দম। যুবলীগের নেতারা গণবিক্ষোভের এক কার্যসূচী তৈরী করে এ-এন-সি'র সভাপতি ডাঃ ক্ষুমা'র কাছে গেলেন। ক্ষুমা এই কার্যসূচীতে সম্মত হলেন না। কার্যসূচীর একটা দিক ছিল আফ্রিকান জাতীয়তাবাদ—ভারতীয় বা মিশ্রবর্ণ বা শ্বেতাঙ্গ প্রগতিশীলদের সঙ্গে সাংগঠনিক সংযোগ বর্জন করার কথা। ক্ষুমা এটার যে সমালোচনা করেছিলেন, সঙ্কীর্ণ বিচ্ছিন্নতার কার্যসূচী বলে, তা সঙ্গত সমালোচনা। কিন্তু আরেকটা দিক ছিল, গণবিক্ষোভের রূপ হিসেবে হরতাল-ধর্মঘট ; সীমিত ভোটাধিকারের ভিত্তিতে রচিত নেটিভ রিপ্রেজেণ্টেটিভ কাউন্সিল প্রভৃতি সমস্ত প্রতিষ্ঠান বয়কট করার প্রস্তাবও ছিল। ক্ষুমা এই দ্বিতীয় দিকটাও গ্রহণ করেননি, অবাস্তব উগ্র হঠকারিতা বলে সমালোচনা করেছিলেন। ক্ষুমার নিজের কোন যথার্থ বিকল্প প্রস্তাব ছিল না। কার্যক্ষেত্রে যুবলীগ আন্দোলন করতে নেমে প্রথম দিকটা,—সঙ্কীর্ণ নীতিটা, ছেড়েছিল, দ্বিতীয় দিকটাই বাড়িয়েছিল।

যুবলীগ সেসময়ে এ-এন্-সি'র মধ্যে প্রধান সংগঠিত শক্তি। তারা ডাঃ ক্ষুমা'র বদলে অন্য সভাপতি খুঁজতে গিয়ে পেল জেম্‌স্ মোরোকাকে। বয়কটের পক্ষে জোরাল বক্তৃতা করেই মোরোকা যুবলীগের পছন্দসই ব্যক্তি হয়ে গেলেন। ১৯৪৯ সালের ডিসেম্বরে এ-এন-সি'র সম্মেলনে ডাঃ ক্ষুমাকে ভোটে পরাস্ত করে মোরোকা সভাপতি নির্বাচিত হলেন।

সম্পাদক কে হবে ? যুবলীগ পুরনো নেতা জেম্‌স্ কালাটাকে সম্পাদক করতে চেয়েছিল। কিন্তু কালাটা স্পষ্ট বললেন, তিনি যুবলীগের কার্যসূচী সমর্থন করেন না, অতএব তিনি সম্পাদকের দায়িত্ব নিতে সম্মত নন। ওআলটার সিসুলু'র নাম প্রস্তাবিত হল।

এক ভোটের ব্যবধানে সে প্রস্তাব গৃহীত হল। এ ব্যাপারটা আকস্মিকভাবে হয়ে গেল।

সিস্থলু সংসার চালাবার জন্য সামান্য ব্যবসা করতেন, সেটা ছেড়ে দিয়ে সর্বক্ষণের রাজনৈতিক কর্মী হয়ে গেলেন। তাঁর স্ত্রী আলবার্টিনাও যুবলীগের সদস্য; তিনি হাসপাতালে নার্সের কাজ ক'রে যেটুকু উপার্জন করতেন, আর এ-এন-সি ক্বচিৎ-কখনো দু-চার টাকা যা দিত, তাই দিয়ে সংসার চালানোর চেষ্টা হতে থাকল। সিস্থলু অল্পকালের মধ্যে এ-এন-সি সংগঠনের শিথিল চেহারা বদলে দিলেন।

নতুন কার্যসূচী অনুসারে ১৯৫০ সালের ১লা মে দেশব্যাপী কর্মবিরতি পালন করার কথা ছিল। হঠাৎ যুবলীগ দেখল, কমিউনিস্ট পার্টি আগু বাড়িয়ে গিয়ে নিজেদের পার্টির নামে কর্মবিরতির ডাক দিয়ে দিল এবং নিজেদের পার্টির নেতৃত্ব জাহির করবার চেষ্টায় মেতে উঠল। তখনো যুবলীগ কমিউনিস্ট পার্টিকে ভালো চোখে দেখে না; এ ব্যাপারটায় তারা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। উভয় তরফেই গলতি-ঘাটতি ছিল। ফল হল, পরপর কয়েকটা জমায়েতে যুবলীগের লোকদের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির লোকদের ঝগড়া এবং বেশ গুরুতর মারামারি হল। যুবলীগের বুলেটিনে কমিউনিস্ট পার্টিকে নাৎসীবাদী ও-বি সংগঠনের সমধর্মী বলে কটূক্তি করা হল, কমিউনিজমকে 'বিদেশী মতবাদ' বলে বর্জন করার আহ্বান দেওয়া হল।[২]

এইসব গোলমাল ও অন্তর্বিরোধ সত্ত্বেও ১লা মে হরতাল হল। প্রায় অর্ধেক-সংখ্যক আফ্রিকান শ্রমিক-কর্মচারী কাজে গেল না। কয়েকটা জায়গায় নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে জমায়েত হল। পুলিস এল, ব্যাটন চালাল। জনতা ইঁট পাটকেল ছুঁড়ল। পুলিস গুলি চালাল। ১৮ জন আফ্রিকান নিহত হল, ৩০ জনের ওপর আহত। পুলিস বন্য জন্তু মারার মতো ভঙ্গীতে কালোমানুষদের তাড়া করে পেটাচ্ছিল।

১৮টি প্রাণনাশের শোক এবং পুলিসের বিরুদ্ধে ক্রোধ যুবলীগ ও

কমিউনিস্ট পার্টির কলহ-সংঘর্ষ ভুলিয়ে দিল। এর পরই সরকার কমিউনিজম-দমন আইনের খসড়া হাজির করল। যুবলীগ ও এ-এন-সি'র নেতারা বুঝলেন যে এ আইন শুধু কমিউনিস্টদের মারবে না, তাঁদের সকলকে মারবে। এ-এন-সি, ভারতীয় কংগ্রেস এবং কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিনিধিদের নিয়ে এক সংযোগরক্ষা কমিটি (কো-অর্ডিনেশন কমিটি) গঠিত হল, ওআলটার সিস্থলু এবং ইউস্থফ কাছালিয়া যুগ্মসম্পাদক হলেন। এই কমিটিতে আলোচনার পর এ-এন-সি'র আহ্বান প্রচারিত হল—২৬শে জুন ধর্মঘট ও হরতাল।

অ-শ্বেতাঙ্গ শ্রমিক-কর্মচারীদের শতকরা ৭০।৭৫ ভাগ সেদিন কাজে গেল না। পোর্ট এলিজাবেথ বন্দর সেদিন স্তব্ধ, ফাঁকা রাস্তায় শুধু একটা গাধা দাঁড়িয়ে ছিল অনেকক্ষণ। ডারবান শহরে ভারতীয়রা প্রায় শতকরা ১০০ ভাগ হরতাল করলেন। জোহানেসবার্গে বাস-ড্রাইভাররা কাজে এল না, অ-শ্বেতাঙ্গ ইস্কুলগুলো পর্যন্ত সব বন্ধ। রেলের অ-শ্বেতাঙ্গ শ্রমিক-কর্মচারীরা প্রায় ৭৫ ভাগ অনুপস্থিত। এই দিনও নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে কতকগুলো জায়গায় ছোট ছোট প্রতীক-ধরনের জনসভা ও মিছিল হল। যে কোন কারণেই হোক, পুলিস বেশি গোলমাল করল না, মোটামুটি শান্তিপূর্ণ-ভাবেই দিনটা অতিবাহিত হল।

এ-এন-সি'র সংগঠন বিস্তৃত হচ্ছিল। সিস্থলু, তাম্বো, মাণ্ডেলা, জো ম্যাথুজ, রবার্ট সবুকোয়ে, জেম্স্ নৃজঙ্গোয়ে, রবার্ট মাৎজি, প্রভৃতির কর্মপ্রচেষ্টার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল দু'জন সম্মানিত প্রবীণ ব্যক্তির নবীন উদ্যোগ। অধ্যাপক ম্যাথুজ এবং চীফ্ আলবার্ট লুটুলি এ সময়ে এ-এন-সি'র নেতৃমণ্ডলীর মধ্যে আসেন।

অধ্যাপক জ্যাকরায়া ম্যাথুজ ধীরস্থির শীতল স্বভাবের মানুষ, গণআন্দোলনের উত্তেজনা-কোলাহল তাঁর চতুঃসীমার মধ্যে ছিল না। মার্কিন দেশের ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং লণ্ডন স্কুল অব্ ইকনমিকসে বিদ্যাচর্চা করে তিনি দেশে ফিরেছিলেন বিখ্যাত পণ্ডিতের মর্যাদা

নিয়ে। ভদ্র শীলবন্ত বিচার-আলোচনা ছিল তাঁর মনোমত পদ্ধতি ; তাছাড়া তিনি সংশয়ী মানুষ ছিলেন ; কোন কথাই জোর দিয়ে বলা তাঁর কাছে একপেশে মনে হত ; তাঁর সব মতামতেই অনেক 'কিন্তু' 'যদি' 'অথবা' 'হয়তো' জড়ানো থাকত। তরুণ ছাত্ররা তাঁকে ভালোবাসত, শ্রদ্ধা করত, কিন্তু তাঁর সংগ্রামী-চরিত্র সম্বন্ধে তাদের আস্থা ছিল না। এরকম মৃদু স্বভাবের মানুষও দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের পক্ষে বিপজ্জনক 'নিষিদ্ধ' ব্যক্তি হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর সহযোগ এ-এন-সি'কে প্রভূত সাহায্য করেছিল। ছেলে জো ম্যাথুজ যুবলীগের তেজী কর্মী, বাপের সঙ্গে ছেলের চালচলন মিলত না। তবুও যুবলীগের প্রস্তাবিত কার্যসূচীর পেছনে অধ্যাপক ম্যাথুজ-এর সমর্থন ছিল। ১৯৫০ সালে তিনি এ-এন-সি'র কেপ প্রদেশের সভাপতি ছিলেন।

আলবার্ট লুটুলি সংশয়ী মানুষ ছিলেন না, তাঁর কতকগুলো ঋজু প্রত্যয় ছিল, সরলরেখার মতো সিধে। খ্রীস্টধর্মের কয়েকটি মূল নৈতিক শিক্ষা তিনি গ্রহণ করেছিলেন সমস্ত অন্তর দিয়ে, সৎ খ্রীষ্টান বলে তাঁর খ্যাতি ছিল। শান্তস্বভাব নম্রভাষী লুটুলি একসময়ে শ্বেতাঙ্গ শাসকমহলে 'আদর্শ নেটিভ' বলে উল্লেখিত হতেন। ১৯৩৬ সালে তাঁর গোষ্ঠীর লোকেদের অনুরোধে অ্যাডাম্স্ কলেজের শিক্ষকতা ছেড়ে তিনি জুলু আখচাষীদের গ্রামাঞ্চলে ফিরে এসে গোষ্ঠীপ্রধান হলেন। গোষ্ঠীপ্রধান হিসেবে তিনি বিভিন্ন সরকারী কমিটি, বোর্ড ইত্যাদিতে আসন পেলেন ; দশ বছর ধরে সেগুলোর অক্ষমতা ও অর্থহীনতা দেখলেন, দেখলেন কিভাবে এগুলোর আবরণে সীমাহীন নিষ্ঠুর শোষণ ও বঞ্চনা চলে ; ১৯৪৬ সালে নেটিভ রিপ্রেজেণ্টেটিভ কাউন্সিলের সদস্য হয়ে সেইবারেই সরকারের বিরুদ্ধে ভোট দিলেন, এবং সেই বছরেই ৪৬ বৎসর বয়সে এ-এন-সি'তে যোগ দিলেন। ১৯৫০ সালে যুবলীগের প্রচেষ্টায় লুটুলি নাটাল প্রদেশে এ-এন-সি'র সভাপতি নির্বাচিত হলেন। ক্রমে আলবার্ট লুটুলি

১৯৫০'এর দশকের শান্তিপূর্ণ গণআন্দোলনের বিশ্ববিখ্যাত প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন। গান্ধীপন্থী খ্রীস্টান শান্তিবাদী লুটুলি আফ্রিকান গ্রামাঞ্চলের ভক্তিভাজন জনপ্রিয় নেতা ছিলেন। তিনি সঙ্কল্পে দৃঢ় ও অবিচল ছিলেন, অন্যায়ের সঙ্গে অসহযোগিতার মধ্যে রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে আপোস করার সঙ্কট তাঁর জীবনে আসেনি। তাঁর সঙ্গে একত্র চলতে যুবলীগের সংগ্রামীরা বা কমিউনিস্ট মতাবলম্বীরা অসুবিধা বোধ করেননি।

১৯৫২ সালের নভেম্বরে সরকার লুটুলিকে গোষ্ঠীপ্রধানের পদ থেকে বরখাস্ত করে। তার এক মাস পরে লুটুলি এ-এন-সি'র সভাপতি নির্বাচিত হন। সরকার তাঁর ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী ক'রে কার্যতঃ তাঁর গ্রামে তাঁকে গণ্ডীবদ্ধ করে রাখে। ১৯৫৬ সালের ডিসেম্বরে 'রাষ্ট্রদ্রোহ ও কমিউনিস্ট চক্রান্ত' মামলায় তিনি অন্যতম প্রধান আসামী। সে মামলায় ছাড়া পাবার পর আবার নিষেধাজ্ঞা। ১৯৬১ সালের ডিসেম্বরে লুটুলিকে শান্তির জন্য ১৯৬০ সালের নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়; নোবেল পুরস্কার কমিটিই তার ফলে সম্মানিত হয়েছিল। ১৯৬৭ সালের ২১শে জুলাই নিষেধাজ্ঞার গণ্ডীবদ্ধ অবস্থায় একটা রেললাইন পার হতে গিয়ে আকস্মিকভাবে এক মালগাড়ির ধাক্কায় আলবার্ট লুটুলির জীবনান্ত হয়। সরকারের সমস্ত ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে দূরদূরান্ত থেকে ৭০০০ মানুষ লুটুলির সমাধিক্ষেত্রে শ্রদ্ধানিবেদন করতে এসেছিল।

॥ দুই ॥

১৯৫০ সালের ২৬শে জুন তারিখের হরতাল-ধর্মঘটের পর এ-এন-সি'র নতুন সম্পাদক ওআলটার সিসুলুর সামনে প্রধান প্রশ্ন, আন্দোলনের পরবর্তী পদক্ষেপ কি হবে? ওআলটার দেখলেন আন্দোলন বিস্তৃত করতে হলে এবং যথাযথভাবে সংগঠিত করতে হলে সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদের গণ্ডী ছাড়তে হবে। এ সময়ে আফ্রিকান

মহলে সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদীদের আচরণ প্রায় শাসককুলের পরোক্ষ সমর্থন হয়ে দাঁড়াচ্ছিল।

ওআলটার আন্দোলনের পরবর্তী স্তরে সর্বজাতির মানুষকে ডাক দেবার প্রস্তাব করলেন, এবং ভারতীয় কংগ্রেস ও গণতান্ত্রিক বামপন্থী শ্বেতাঙ্গ সংগঠনগুলির সঙ্গে যৌথ আন্দোলন গড়ার প্রস্তাব করলেন। নেলসন মাণ্ডেলা নাকি প্রথমে এতে আপত্তি করেছিলেন, কিন্তু তিনিও সম্মতি জানালেন।[৩]

মনোভাবের পরিবর্তনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছিল। এ সময়ে এ-এন-সি'র শক্তিবৃদ্ধি এবং আফ্রিকান নেতাদের সংগ্রামী যোগ্যতা সম্বন্ধে আস্থাবৃদ্ধি একদিকে ভারতীয় ও শ্বেতাঙ্গ প্রগতিশীল নেতাদের আচরণে একটা সূক্ষ্ম পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। তাঁদের সমস্ত সদিচ্ছা ও শুভবুদ্ধি সত্ত্বেও আফ্রিকানদের সঙ্গে আচরণে, তাঁদের অজ্ঞাতসারেই হয়তো, মুরুব্বিয়ানার ভঙ্গী এসে যেত, নাবালকের প্রতি অভিভাবকের সুর এসে যেত ; সেই ভঙ্গী ও সুর এ সময়ে কমে গিয়েছিল। অপরদিকে নবীন আফ্রিকান নেতারা এ ব্যাপারে খুব স্পর্শকাতর ছিলেন, খানিকটা সন্দেহবাতিকও ছিল ; নিজেদের শক্তির সন্ধান পেয়ে তাঁদের আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই স্পর্শকাতরতা ও সন্দেহবাতিক কমছিল।

১৯৫১ সালের জুন মাসে এ-এন-সি'র কার্যকরী সমিতিতে সিস্‌লুর প্রস্তাব গৃহীত হবার পর এ-এন-সি ও ভারতীয় কংগ্রেস-এর এক যুক্ত কমিটি (জয়েণ্ট প্ল্যানিং কাউন্সিল) আন্দোলনের খসড়া কার্যক্রম রচনা করল। এই কমিটিতে ছিলেন জেম্‌স্ মোরোকা, ইউসুফ দাদু, ইউসুফ কাছালিয়া, জন মার্কস এবং ওআলটার সিস্‌লু।[৪] ১৯৫১ সালের ডিসেম্বরে এ-এন-সি'র সম্মেলনে এই কার্যক্রম অনুমোদিত হবার পর প্রধানমন্ত্রীর কাছে চিঠি লেখা হল—'অন্যায় আইন বাতিল করার দাবী পূরণ না হলে আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হবে।'

বহু অন্যায় আইনের মধ্যে নেতারা আশু আক্রমণের লক্ষ্য

হিসেবে কয়েকটাকে বেছে নিয়েছিলেন। ভারতে গান্ধীজী যেমন লবণ আইন বেছে নিয়েছিলেন, এখানে তেমনি বেছে নেওয়া হয়েছিল 'পাস্'-আইন, পৃথকীকরণ আইন, প্রত্যেক মানুষের পরিচয় নথিভুক্ত করার আইন, এবং গরুমহিষের সংখ্যা সীমাবদ্ধ করার আইন।

দেশের বিভিন্ন শহরে বড় বড় জনসভায় মোরোকা, দাদু, সিসুলু, নাইকার, জন মার্কস, মোজেস কোটানে, ইউসুফ কাছালিয়া প্রভৃতি আন্দোলনের কার্যক্রম ব্যাখ্যা করলেন। নেলসন মাণ্ডেলা স্বেচ্ছাব্রতী বাহিনীর প্রধান নিযুক্ত হলেন, কাছালিয়া তাঁর সহকারী। এর মধ্যে সরকারী নিষেধাজ্ঞা আসতে লাগল নানারকম।

সরকার ছাড়াও অন্য বিরোধী শক্তি দেখা যেতে লাগল। এ-এন-সি'র প্রধান নেতাদের মধ্যে ডাঃ ক্ষুমা, সেলোপে থেমা প্রভৃতি ভারতীয়দের সঙ্গে এত ঘনিষ্ঠ সংযোগের বিরোধিতা করে স্বতন্ত্র গ্রুপ হিসেবে দাঁড়ালেন। আরেকদল সরকার-ভক্ত প্রাচীনপন্থীদের দিয়ে 'বাণ্টু ন্যাশনাল কংগ্রেস' নামে একটা সংগঠন বানানো হল ; এই সংগঠনের নেতা অবশ্য কিছুদিন পরেই চুরি-জুয়াচুরি ও জালিয়াতীর দায়ে ধরা পড়ে গেলেন। আর, অতি-বাম ভঙ্গিমা নিয়ে বিরোধিতা করতে থাকলেন কেপ প্রদেশের 'নন্-ইউরোপীয়ান ইউনিটি মুভ্মেণ্ট' নামক সংগঠন। এ সংগঠন ক্ষুদ্র হলেও উচ্চভাষী ও তীক্ষ্ণভাষী সংগঠন, এবং এর নেতারা ত্রৎস্কীবাদী বলে পরিচিত ছিলেন। এঁরাও ভারতীয়দের সঙ্গে সহযোগিতার বিরোধিতা করছিলেন ; এঁদের বক্তব্য, ভারতীয়রা অধিকাংশই বুর্জোয়া ব্যবসাদারী বুদ্ধিতে চলে, তাদের সঙ্গে সহযোগিতা নীতিবিহীন সুবিধাবাদ। এ-এন-সি'র প্রস্তাবিত যে কোন কার্যক্রমেরই এঁরা বিরোধিতামূলক সমালোচনা করতেন অনেক উগ্র কথাবার্তা বলে ; কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এঁদের ভূমিকা হত নঙর্থক, আন্দোলনে নিরুৎসাহ ও নিষ্ক্রিয়তা সৃষ্টির ভূমিকা।[৫]

১৯৫২ সালের ২৬শে জুন আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হল। ট্রান্সভালে গান্ধীবাদী ভারতীয় নেতা নানা সীতা ৪২ জন আফ্রিকান

ও ১০ জন ভারতীয়কে নিয়ে বিনা অনুমতিতে এক এলাকায় ঢুকে পৃথকীকরণ আইন ভঙ্গ করে গ্রেপ্তার হলেন। নিউ ব্রাইটন রেলওয়ে স্টেশনে এ-এন-সি'র নেতা ও কমিউনিস্ট ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠক রেমণ্ড মাহ্‌লাবা ২৫ জন পুরুষ ও ৩ জন মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে 'কেবলমাত্র-শ্বেতাঙ্গদের-জন্য' চিহ্নিত প্রবেশপথ দিয়ে ঢুকে গ্রেপ্তার হলেন। জুন মাসের পাঁচদিনে গ্রেপ্তার হল ১৪৬ জন, জুলাই মাসে ১৫০৪ জন, অগস্টে ২০১৫, সেপ্টেম্বরে ২২৫৮, অক্টোবরে ২৩৫৪ জন। তারপর আন্দোলনের প্রথম পর্ব থিতিয়ে গেল—নভেম্বর-ডিসেম্বরে মাত্র ২৮০ জন কারাবরণ করেছিল।[৬] গ্রামাঞ্চলে আন্দোলন বিস্তার লাভ করেনি। আর, শ্রমিকরা এ ধরনের আইন-অমান্য আন্দোলনে খুব কমই যোগ দিতে পারে। শিক্ষিত বৃত্তিজীবী, ছাত্র, যুবক, এবং সর্বক্ষণের জন্য রাজনৈতিক কর্মে নিযুক্ত মানুষেরাই এ ধরনের সংগ্রামের প্রধান উপাদান ছিল।

কিন্তু নেতারা জেলে যাচ্ছিলেন, মেয়েরা জেলে যাচ্ছিলেন, দলে দলে মানুষ জেলে যাচ্ছিলেন—তাতে সাড়া জেগেছিল। এ-এন-সি'র সভ্যসংখ্যা কয়েকমাস আগে ছিল ৭০০০, অক্টোবর নাগাদ সে সংখ্যা হল এক লক্ষ।[৭] বিশ্বরাষ্ট্রসংঘে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের বিরুদ্ধে নিন্দাবাদের ঝড় বইতে থাকল। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে এ-এন-সি'র আন্দোলনের প্রতি সৌহার্দ্য ও শুভেচ্ছার বার্তা আসতে থাকল।

১৮ই অক্টোবর অকস্মাৎ নিউ ব্রাইটন রেলওয়ে স্টেশনে এক শ্বেতাঙ্গ পুলিস দুইজন আফ্রিকানকে গুলী করল। তারা নাকি একটা রঙের টিন চুরি করেছিল। ক্ষিপ্ত জনতা রেলওয়ে স্টেশন আক্রমণ করল। দাঙ্গা বেধে গেল। ৭ জন আফ্রিকান এবং ৪ জন শ্বেতাঙ্গ নিহত হল। এ-এন-সি দাঙ্গার নিন্দা করে তদন্ত দাবী করল। সরকার কর্ণপাত করল না। নিউ ব্রাইটনে একদিন প্রতীক ধর্মঘট হল, শতকরা ৯০ ভাগ মানুষ কাজে গেল না।

এরপর ইস্ট লণ্ডনে পুলিস একটা জনসভাকে অকারণে আক্রমণ

করে প্রচণ্ড হাঙ্গামা বাধাল। ৮ই নভেম্বর কিম্বার্লিতে দাঙ্গা বাধল—১৪ জন আফ্রিকান (তার মধ্যে ২ জন মেয়ে) পুলিসের গুলীতে নিহত হল। কোনক্ষেত্রেই তদন্ত হল না। লোকের দৃঢ় ধারণা হল পুলিসের চর লাগানো হয়েছে, উসকানি দিয়ে দাঙ্গাহাঙ্গামা বাধানোর জন্য।

এই অবস্থায় আন্দোলন থিতিয়ে এল। এবার এগিয়ে এলেন মণিলাল গান্ধী, গান্ধীজীর পুত্র। আন্দোলনকারীদের অধিকাংশ যথার্থ সত্যাগ্রহের মনোভাব নিয়ে আসেননি বলে সমালোচনা করে মণিলাল এই আন্দোলনের সঙ্গে লিপ্ত না হয়ে কয়েকজন বাছাই-করা সঙ্গী নিয়ে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ করছিলেন, নিষিদ্ধ জায়গায় প্রবেশ করে দাঁড়িয়ে থাকছিলেন। পুলিস তাঁকে ছেড়ে রেখেছিল। ডিসেম্বরে মণিলালের সঙ্গে এসে যোগ দিলেন প্যাট্রিক ডানকান, এমিল সাখ্‌সের পুত্র অ্যালবি সাখ্‌স্‌, ফ্রেডা ট্রাউপ্‌ প্রভৃতি কয়েকজন শ্বেতাঙ্গ নরনারী। প্যাট্রিক ডান্‌কান দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন গভর্ণর-জেনারেল সার প্যাট্রিক ডানকানের ছেলে; বাসুটোল্যাণ্ডে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীর পদে ইস্তফা দিয়ে এসে তিনি আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। প্যাট্রিক ক্রাচ্‌ ছাড়া চলতে পারতেন না। বৃদ্ধ মণিলালের সঙ্গে ক্রাচ্‌-বগলে তরুণ প্যাট্রিক ১৪ জন আফ্রিকান, ১৮ জন ভারতীয় এবং ৭ জন শ্বেতাঙ্গ স্বেচ্ছাব্রতীকে নিয়ে আইন ভঙ্গ করে 'জের্মিস্টন নেটিভ লোকেশন'-এ প্রবেশ করে বে-আইনী জনসভা করলেন। সবাই গ্রেপ্তার হয়ে দণ্ডিত হলেন।[৮]

এ সময়ে আইন-অমান্যের অপরাধে ৩০০ পাউণ্ড জরিমানা বা তিন বছরের কারাদণ্ড এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বেত্রাঘাত পর্যন্ত শাস্তি হচ্ছিল। তথাপি মানুষ আইন-অমান্য করতে এগিয়ে আসছিল। কোনদিন যারা এসব কাজের কথা ভাবেনি, তেমন মানুষও যেন এর মধ্যে নিজের জীবনের একটা অর্থ খুঁজে পেয়ে তার টানে সব ছেড়ে এগোবার ভরসা পাচ্ছিল।

এই রকম একজন মানুষ লিলিয়ান ন্‌গোঈ। তুই সন্তানের জননী চল্লিশ বছর বয়সের স্বামীহীনা লিলিয়ানের জন্ম হয়েছিল তুর্দশার মধ্যে, জীবন কাটছিল আশা-ভরসাহীন তুর্দশার মধ্যে। এক পোশাক-কারখানায় কাজ করে সংসার চালানো; অর্লাণ্ডো বস্তি-শহরে একটি ঘরের মধ্যে বাপ-মায়ের সঙ্গে তুটি বাচ্ছা নিয়ে বাস; গার্মেণ্ট ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের সদস্য হিসেবে মাঝে মাঝে শ্রমিকদের তুর্দশা সম্বন্ধে কথাবার্তা—এই ভাবেই জীবন কাটছিল। এর মাঝে এল 'অন্যায়-আইন অমান্য আন্দোলন'। আইন-অমান্যকারী মানুষগুলোকে দেখে লিলিয়ান যেন জেগে উঠলেন। কাগজপত্রগুলো খোঁজ করে করে পড়ে দেখলেন। একদিন দেখলেন পুলিসের গাড়ি এল, মানুষগুলোকে টেনে তুলল। কোথা থেকে এল মানুষগুলোর এই শান্ত সাহস? "তখন আমি নিজেকেই জিজ্ঞাসা করলাম, 'এই বিরাট ব্যাপারটা কি?'"

লিলিয়ান বাসায় ফিরে মাকে বললেন, 'আমি কাল আইন-অমান্য করতে যাব।' লিলিয়ানের ছোট মেয়ে তখন হাসপাতালে। মা বললেন, 'ওর দিকে দেখবে না?' লিলিয়ান অর্লাণ্ডোর কাছে পাহাড়ের মাথায় মাকে নিয়ে গেলেন, অর্লাণ্ডোর ঘরে ঘরে ছোট ছোট বাতির অসংখ্য আলো দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওদের দিকে দেখব না?' মা অভিভূত হয়ে গিয়েছিলেন, বললেন, 'তুমি যাও, তোমার মেয়েকে আমি দেখব।'

কয়েকদিন পরেই লিলিয়ান আরো চারটি মহিলাকে সঙ্গে নিয়ে জোহানেসবার্গ পোস্ট-অফিসে ঢুকলেন। 'কেবলমাত্র শ্বেতাঙ্গদের জন্য চিহ্নিত' জানলার সামনে টেলিগ্রামের ফর্ম নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর কাছে টেলিগ্রাম লিখলেন—"ডক্টর মালান, আপনার আইনগুলো প্রত্যাহার করুন, না হলে মনে করুন জার্মানীতে হিটলারের এবং ইটালীতে মুসোলিনীর কি দশা হয়েছিল...।' লিলিয়ান ও তাঁর-সঙ্গিনীরা গ্রেপ্তার হলেন। লিলিয়ানের মেয়ে সুস্থ হয়ে গিয়েছিল।

ছাড়া পাবার পর লিলিয়ান অর্লাণ্ডোর মেয়েদের মাতিয়ে তুললেন। ১৯৫৪ সালের মধ্যে তিনি এ-এন-সি'র মহিলা শাখার প্রেসিডেন্ট, এবং এ-এন-সি'র কার্যকরী সমিতির সদস্য হয়ে উঠলেন। সর্বত্র লিলিয়ানের ডাক পড়ে। ভারতীয় নৃত্যের মুদ্রার ভঙ্গীতে লিলিয়ানের দুই হাত যেন কথা বলত, তাঁর বক্তৃতা শুধু শোনার জিনিস নয় দেখার জিনিসও ছিল। তেজী, প্রাণচঞ্চল, হাসিতে উজ্জ্বল, ক্রোধে কুঞ্চিত-ভ্রূ, আবেগে দৃপ্ত লিলিয়ান '৫০-এর দশকে প্রাণের প্রতীক।

লিলিয়ানকে ১৯৫৬ সালে পাঁচ মাস আটক রাখা হয়। তার মধ্যে ৭১ দিন নির্জন কক্ষে আটক, ৯০ দিন আইন অনুসারে। এই ৭১ দিনের পর তাঁর স্বাস্থ্য বলতে আর বিশেষ কিছু ছিল না। তারপর বার-বার গ্রেপ্তার ও মামলার পর ১৯৬২ সালে তাঁর ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী হয়; অর্লাণ্ডো বস্তির ঘর ছেড়ে কোথাও যাওয়া নিষেধ, কারু সঙ্গে কথা বলা নিষেধ। ১১ বছর এই নিষেধাজ্ঞা জারী ছিল। ১৯৭৩ সালে লিলিয়ানের বয়স যখন ৬২, তখন হঠাৎ একদিন নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হল।[১০] ১৯৭৩ সালে ফর্স্টার-রাজ আফ্রিকানদের সঙ্গে বিরোধ-লাঘবের কূটকৌশল দেখাচ্ছিল, সম্ভবতঃ সেই কূট-কৌশলের একটা চাল ছিল এটা।

॥ তিন ॥

১৯৫২ সালের ২রা ডিসেম্বর জেম্‌স্ মোরোকা, ওআলটার সিস্‌লু, নেলসন মাণ্ডেলা এবং আরো ১৭ জনকে আদালতে কাঠগড়ায় তোলা হল 'কমিউনিজম-দমন আইন' অনুসারে মামলা জুড়ে। সকলেরই নয় মাস সশ্রম কারাদণ্ড হল। এই মামলাতেই বিচারক মন্তব্য করেছিলেন, 'আসামীদের বিরুদ্ধে যেসব অভিযোগ করা হয়েছে তার মধ্যে কমিউনিজমের কিছু নেই, তবুও আইনে যাকে কমিউনিজম বলা হয়েছে, এরা সেই স্ট্যাটুটরি কমিউনিজমের

অপরাধে অপরাধী।' বিচারক দণ্ডদান করেও দুই বৎসর সে দণ্ড মুলতুবী করে দিয়েছিলেন, তার মধ্যে নতুন অপরাধ না করলে দণ্ড মকুব হবে (সাস্‌পেণ্ডেড সেন্‌টেন্‌স্)। এ সময়ে অনেক মামলায় আদালত এই রকম রায় দিয়েছিল।

এবার সরকার আর মামলা করতে গেল না। ৫২ জন নেতৃস্থানীয় মানুষের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারী হল—এ-এন-সি'র কোন কাজকর্মে তারা যোগ দিতে পারবে না, সভায় হাজির থাকতে পারবে না, বক্তৃতা বা লেখা নিষেধ। নেলসন মাণ্ডেলার ওপর বাড়তি হুকুম—দুই বৎসর জোহানেসবার্গ জেলার বাইরে যেতে পারবে না। জন মার্কস, কোটানে ও অন্যান্য কমিউনিস্টদের ওপর বিবিধ নিষেধাজ্ঞা আগেই জারী হয়েছিল।

এই মামলার সময় জেম্‌স্ মোরোকার সঙ্গে যুবলীগের নেতাদের বিচ্ছেদ ঘটল। এঁদের সবার জন্য উকীল দাঁড়িয়েছিলেন ব্র্যাম্ ফিশার ও আরো কয়েকজন। মোরোকা পৃথক্ উকীল নিয়োগ করে নিজের মামলা আলাদা চালালেন, তিনি যে কোন রকমেই 'কমিউনিস্ট' নন তা প্রমাণ করার অনেক চেষ্টা করলেন। তাঁর শাস্তি কিছু কম হলো না, কিন্তু এই করে তিনি আন্দোলনের কাছে মর্যাদা হারালেন।

১৯৫২ সালের ডিসেম্বরে এ-এন-সি'র সম্মেলনে জেম্‌স্ মোরোকার জায়গায় প্রেসিডেন্ট-জেনারেল নির্বাচিত হলেন আলবার্ট লুটুলি। ১৯৫৩ সালের জানুয়ারী মাসে সরকার 'পাবলিক সেফ্‌টি অ্যাক্ট' এবং 'ক্রিমিনাল ল অ্যামেণ্ডমেণ্ট অ্যাক্ট' পাস্ করিয়ে আরো দমন-পীড়ন ও নিষেধাজ্ঞার ব্যবস্থা করল। আইন-অমান্য আন্দোলন স্থগিত হল, গোটা পরিস্থিতির পুনর্বিচার ও উপযোগী সংগ্রাম-পদ্ধতি স্থির করার জন্য সময় নেওয়া হল। এই আন্দোলনে মোট সাড়ে আট হাজারের বেশি মানুষ জেলে গিয়েছিল। আফ্রিকান সংগ্রামীদের আত্মবিশ্বাস প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

১৯৫৩-৫৪ সালে বিশ্বশান্তি সম্মেলন, বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশন সম্মেলন, বিশ্ব যুব উৎসব, প্রভৃতি নানা উপলক্ষে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে প্রতিনিধি হিসেবে বা আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে অনেক মানুষ সোভিয়েট ইউনিয়ন, পূর্ব ইউরোপ এবং চীনে যাবার সুযোগ পেয়েছিলেন। দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে লিলিয়ান ন্গোয়ী ১৯৫৪ সালে 'ওয়ার্ল্ড মাদার্স কনফারেন্স'-এ প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে সুইজার্ল্যাণ্ডে গেলেন ; যাওয়ার পথে উগাণ্ডা, রোম, লণ্ডন দেখলেন ; সুইজার্ল্যাণ্ড থেকে পূর্ব জার্মানী, চীন এবং ফেরার পথে সোভিয়েট রাশিয়া দেখে ফিরলেন। ভারতীয় কমিউনিস্ট যুবনেতা আহম্মদ কাথ্রাডা ১৯৫১ সালেই বিশ্ব যুব উৎসব উপলক্ষে বার্লিন গিয়েছিলেন, সেখান থেকে বুডাপেস্ট গিয়ে বিশ্ব গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন-এর কার্যালয়ে প্রায় নয় মাস কাজ করলেন ; ১৯৫৩ সালে কাথ্রাডা বিশ্ব যুব ফেডারেশনের কার্যকরী সমিতির সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। ওআলটার সিসুলু ১৯৫৩ সালে চীন এবং সোভিয়েট রাশিয়া দেখে ফিরলেন।

লিলিয়ান এবং ওআলটার উভয়েই চীন দেখে দারুণ অনুপ্রেরণা ও আবেগ নিয়ে ফিরেছিলেন। চীন আফ্রিকার মতই দরিদ্র ছিল, ১৯৫৩ সালে দারিদ্র্যের পুরনো চিহ্নগুলো তখনো দেখা যাচ্ছিল ; তারই মাঝে বিপ্লবের বিশাল সৃষ্টিকর্ম এঁদের হৃদয়ে নতুন স্পন্দন জাগিয়েছিল। সোভিয়েট রাশিয়ার চেয়েও চীন এঁদের কাছে একটু বেশি নিকট, একটু বেশি আপন মনে হয়েছিল।[১১]

১৯৫৩-৫৪ সালে আন্দোলনের মধ্যে নানা বিষয় নিয়ে মতবাদগত তর্কবিতর্ক আরেক স্তরে উঠল, তার মধ্যে আন্তর্জাতিক রাজনীতির একাধিক বিষয় ছিল। আন্দোলনের শান্তিপূর্ণ পদ্ধতি, বিভিন্ন জাতির যুক্তফ্রন্ট, শ্রেণী-সংগ্রাম না জাতীয় ঐক্য, ইত্যাদি সবই বিতর্কের বিষয়। আন্দোলনের মোড়-ঘোরার আরেকটা সঙ্কট এসেছিল এ সময়।

অন্যদিক থেকে আন্দোলন দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছিল। ক্রমাগত গ্রেপ্তার, মামলার হয়রানি, নিষেধাজ্ঞা, খানাতল্লাসী, চাকরী থেকে বরখাস্ত, ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ, আর গোয়েন্দা-পুলিসের শাসানী আন্দোলনের বহু কর্মীকে প্রায় অচল অবস্থায় এনে দিয়েছিল।

আরেক রকম সমস্যা দেখা দিল ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার ব্যবস্থা নিয়ে। ১৯৫৩ সালে 'বান্টু এডুকেশন অ্যাক্ট' জারী হবার পর ১৯৫৪ সালের ডিসেম্বরে এ-এন-সি'র বার্ষিক সম্মেলনে এই নয়া-হিটলারী শিক্ষাব্যবস্থা বয়কট করার আহ্বান জানানো হল। স্বভাবতই আফ্রিকান বাপ-মা প্রশ্ন করল, ছেলেমেয়েগুলোকে স্কুল থেকে ছাড়িয়ে আনার পর বিকল্প শিক্ষাব্যবস্থার আয়োজন কোথায়? আফ্রিকান শিক্ষকদেরও প্রশ্ন, সরকারী বান্টু স্কুলের চাকরী ছেড়ে দিয়ে এসে তারপর কি করব? এসব প্রশ্নের কোন সদুত্তর ছিল না। তবুও কয়েকজন শিক্ষক চাকরী ছেড়ে দিলেন, ৭০০০ ছেলেমেয়ে স্কুল ছেড়ে দিল। দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার মাইকেল স্কটের দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রবেশ নিষেধ করে দিয়েছিল; স্কট লণ্ডনে 'আফ্রিকা ব্যুরো' নামে এক প্রতিষ্ঠান গড়েছিলেন, সেখান থেকে চাঁদা তুলে টাকা-পয়সা পাঠালেন; প্রধানতঃ এই পয়সা দিয়ে ওই ৭০০০ ছেলেমেয়ের জন্য 'ক্লাব' প্রতিষ্ঠা করে তার মারফৎ কিছু লেখাপড়া শেখানোর ব্যবস্থা হল। ক্রমাগত পুলিসী হামলা সহ্য করেও এই 'ক্লাব'গুলো বছর-দুই চালানো হল। তারপর আর পারা গেল না।[১২]

১৯৫৫ সালে অধ্যাপক ম্যাথুজ প্রস্তাব করলেন গণতন্ত্রী সংগঠন ও প্রগতিশীল ব্যক্তিদের নিয়ে 'কংগ্রেস অব্ দি পিপ্ল' নামে এক বিশাল গণসম্মেলন করা হোক; সেই সম্মেলন থেকে এক ঘোষণাপত্রে আন্দোলনের লক্ষ্য ও মূল দাবীগুলি নির্দিষ্ট করে দেওয়া হোক; তারপর সেই অনুসারে আন্দোলনের নতুন কর্মসূচী স্থির করা হোক। এই প্রস্তাব গৃহীত হল। এ-এন-সি'র উদ্যোগে ভারতীয় কংগ্রেস,

কংগ্রেস অব্ ট্রেড ইউনিয়নস্ (SACTU), কংগ্রেস অব্ ডেমোক্রাটস্ (শ্বেতাঙ্গ সংগঠন, সদস্যরা বেশির ভাগ প্রাক্তন কমিউনিস্ট), কালার্ড পিপল্স্ অর্গানাইজেশন (মিশ্রবর্ণ সংগঠন) সমবেত হলেন। অন্য শ্বেতাঙ্গ সংগঠনকেও ডাকা হয়েছিল, তারা এল না। ফাদার ট্রেভর হাড্ল্স্টন এবং আর কয়েকজন খ্রীস্টান মিশনারী এলেন। লুটুলি, দাদু ইত্যাদি অনেক নেতাই নিষেধাজ্ঞার কবলে—তাঁরা নেপথ্যে রইলেন।

২৫শে জুন তারিখে জোহানেসবার্গের কাছে ক্লিপ্টাউন গ্রামে গণসম্মেলন শুরু হল। তিন হাজার প্রতিনিধির মধ্যে দুই হাজারের কিছু বেশি আফ্রিকান; ভারতীয়, মিশ্রবর্ণ এবং শ্বেতাঙ্গ দুই-তিনশো ক'রে। উৎসব-অনুষ্ঠানের মতো সম্মেলন। দুইদিন আলোচনার পর ২৬শে জুন মুক্তিসনদ গৃহীত হল—দক্ষিণ আফ্রিকার জনসাধারণের অধিকার-দাবীর ঘোষণা, 'ফ্রীডম্ চার্টার'।

এই ঘোষণাপত্রে বলা হল ঃ—

"আমরা, দক্ষিণ আফ্রিকার জনসাধারণ, আমাদের গোটা দেশকে এবং সারা পৃথিবীকে জানানোর জন্য ঘোষণা করছি যে,—

"দক্ষিণ আফ্রিকায় যারা বাস করে, কালো আর শাদা, দক্ষিণ আফ্রিকা তাদের সবার; এবং এদেশের সমস্ত জনসাধারণের ইচ্ছার ওপর যে সরকারের ভিত্তি রচিত নয়, তেমন কোন সরকার এদেশে ন্যায়সঙ্গতভাবে কোন কর্তৃত্বের দাবী করতে পারে না;

"ভূমি, স্বাধীনতা ও শান্তি আমাদের জনগণের জন্মগত অধিকার; অবিচার ও বৈষম্যের ওপর যার ভিত্তি, সেরকম এক সরকার সে অধিকার দস্যুর মতো হরণ করেছে; আমাদের দেশের সব মানুষ যতদিন পরস্পর ভ্রাতৃ-সম্পর্কে সমান-অধিকার ও সমান-সুযোগ নিয়ে বাস করতে না পারবে, ততদিন আমাদের দেশ কখনো সমৃদ্ধ ও স্বাধীন হবে না;

"গাত্রবর্ণভেদ, কৌলিকজাতিভেদ, নরনারীভেদ বা ধর্মবিশ্বাস-

ভেদের সবরকম বৈষম্য বিসর্জন দিয়ে সকল মানুষের জন্মগত অধিকার সুনিশ্চিত করতে পারে শুধুমাত্র এমন এক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র যার ভিত্তি সমস্ত জনসাধারণের ইচ্ছার ওপর স্থাপিত।

"অতএব আমরা, দক্ষিণ-আফ্রিকার জনসাধারণ, কালো আর শাদা সবাই মিলে—পরস্পরের সমান স্বদেশবাসী ভাই আমরা, এই মুক্তিসনদ নিজেদের বলে গ্রহণ করছি। আর আমরা শপথ করছি যে এই সনদে বিবৃত গণতান্ত্রিক পরিবর্তন-বিধান যতদিন না অর্জন করছি, ততদিন, সঙ্কল্পে বা সাহসে কার্পণ্য না ক'রে, আমরা সংগ্রাম চালিয়ে যাব।"

এই শপথের পর মূল লক্ষ্যগুলি উল্লেখ করা হয় এবং দশটি শ্লোগানে সেগুলির সারবস্তু নির্দেশিত হয়। শ্লোগানগুলি ছিল (১) শাসন চালাবে জনগণ, (২) সকল জাতি-সম্প্রদায়ের সমান অধিকার থাকবে, (৩) দেশের সম্পদ জনগণের ভোগে লাগবে, (৪) জমিতে যারা খাটে, জমি তাদের মধ্যে বিলি হবে, (৫) আইনের চোখে সবাই সমান হবে, (৬) সবার জন্য থাকবে মানবিক অধিকার, (৭) সকলে কাজ পাবে ও কাজের নিরাপত্তা থাকবে, (৮) শিক্ষা ও সংস্কৃতির দ্বার সকলের জন্য উন্মুক্ত থাকবে, (৯) সবার জন্য থাকবে বাসস্থান, সামাজিক নিরাপত্তা এবং স্বাচ্ছন্দ্য, (১০) শান্তি ও সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠিত হবে।

বিশদ দাবীগুলির মধ্যে দৃষ্টান্ত হিসেবে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য—(১) প্রত্যেক মানুষের ভোট থাকবে এবং নির্বাচনপ্রার্থী হবার অধিকার থাকবে, (২) সবরকম 'আপার্টহেইট' আইন ও প্রথার অবসান করতে হবে, (৩) ভূগর্ভস্থ সমস্ত খনিজ সম্পদ, ব্যাঙ্কসমূহ এবং একচেটিয়া শিল্পপ্রতিষ্ঠান জনগণের সম্পত্তিতে পরিণত করতে হবে, (৪) সমস্ত জমি কৃষকদের মধ্যে পুনর্বণ্টন করতে হবে, জাতিবর্ণ-বৈষম্যমূলক ভূমিবণ্টন নাকচ করতে হবে, (৫) দেশের সর্বত্র চলাচল ও বসবাসের অবাধ স্বাধীনতা থাকতে হবে, (৬) বিনা বিচারে

কাউকে বন্দী করা, দেশান্তরে পাঠানো বা এলাকা-আটক করা চলবে না, (৭) মতামত প্রকাশের, সভাসমিতি সংগঠনের, একত্র জড়ো হওয়ার, লেখা প্রকাশ করার অধিকার আইনের দ্বারা সুরক্ষিত হতে হবে, (৮) যখন-তখন মানুষের বাড়িঘরে পুলিসের প্রবেশ নিষিদ্ধ করতে হবে, (৯) পাস্-আইন বা অন্য যেসব আইন গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করে, সেগুলোর অবসান ঘটাতে হবে, (১০) ট্রেড ইউনিয়ন গড়ার অধিকার দিতে হবে, (১১) সকলের কাজের অধিকার ও কাজ করার কর্তব্য রাষ্ট্রের দ্বারা স্বীকৃত হতে হবে, বেকার অবস্থায় পুরো সাহায্য পাবার অধিকার দিতে হবে, (১২) কম্পাউণ্ড লেবার, কন্ট্রাক্ট-লেবার, 'টট্-সিস্টেম' প্রভৃতি ব্যবস্থা অবসান করতে হবে, (১৩) সমস্ত শিশুর জন্য অবৈতনিক, বাধ্যকরী ও সার্বজনীন শিক্ষা দিতে হবে সমানভাবে, (১৪) সবার জন্য রোগে চিকিৎসা, শ্রান্তিকালে বিশ্রাম, বার্ধক্যে অবসর মিলবে ; শিশুদের যত্নের ব্যবস্থা হবে।[১৩]

সম্মেলনের শেষের দিকে সশস্ত্র পুলিস এল। কাগজপত্র যা পেল, বাজেয়াপ্ত করল ; তারপর রাইফেল ধরে বসে রইল। সামান্য আহুতি পেলেই সেদিন ভীষণ এক আগুন জ্বলে উঠত। নেতারা অসীম ধৈর্যসহকারে ব্যাপারটা সামলালেন। সম্মেলনের আসল কাজ হয়ে গিয়েছিল। পুলিসের সামনে হাল্কা রঙ্গরসিকতা-মেশানো দু'একটা বক্তৃতা হল, গান হল, ব্যাণ্ড বাজানো হল ; সম্মেলন শেষ করে প্রতিনিধিরা চলে গেলেন। কাগজপত্রগুলো পুলিস পরে রাষ্ট্রদ্রোহের মামলায় প্রমাণ হিসেবে দাখিল করেছিল।

মুক্তিসনদের দুটি বিষয় নিয়ে পরে বিতর্ক ও মতান্তর হয়েছিল। প্রথম বিষয়টি বিভেদের উপলক্ষ্য হয়েছিল। প্রথম বিষয়টি ছিল মুক্তিসনদের একেবারে গোড়ার কথা—দক্ষিণ আফ্রিকা শাদা কালো সবার দেশ। আফ্রিকান সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদীরা এতে আপত্তি তুলেছিলেন। তাঁদের নীতি ছিল, দক্ষিণ আফ্রিকা কৃষ্ণকায় আফ্রিকানদেরই দেশ ; শ্বেতাঙ্গরা ও ভারতীয়রা এদেশে থাকতে

পারে, কিন্তু দেশটাকে বহুজাতিক দেশ বলা চলবে না, এবং রাষ্ট্রটা আফ্রিকান রাষ্ট্র হতে হবে ; কেউ কেউ আরো উগ্র হয়ে সব শ্বেতাঙ্গ ও ভারতীয়দের তাড়াবার কথাও বলতেন।

বিতর্কের দ্বিতীয় বিষয়টি ছিল—খনি ব্যাঙ্ক ও একচেটিয়া শিল্পের জাতীয়করণের দাবী। এতে আপত্তি তুলেছিলেন রক্ষণশীল প্রাচীনপন্থী ও পাশ্চাত্যপন্থীরা এবং 'কমিউনিস্ট-প্রভাব'বিরোধী জাতীয়তাবাদীরা।

॥ চার ॥

১৯৫৫ সালের ২৮শে জানুয়ারী বিচারমন্ত্রী পার্লামেন্টে সংবাদ দিলেন যে কমিউনিজম-দমন আইন অনুসারে সে পর্যন্ত নিষিদ্ধ ব্যক্তির সংখ্যা ১৫৮ ; এঁদের কোনরকম জমায়েতে উপস্থিত থাকা নিষিদ্ধ হয়েছে, বক্তৃতা করা বা লিখিত কিছু প্রকাশ করা নিষিদ্ধ, এঁদের কোন বক্তৃতা থেকে বা রচনা থেকে অন্য কারু কিছু উদ্ধৃতি দেওয়াও নিষিদ্ধ ; এঁদের মধ্যে ৯০ জন সরকার রচিত 'কমিউনিস্ট' তালিকাভুক্ত, বাকী ৬৮ জনের নাম ঐ তালিকায় ছিল না। তাছাড়া, ৮৮ জনকে ট্রেড ইউনিয়ন এবং অন্যান্য সংগঠন থেকে পদত্যাগ করতে হুকুম দেওয়া হয়েছে ; ৪৭ জনকে এই আইনে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।[১৪]

এক কমিউনিজম-দমন আইনেই এই। অন্যান্য আইনে দণ্ডপ্রাপ্ত, অভিযুক্ত ও গণ্ডীবদ্ধ আরো বহু মানুষ। প্রতিদিন তাদের সংখ্যা বাড়ছে।

মুক্তিসনদ ঘোষণার পর আন্দোলনের মধ্যে একদিকে নানাবিষয়ে তর্কবিতর্কই প্রধান কাজ হয়ে উঠেছিল। আন্দোলন পথ পাচ্ছিল না। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এ সময় ঠাণ্ডা লড়াই মাঝে মাঝে গরম হয়ে উঠছিল—এ-এন-সি'র কার্যকরী সমিতিতে সেই ঘটনাগুলো নিয়ে আলোচনাই অনেকটা সময় নিচ্ছিল।

খানিকটা অন্ধকার অবস্থা। তার মাঝে একঝলক আলো নিয়ে এল মেয়েরা। লিলিয়ান ন্‌গোঈ ছিলেন, নাটাল থেকে তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন পঁচিশ বছর বয়সের ডরোথি নায়েম্বে। ডরোথি ১৯৫২ সালে দু'বার জেল খেটে এসেছিলেন। তারপর কতবার যে গ্রেপ্তার, কারাদণ্ড আর নিষেধাজ্ঞা হল তা হিসেব করা শক্ত। ১৯৬৮ সালে গ্রেপ্তার হবার পর কমিউনিজম-দমন আইনে তাঁর ১৫ বৎসর কারাদণ্ড হয়েছিল—তিনি আজও বন্দিনী।[১৫]

রে আলেক্‌জাণ্ডার ছিলেন। লিথুয়ানিয়া থেকে তিনি এসেছিলেন শৈশবে। কেপ্ প্রদেশে এমিল সাখস্‌-এর গার্মেন্ট ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের এবং অন্যান্য ট্রেড ইউনিয়নের তিনি ছিলেম সংগঠকনেত্রী। ১৯৫৪ সালে তাঁর আহ্বানে আফ্রিকান, ভারতীয় ও শ্বেতাঙ্গ মেয়েরা এক সম্মেলনে মিলিত হয়ে "দক্ষিণ আফ্রিকা মহিলা ফেডারেশন" প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এ-এন-সি'র মহিলা-লীগ এবং ভারতীয় ও শ্বেতাঙ্গ মহিলা-সংগঠনগুলি এই ফেডারেশনে যুক্ত হয়েছিলেন। এই সম্মেলনের অল্পকাল পরেই নিষেধাজ্ঞা চাপল রে'র ওপর। তালিকাভুক্ত কমিউনিস্ট রুথ ফার্স্ট এবং তাঁর স্বামী জো স্লভো আগেই নিষেধাজ্ঞা পেয়েছিলেন।

ইংরেজীভাষী উদারনৈতিক মহলের শ্বেতাঙ্গ মেয়েদের এক পৃথক সংগঠন হয়েছিল 'ব্ল্যাক্ স্যাশ' নামে। এরা মেয়েদের সর্বজাতিক ফেডারেশনে যোগ দেয়নি। সরকার সংবিধান ভাঙছিল, এরা তার প্রতিবাদে কেপ প্রদেশে অনেকগুলো বড় বড় মিছিল করেছিল।

সরকার হুকুমজারী করেছিল, ১৯৫৬ সাল থেকে সমস্ত আফ্রিকান মেয়েদের 'পাস্' বহন করতে হবে। ফেডারেশনের সিদ্ধান্ত হল এই হুকুমের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ সংগঠিত করা হবে।

১৯৫৫ সালের অক্টোবরে ট্রান্সভালের মেয়েরা প্রিটোরিয়া চলল। বাস ভাড়া করা হয়েছিল, কিন্তু সরকার বাসগুলোকে লাইসেন্স দিল না। অনেক বেশি ভাড়া দিয়ে ট্রেনে যেতে হবে। ইংরেজ মেয়ে

হেলেন জোসেফ্ ছুটলেন মোটরগাড়ি নিয়ে—সবকটা কেন্দ্রে গিয়ে ফেডারেশনের নির্দেশ পৌঁছে দিলেন, যা হোক ক'রে ভাড়া জোগাড় কর, ট্রেনেই চল। টাকা উঠল। দু'হাজার মেয়ে প্রিটোরিয়ায় পৌঁছল, শান্তভাবেই বিক্ষোভ প্রদর্শন করে ঘরে ফিরল। স্বামীপুত্র-ভ্রাতারা উদ্বিগ্নভাবে ঘরে অপেক্ষা করছিল, মেয়েরা নিরুপদ্রবে বাড়ি ফিরল দেখে একটু আশ্বস্ত হল।

একই রকম বিক্ষোভ হল ডারবানে, কেপ টাউনে। ওআলটার সিসুলু মেয়েদের মিছিল দেখে বিস্মিত। জিজ্ঞাসা করলেন, কি করে এত সাহস পেল মেয়েরা? লিলিয়ান জবাব দিয়েছিলেন, "ছেলেরা পাস্-ব্যবস্থায় জন্ম থেকেই অভ্যস্ত হয়ে আছে, পাস্-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ওদের বিক্ষোভ নিস্তেজ। কিন্তু মেয়েদের ওপর নতুন করে চাপছে এই 'পাস্'। মেয়েরা একটা সোজা কথা ভাবছে—এখন তো স্বামীটি বাড়ির বাইরে গেলে ভাবতে হয় সন্ধ্যাবেলায় ও ফিরবে তো? এরপর মেয়েদের ওপর পাস্ চাপলে ভাবতে হবে, বাপ-মা দু'জনেই যদি পাস্-আইনে গ্রেপ্তার হয় তাহলে বাচ্চাটার কি হবে?"[১৬]

১৯৫৬ সালে মেয়েরা অনেক জায়গায় পাস্ নিতে অস্বীকার করল। একজায়গায় সরকারী কর্মচারীরা 'এ তো পাস্ নয়, রেফারেন্স-বুক' ব'লে মেয়েদের ঠকিয়ে পাস্ নিইয়েছিল; লিলিয়ান ছুটলেন সেখানে; পরের দিন শ'য়ে শ'য়ে মেয়েরা ম্যাজিস্ট্রেটের কোর্টে গিয়ে কোন কথা না ব'লে চুপচাপ পাস্‌গুলো পোড়াল। গ্রেপ্তার, মামলা, মামলার খরচা জোগাড়ের জন্য চাঁদা তোলা চলল। নানা জায়গায় বিক্ষোভ মিছিল। ভেরীনিগিং-এর কাছে ইভাটন, তখন সেখানে ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদে বাস-বয়কট চলছে—২০০০ মেয়ে সাত মাইল হেঁটে নেটিভ্ কমিশনারের দপ্তরে গিয়ে ১০০০০ প্রতিবাদ-পত্র জমা দিয়ে এল।

যে সব মেয়ে এসব মিছিলে হাঁটছিল, তাদের অধিকাংশই খেটে খাওয়া মেয়ে। তাদের অনেকের চাকরী যাচ্ছিল। দারুণ দারিদ্র্য

সংগঠনকেও কুঁকড়ে রাখছিল। পয়সার অভাবে কর্মীদের যাতায়াত খুব সীমাবদ্ধ।

তবু ১৯৫৬ সালের ৯ই অগস্ট সকালে সারা দক্ষিণ আফ্রিকার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিশ হাজার মেয়ে প্রিটোরিয়ায় জড়ো হল। সরকারী হুকুম জারী হল মেয়েরা শোভাযাত্রা করতে পারবে না।

মেয়েরা এই হুকুমটাকে পাশ কাটাল। প্রিটোরিয়ার রাস্তায় রাস্তায় তারা তিনজন তিনজন করে ঘুরল সারাদিন। এ-এন-সি'র কালো-সোনালী-সবুজ পতাকার রঙের ব্লাউজ-পরা আফ্রিকান মেয়েরা, শাড়ি পরা ভারতীয় মেয়েরা, শ্বেতাঙ্গ মেয়েরা পথে পথে ঘুরল। উৎসবের সাজে তারা সেজে এসেছে। আফ্রিকান মেয়েদের অনেকের পিঠে বাঁধা বাচ্চা—তারাও মায়েদের মতো মুষ্টিবদ্ধ ছোট ছোট হাত তুলে এ-এন-সি'র স্যালুট দেখাচ্ছে। গান হচ্ছে, সেই সঙ্গে নাচের তালে শরীর দুলছে।

তারপর প্রধানমন্ত্রী স্ট্রাইডম্-এর অফিসের দিকে সবাই চলল। সামনের সারিতে লিলিয়ান, ডরোথি, হেলেন জোসেফ, রহিমা মুশা। রহিমার শাড়ি ঝল্‌মল্ করছে। সামনের মাঠে বিশ হাজার মেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। লিলিয়ান স্ট্রাইডমের দরজায় ঘা দিলেন, হাতে এক বস্তা প্রতিবাদ-পত্র। স্ট্রাইডম্ নেই, তাঁর সেক্রেটারী প্রতিবাদ-পত্রগুলি জমা নিলেন। এইভাবে প্রতিবাদ-পত্রের বাণ্ডিলগুলো জমা দিয়ে মেয়েরা ফিরল।

আরো মিছিল, আরো বিক্ষোভ। ১৯৫৭ সালের ২৪শে জুলাই এক মিছিল থেকে ৬০০ মেয়েকে গ্রেপ্তার করা হল, ১২০ জনকে তুই মাস কারাদণ্ড দেওয়া হল। ১৯৫৭ সালের অগস্ট-সেপ্টেম্বরে দেশের বিভিন্ন জায়গায় মেয়েদের মিছিলের ওপর ব্যাটন চালানো হল, চাবুক চালানো হল। জীরাস্ট এলাকায় ৩৫ জনকে গ্রেপ্তার করার পর আরো ২৩৫ জন এগিয়ে এল,—আমাদেরও গ্রেপ্তার কর। পুলিস ক্ষেপে গিয়ে সবাইকে গ্রেপ্তার করল, মেয়ে দেখলেই

গ্রেপ্তার। এক জায়গায় স্কুল থেকে ১২০ জন বাচ্চা মেয়েকে তুলে নিয়ে গেল।[১৮]

॥ পাঁচ ॥

১৯৫৫-৫৬ সালে সরকার গ্রেপ্তার, নিষেধাজ্ঞা, মামলা, কারাদণ্ড চালানোর ফাঁকে ফাঁকে আরেকটা বড় বন্দোবস্ত করছিল।

১৯৫৫ সালের ২৬শে জুন মুক্তিসনদ ঘোষণা সম্মেলনে সশস্ত্র পুলিস এসে কাগজপত্র বাজেয়াপ্ত করেছিল। সেপ্টেম্বরে একদিন ৪৮টা সংগঠনের সমস্ত অফিস, সদস্যদের বাড়িঘর ইত্যাদি খানাতল্লাসী হল, অনেক কাগজপত্র পুলিস নিয়ে গেল। একজনের বাসায় একটি চীনা ড্রেসিং-গাউন পাওয়া গেল, তাতে ড্রাগনের চিত্রবিচিত্র ; ডিটেকটিভ বলল—'ওইসব ইকড়ি-মিক্‌ড়ি আঁকাজোখার মধ্যে গোপন বার্তা থাকতে পারে, ওটাও নিয়ে চল।'[১৯] রাষ্ট্রদ্রোহের সন্ধান হচ্ছিল। কথাটা সেসময়ে আফ্রিকান ছেলে-ছোকবাদের মধ্যে ঠাট্টা-তামাশার ব্যাপার হয়েছিল ; 'কিরে ভাই, কি করছিস ?' 'স্‌স্‌ চুপ, আমি রাষ্ট্রদ্রোহের সন্ধান করছি।'[২০]

জোহানেসবার্গে একটা ছোট বৈঠকে এ-এন-সি'র অন্যতম নেতা ও ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠক রবার্ট রেশা বক্তৃতা করছিলেন। শান্ত ধীরপ্রকৃতির মানুষ, মাঝে মাঝে বেশ জোর দিয়ে নাটকীয় ভঙ্গীতে কথা বলতেন। রবার্ট সেদিন সাংগঠনিক শৃঙ্খলা ও স্বেচ্ছাব্রতীর দায়িত্ব বোঝাচ্ছিলেন। শান্তিপূর্ণ পদ্ধতি নিয়ে কথা হচ্ছিল। রবার্ট বললেন, 'সংগঠন যখন শান্তিপূর্ণ থাকতে বলছে তখন শান্তিপূর্ণ থাকতে হবে, কোনমতেই বলপ্রয়োগ চলবে না ; আবার, সংগঠন যখন বলপ্রয়োগ করতে বলবে, তখন চরম বলপ্রয়োগ করতে হবে, খুন করতে হবে, খুন, খুন !' দারুণ হাততালি পড়ল। রবার্ট জানতেন না, ঘরের মধ্যে একটা গুপ্ত মাইক্রোফোন ছিল ; তাঁর ওই "খুন করতে হবে, খুন, খুন" ('you must murder, murder, murder—that is

all !') কথাগুলো গুপ্ত-পুলিসের টেপ্-রেকর্ডারে ধরা থাকল।[২১]

তেরো দিন পরে, ১৯৫৬ সালের ৫ই ডিসেম্বর সূর্যোদয়ের সময় দক্ষিণ আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলে, শহরে-গ্রামে-বস্তিতে, দরজায় দরজায় ঘা পড়ল—পুলিস! ১৪০ জন গ্রেপ্তার হলেন সেদিন,—কেপ টাউন, ব্লোয়েমফন্টেইন, ডারবান, পোর্ট এলিজাবেথ থেকে ভোরবেলাতেই মিলিটারী এরোপ্লেনে বন্দীদের নিয়ে আসা হল জোহানেসবার্গে দুর্গের বন্দিশালায়। ট্রান্সভালের বন্দীদের সেখানে আগেই আনা হয়েছিল। সপ্তাহ খানেকের মধ্যে আরো ১৬ জনকে আনা হল। আলবার্ট লুটুলি, জ্যাকরায়া ম্যাথুজ, রেভারেণ্ড জেম্‌স্ কালাটা, ডাঃ গঙ্গাধর নাইকার; অলিভার তাম্‌বো, ওআলটার সিস্থুলু, নেলসন মাণ্ডেলা; লিলিয়ান ন্‌গোঈ, ডরোথি নায়েম্বে, হেলেন জোসেফ; ইসমাইল মীর, আহম্মদ কাথরাডা; রুথ স্লভো, জো স্লভো, রবার্ট রেশা; জো ম্যাথুজ, পিটার ন্‌থিটে; বেথল-অঞ্চলের কৃষিশ্রমিকদের সংগঠক গার্ট সিবান্‌দে, নাটালের ভারতীয় ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠক বিলি নায়ার; শ্রমিক, ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠক, সঙ্গীতকার, গায়ক ভুইসিলে মিনি; কমিউনিস্ট নেতা ব্রায়ান বান্টিং-এর স্ত্রী সোনিয়া; কমিউনিস্ট নেতা মোজেস কোটানে, শ্বেতাঙ্গ কমিউনিস্ট আর্কিটেক্ট-ইনজিনিয়ার লায়নেল বার্ণস্টিন; ভারতীয় দোকান-কর্মচারী আশা দাউদ; এ-এন-সি'র প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট জেম্‌স্ গুমেডের পুত্র আর্চিবল্ড গুমেডে; ভারতীয় ব্যবসাদার গোপাললাল হরবন্‌স; শ্বেতাঙ্গ স্প্রিংবক্ লিজ্যনের প্রাক্তন সেক্রেটারী জ্যাক হজসন;—সবাই গ্রেপ্তার।[২২] ১০৬ জন আফ্রিকান, ২৩ জন শ্বেতাঙ্গ, ২১ জন ভারতীয়, ৬ জন মিশ্রবর্ণ।

পনের দিন পরে জোহানেসবার্গের ওই দুর্গের 'ড্রিল্ হল্' নামক ছাউনীর তলায় ম্যাজিস্ট্রেটের বিশেষ আদালতে এঁদের হাজির করা হল। এঁদের বিরুদ্ধে পুলিসের অভিযোগ—রাষ্ট্রদ্রোহ, কমিউনিস্ট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার চক্রান্ত, ক্লিপটাউনে গণসম্মেলনেমু ক্তিসনদ ঘোষণা,

সরকার ও রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক বিদ্রোহ সৃষ্টির প্রচেষ্টা, শ্বেতাঙ্গদের বিরুদ্ধে অ-শ্বেতাঙ্গদের হিংসাত্মক মনোভাব সৃষ্টির প্রচেষ্টা, বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ, ইত্যাদি ইত্যাদি।

রাষ্ট্রদ্রোহের অপরাধ প্রমাণ হলে শাস্তি প্রাণদণ্ড। এঁরা সকলেই ফাঁসীর আসামী হয়েছিলেন।

আদালতে প্রচণ্ড ভীড়, কোলাহল। আদালতের বাইরে আরো বেশি ভীড়। দ্বিতীয় দিনে আদালতের বাইরে পুলিস ব্যাটন চালাল, গুলী চালাল। ২২ জন জখম হল। নেতারা আস্তে আস্তে জনতাকে শান্ত করলেন। আদালতের ভেতরে ৫০০ সশস্ত্র পুলিস। প্রথম দিন কে যে আসামী, কে সাক্ষী, কে পুলিসের গোয়েন্দা, কে উকীল, কে আসামীর আত্মীয় এবং দর্শক বোঝা যাচ্ছিল না,—কারু কোন কথা শোনা যাচ্ছিল না। দ্বিতীয় দিনে আসামীদের একটা প্রকাণ্ড খাঁচার মতো জায়গায় রাখা হল, তারের জাল দিয়ে ঘিরে। তৃতীয় দিনে সরকারী উকীলের কথা শোনা গেল। ১৯৫৭ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর এই প্রাথমিক শুনানীতে সরকারী উকীলের সওয়াল ও প্রমাণ-দাখিল শেষ হল, আদালত চার মাসের জন্য মুলতুবী হল। আসামীরা জামিন পেলেন।

পরের বার শুনানী শুরু হবার আগেই সরকার-তরফ ৬১ জনের বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার করল। আলবার্ট লুটুলি, অলিভার তাম্‌বো, আরও কয়েকজন ছাড়া পেয়ে গেলেন। ছাড়া পেয়ে এঁরা মোটেই খুশী হননি।

১৯৫৭ সালের জানুয়ারীতে আবার আদালত বসল। ৯৫ জন কাঠগড়ায়। এবার সরকার-তরফে ব্যারিস্টার দাঁড়ালেন অসওয়াল্ড পিরো, প্রাক্তন বিচারমন্ত্রী, হিটলার-ভক্ত পুরনো 'নিউ অর্ডার' দলের নেতা। অভিযুক্তদের পক্ষে ব্যারিস্টার ব্রাম ফিশার। ম্যাজিস্ট্রেট ৯৫ জনের খালাসের আবেদন অগ্রাহ্য ক'রে বিচারের জন্য সো' করলেন।

১৯৫৮ সালের ১লা অগস্ট আসল মামলা শুরু হল প্রিটোরিয়ায়। ১৯৫৯ সালের গোড়ার দিকে সরকার আরো ৬৫ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রত্যাহার করল। বাকী ৩০ জন। এঁদের মামলা চলল ১৯৬১ সাল পর্যন্ত। ওআলটার সিস্‌লু, নেলসন মাণ্ডেলা, রবার্ট রেশা, আহম্মদ কাথরাডা, লায়নেল বার্ণস্টিন, এবং আরো পঁচিশ জন ১৯৬১ সালের ২১শে মার্চ বিচারকের রায় শুনলেন—বেকসুর খালাস।

প্রায় পাঁচ বছর ধ'রে এই মামলা চালিয়ে সরকার প্রতিবাদ-আন্দোলনের শিরদাঁড়া ভাঙতে চেয়েছিল। সরকার সফল হয়নি। আন্দোলন খানিকটা বিপর্যস্ত হয়েছিল। মামলার খরচ চালাতে বহু অর্থব্যয় হয়েছিল। অভিযুক্তদের অনেকের জীবিকা-সংগ্রহের ব্যবস্থা তছনছ হয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার ঘরে ঘরে অভিযুক্ত নেতাদের নাম প্রতিদিনকার কথাবার্তায় এসে গিয়েছিল। এঁরা জাতীয় বীর হয়ে উঠেছিলেন। শ্বেতাঙ্গ ভারতীয় আফ্রিকান সংগ্রামীদের ঐক্য আরো অটুট হয়েছিল।

আর, সরকার নিজের অজ্ঞাতে আরেকটি বন্দোবস্ত করে দিয়েছিল। নেতারা দিনের পর দিন এক জায়গায় জড়ো হয়ে সুদীর্ঘ আলোচনার সুযোগ পেয়েছিলেন। সরকার কার্যতঃ সংগ্রামীদের সম্মেলন করার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এই মামলা নিয়ে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। আইনজ্ঞদের আন্তর্জাতিক কমিশন এই মামলা পর্যবেক্ষণ করার জন্য খ্যাতনামা আইনজ্ঞদের পাঠিয়েছিলেন। শ্বেতাঙ্গ উদার-নীতিক দলের অ্যালান প্যাটন এগিয়ে এসেছিলেন, 'ডিফেন্স অ্যাণ্ড এইড্ ফাণ্ড' গঠন করে বহু সাহায্য করেছিলেন।

দ্বাদশ অধ্যায়

'শার্পভিল্'—'জরুরী অবস্থা'

॥ এক ॥

১৯৫৭ সাল শুরু হল মুক্তি-আন্দোলনের সংগঠনের বিপর্যস্ত অবস্থায়। রাষ্ট্রদ্রোহ-মামলা চলছে, তাকে ঘিরে উত্তেজনা আলোড়ন ব্যাপ্ত হচ্ছে। কিন্তু সংগঠন বিপর্যস্ত, কর্মীরা অধিকাংশই বন্দী, বা নিষেধাজ্ঞা-কবলিত, বা মামলায় জড়িত হয়ে দৈনন্দিন থানায় হাজিরা দেওয়ার দায়ে আবদ্ধ। আন্দোলনের কোন নির্দিষ্ট কর্মসূচীও সামনে নেই। 'বন্দী নেতাদের পাশে দাঁড়াও' আহ্বানে বহু মানুষ ছুটে এল, নেতাদের প্রতি শ্রদ্ধা অনুরাগ ও সমর্থন জানাল নানাভাবে। কিন্তু আর তাদের করণীয় কি?

সরকারই জোগাল করণীয়ের নির্দেশ। আলেকজান্ড্রায় সরকারী ভরতুকী-পুষ্ট বাস কোম্পানী আবার ভাড়া বাড়াল, সেই এক পেনী বৃদ্ধি। তেরো বছর আগের ১৯৪৪ সালের বাস-বয়কট আন্দোলন এবার চতুর্গুণ তেজে শুরু হল।

ভাড়াবৃদ্ধির প্রস্তাব প্রকাশ হওয়ার পর দু'একদিনের মধ্যে আলেকজান্ড্রার স্থানীয় সমিতি ও শাখা-সংগঠনগুলো জড়ো হল। চারশো মানুষ বাস-কোম্পানীর অফিসে হেঁটে গেল নিশান নিয়ে, নিশানে লেখা 'আসিনামালি'—'আমাদের পয়সা নেই'। ভাড়াবৃদ্ধির আগের দিন পাঁচ হাজার মানুষের জমায়েতে আওয়াজ উঠল: 'আসিনামালি, আজিখোয়েল্ওয়া'—'আমাদের পয়সা নেই, বাসে চড়ব না।'

সেইদিনই সোফিয়াটাউনে, প্রিটোরিয়ায় ওই একই আওয়াজ উঠল।

'আসিনামালি'। সত্যিই পয়সা ছিল না। এমনিতেই আফ্রিকান শ্রমিকের বারো মাসে এক-মাসের মজুরী বাস ভাড়ায় যেত। ১৯৫৪

সালের হিসেবে খনি-অঞ্চলে শ্রমিকদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ যা মজুরী-মাইনে পেত তাতে ন্যূনতম সংসার-খরচের শতকরা ৪০ ভাগ ঘাটতি পড়ত।[১] তার ওপর সপ্তাহে ১২ পেনী খরচা বৃদ্ধি, অসাধারণ সহ্যক্ষমতারও শেষ সীমা ছাড়িয়ে গেল।

আসা-যাওয়ায় প্রায় বিশ মাইল রাস্তা। বিশ হাজার নরনারী ওই রাস্তা হাঁটতে শুরু করল। এক সপ্তাহের মধ্যে তাদের সংখ্যা ৪৫০০০। দু'সপ্তাহ পরে 'মোরোকা'র মানুষও হাঁটতে থাকল। লেল্যাণ্ড কোম্পানীর তৈরী সবুজ বাঘ-মার্কা বাসগুলো ফাঁকা; সেগুলো পদযাত্রীদের পাশ দিয়ে বারবার ভেঁপু বাজিয়ে খুব চলাচল করল। বয়স্করা ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে রইল। কম-বয়সীরা 'দুয়ো' দিল, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাল, এক ঝলক গান গেয়ে নেচে দিল—'আজি-খোয়েল্ওয়া'! এক পেনীর লড়াই!

তিন মাস ধরে মানুষগুলো হাঁটল। রাত তিনটেয় হাঁটা শুরু, রাত ন'টায় বাসায় ফেরা। পথে পুলিসের হয়রানি—'পাস্ কই?' 'এ পাস্ তো ঠিক নেই, ট্যাক্সের রসিদ কই?' 'মালিকের সই নেই তো এ মাসে!' 'চল থানায়।' ১৪ হাজার লোক গ্রেপ্তার হল পাস্-আইনে।[২] মাঝখানে চেম্বার অব্ কমার্স-এর প্রস্তাব হল, ৫ পেনী দিয়ে টিকিট কিনে লোকেরা বাসে চড়ুক, পরে ১ পেনী ফেরৎ দেওয়া হবে, চেম্বার অব্ কমার্স বাস-কোম্পানীকে সে টাকাটা দেবে। মানুষ গর্জে উঠল—ওসব হবে না, ১ পেনী ফেরৎ পাবার জন্য আবার লাইন দিতে পারব না, ৫ পেনী ছাপওলা টিকিট কিনব না। 'আসিনামালি—আজিখোয়েলওয়া'।

ওদিকে নেতারা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন, মীমাংসা কি করে হবে? মানুষগুলো এভাবে কতদিন হাঁটবে? সরকারী হুকুমে দেরী-করে-পৌঁছনোর অপরাধে বরখাস্তও শুরু হয়ে গিয়েছিল।

অন্যদিকে উগ্রভাষীরাও ছিল। দাঙ্গা-মারামারির মেজাজও তৈরী হচ্ছিল।

শেষ পর্যন্ত এপ্রিল মাসে চেম্বার অব্ কমার্স-এর টাকা নিয়ে বাস-কোম্পানী ৪ পেনী ভাড়াই স্বীকার করল। তুমুল উল্লাস ফেটে পড়ল—'সবুজ বাঘ পড়ে গেল!'[৩]

ড্রিল হল্-এর আদালত থেকে দুপুরের বিরতির ফাঁকে আলবার্ট লুটুলি ইতিমধ্যে ডাক দিয়েছিলেন—২৬শে জুন কর্মবিরতি। 'ন্যূনতম দৈনিক মজুরী ১ পাউণ্ড চাই'—এই দাবীতে কর্মবিরতি। সে সময়ে জোহানেসবার্গ এলাকায় অধিকাংশ শ্রমিকের মাসিক গড়পড়তা উপার্জন ছিল ১৫ পাউণ্ড ১৮ শিলিং ১১ পেনী, পাঁচজনের সংসারে ন্যূনতম মাসিক খরচা হবার কথা ২৩ পাউণ্ড ১০ শিলিং ৪ পেনী।[৪] শ্রমিকরা প্রায় দ্বিগুণ মজুরী দাবী করছিল, সেই মজুরী পেলেও তাদের মাসিক উপার্জন ২৪ পাউণ্ডের বেশি হত না।

নেতারা কর্মবিরতির ডাক দিয়েছিলেন অনেক ঝুঁকি নিয়ে। আহ্বান সফল হল। ট্রান্সভালের খনি অঞ্চলে, শহরগুলোয় শতকরা ৮০ ভাগ মানুষ কাজে গেল না। অন্য শহরগুলোতেও কম-বেশি সাড়া পাওয়া গেল।

কিন্তু সেপ্টেম্বরে জোহানেসবার্গের বস্তি-শহরগুলোয় হঠাৎ দাঙ্গা বাধল, চল্লিশজনের ওপর আফ্রিকান নিহত হল। উপজাতীয় কলহের মধ্যে বস্তির বেকার ছেলেদের স্বাভাবিক ধ্বংসমূলক ঝোঁক মিশেছিল।

ওদিকে গ্রামাঞ্চলগুলোয় অশান্তি ফেটে পড়ছিল সরকার-নিযুক্ত প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীপ্রধানদের শাসনের বিরুদ্ধে। এখানেও প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ হচ্ছিল আফ্রিকান মানুষের সঙ্গে আফ্রিকান মানুষের, শ্বেতাঙ্গ শাসক নেপথ্যে ছিল। এ-এন-সি'র নেতারা যাঁরা বাইরে ছিলেন, গ্রামাঞ্চলে ছুটলেন। ওইসব এলাকায় তাঁদের প্রবেশ নিষেধ করে সরকারী আদেশ জারী হল।

মেয়েরা 'পাস্'-বিরোধী আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিলেন। ৫০০ মেয়ের একটা গোটা মিছিল গ্রেপ্তার হল। জোহানেসবার্গে ১৩০০

মেয়ে গ্রেপ্তার হয়ে দণ্ডিত হলেন। তাঁদের মধ্যে নেলসনের স্ত্রী উইনী মাণ্ডেলা, এবং ওআলটারের স্ত্রী আলবার্টিনা দুই সপ্তাহ জেল খাটলেন।

দারিদ্র্য মানুষগুলোকে কামড়ে কামড়ে খাচ্ছিল। তার মধ্যে ১৯৫৮ সালে নতুন আইন জারী হল—আফ্রিকানদের ওপর পোল্ ট্যাক্স মাথাপিছু বার্ষিক ১ পাউণ্ড থেকে বাড়িয়ে ১ পাউণ্ড ১৫ শিলিং করা হল, শতকরা ৭৫ ভাগ বৃদ্ধি। এই 'পোল্ ট্যাক্স' কথাটার আক্ষরিক অর্থ 'মাথা-ট্যাক্স'; উপার্জন থাকুক বা না থাকুক, তুমি যেহেতু আছ অতএব তোমায় এই ট্যাক্স দিতে হবে। এই ট্যাক্স একমাত্র আফ্রিকানদেরই দিতে হত, আর কোন বর্ণ-সম্প্রদায়ের ওপর এই ট্যাক্স ছিল না; আফ্রিকানরা অন্যান্য ট্যাক্সের ওপর এই বাড়তি ট্যাক্স দিত। এতদিন শুধু প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদেরই ওপর ট্যাক্স ছিল, নতুন আইনে মেয়েদের ওপরেও ট্যাক্স চাপল, এবং ৭৫% বৃদ্ধি হল।[৫]

১৯৯৫ সালে ডারবান অঞ্চলে মেয়েদের মধ্যে নতুন আন্দোলন। 'কেটো ম্যানর' নামে বস্তি-শহরের মেয়েরা দল বেঁধে মিউনিসিপালিটিকে বলল, 'মদ্যপানশালা বীয়ার-হলগুলো তুলে দাও; আমাদের পুরুষরা ওখানে মাতাল হয়ে জ্বালা জুড়োতে যায়, পয়সা খরচ করে ফেলে; আমরা আমাদের ঘরেই ওদের বীয়ার তৈরী করে খাওয়াব, ওরা মাতাল হবে না, পয়সা বাঁচবে, সংসারের সাশ্রয় হবে।' সরকার বলল, 'ওসব হবে না; বীয়ার-হল চলবে; আর, পুলিস তোমাদের ঘরে ঘরে প্রতি রাত্রে তল্লাসী-হানা চালাবে; ঘরে যদি চোলাই কর, তাহলে শাস্তি হবে।' জুন মাসে ২০০০ মেয়ে এক কর্মকর্তাকে ঘিরে নালিশ জানাচ্ছিল, হঠাৎ পুলিস ব্যাটন চার্জ করল। মেয়েদের অনেকের পিঠে-কোলে বাচ্চা ছিল, অনেকে পড়ে গিয়ে গুরুতর জখম হল। এবার কমবয়সী ছেলেদের চোখগুলোয় আগুন জ্বলে উঠল। সারারাত ধরে হাঙ্গামায় তারা মিউনিসিপাল অফিস জ্বালাল,

গাড়িগুলো ভাঙল পোড়াল। বীয়ার-হলের চারপাশে পুলিস বন্দুক নিয়ে দাঁড়িয়েছিল, জনতা বীয়ার-হল আক্রমণ করার সঙ্গে সঙ্গে গুলী চলল, তিনজন মানুষের প্রাণ গেল। কোন তদন্ত হল না। সারা নাটালের গ্রামাঞ্চলে হাঙ্গামা ছড়িয়ে পড়ল। বীয়ার-হলগুলোর সামনে মেয়েদের পিকেটিং শুরু হল ; পিকেটিংয়ের ওপর পুলিস ব্যাটন চালায়, তারপর ক্রুদ্ধ জনতা 'বান্টু'-শিক্ষা ব্যবস্থার স্কুল পোড়ায়। মেয়েরা শ'য়ে শ'য়ে গ্রেপ্তার হল।

এই অবস্থার মধ্যে ২৬শে জুন মুক্তিসনদ ঘোষণা দিবস পালন হল। ডারবান শহরে সেদিন বিশাল জমায়েত ; গ্রেপ্তার, নিষেধাজ্ঞা, ভীতিপ্রদর্শন সত্ত্বেও ২০ হাজার থেকে ৩০ হাজার মানুষ জড়ো হয়েছিল।

॥ দুই ॥

আন্দোলনের জটিল সমস্যা সংগ্রামের রূপ নিয়ে। তার সঙ্গে জড়িত যুক্তফ্রন্ট নিয়ে মতভেদ। ১৯৫৮ সালে যুক্তফ্রন্ট সম্বন্ধে মতভেদ চরম আকার ধারণ করেছিল। আফ্রিকান জাতীয়তাবাদীদের পুরনো সঙ্কীর্ণ ধারার সঙ্গে এক নবীন উগ্রভাষী ধারার এক অদ্ভুত মিলন হয়েছিল।

এই নবীন উগ্রভাষীদের মধ্যে আবার একাধিক উপাদানের সংমিশ্রণ ঘটেছিল। ত্রৎস্কীবাদী উপাদান ছিল—এ-এন-সি'র নেতাদের রাশিয়া-চীন যাতায়াত, বিশ্বশান্তি আন্দোলনের সঙ্গে সংযোগ, আন্তর্জাতিক ঠাণ্ডা যুদ্ধের প্রশ্নগুলিতে সোভিয়েট-শিবিরের পক্ষে সহানুভূতি, ইত্যাদি ব্যাপারগুলোয় তাদের ঘোর আপত্তি কটূক্তি ও কুৎসার পর্যায়ে পৌঁছেছিল। জঙ্গী ও কট্টর জাতীয়তাবাদী উপাদান ছিল—মার্কিন-সোভিয়েট ঠাণ্ডা লড়াইয়ের আওতার বাইরে নিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন তাদের লক্ষ্য। এ-এন-সি'র শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের নীতির বিরুদ্ধেও নিন্দাবাদ হচ্ছিল। ভারতীয়

প্রভাব এবং শ্বেতাঙ্গ কমিউনিস্ট বা উদারনীতিক প্রভাব আক্রমণের বস্তু হয়েছিল আগে থেকেই।

নবীন উগ্রভাষী জাতীয়তাবাদী ধারার প্রধান নেতা হয়ে উঠেছিলেন রবার্ট সবুকোয়ে। এঁদের প্রধান ঘাঁটি হয়েছিল জোহানেসবার্গের আশপাশে, বিশেষতঃ আলেকজানড্রা এবং অর্লাণ্ডো বস্তিতে। এই জায়গাগুলোয় মানুষের দুর্দশা ছিল চরম, বিক্ষোভ ও অশান্তি সর্বদা ফেটে পড়ার মুখে থাকত—নেতারা সংযম-শৃঙ্খলার কথা বললে নেতাদের ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে গালিগালাজ করার মতো মেজাজ ছিল ব্যাপক।

রবার্ট সবুকোয়ে ভিট্ভাটার্সরানড্ বিশ্ববিদ্যালয়ে জুলু ভাষা ও সংস্কৃতি বিভাগের তরুণ অধ্যাপক ছিলেন। এ-এন-সি'র যুবশক্তির তিনিও একজন নির্মাতা ছিলেন। ১৯৫৯ সালে তাঁর বয়স ছিল চৌত্রিশ বছর। ওই বৎসরেই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরী ছেড়ে দিয়ে সর্বক্ষণের রাজনৈতিক কর্মী হয়ে আন্দোলনে পুরোপুরি নামলেন।

সবুকোয়ে এসময়ে কি রাজনৈতিক ধ্যানধারণা নিয়ে চলছিলেন তা বোঝা যায় তাঁর আদর্শ হিসেবে উল্লেখিত চারজন আফ্রিকান নেতার নাম দেখলে। এই চারজন ছিলেন—ঘানার নক্রুমা, কেনিয়ার টম্ ম্বোয়া, টাঙ্গানিকার জুলিয়াস নীয়রেরে, এবং নিয়াসাল্যাণ্ডের হেস্টিংস বানডা।[৬] পরবর্তী ইতিহাসে দেখা গেছে এঁদের মধ্যে দুইজন সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সমাজতন্ত্রী; আর অন্য দুইজন নিজের নিজের দেশে ক্ষমতালাভের পর ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার রক্ষক এবং সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে সহযোগী হয়ে উঠেছেন। ডাঃ হেস্টিংস্ বানডার জাতীয়তাবাদ দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেত স্বৈরতন্ত্রের সঙ্গে তাঁর সহযোগিতার পথে বাধা হয়নি। কেনিয়ার টম ম্বোয়া মার্কিন সাহায্যপুষ্ট।

সবুকোয়ে ভারতীয়দের বিরুদ্ধে যেসব কড়া কথা বলছিলেন,

তার মধ্যে আবার একটু শ্রেণীতত্ত্বও মেশানো ছিল। "ভারতীয়দের বর্তমান নেতৃত্ব ব্যবসাদারদের বুর্জোয়া নেতৃত্ব; 'কুলী'রা যদি এই নেতৃত্ব বিসর্জন দিয়ে আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে আসে, তখন সহযোগিতা করা যাবে; কিন্তু এখন ভারতীয়দের সঙ্গে একসঙ্গে চলা যায় না।"[৭]

সবুকোয়ে এবং তাঁর সহযোগীরা আলবার্ট লুটুলি, অলিভার তাম্‌বো এবং এ-এন-সি'র অন্য নেতাদের নরমপন্থী বুর্জোয়া বলে নিন্দাবাদ করছিলেন।

২৬শে জুনের মুক্তিসনদের প্রথম কথাটি নিয়ে এঁরা তীব্র আপত্তি করছিলেন—ওখানে বহুজাতিক উদারনীতিকতার কথা রয়েছে, আফ্রিকান জাতীয় সংগ্রামের কথা নেই। এই সময়েই রাষ্ট্রদ্রোহ-মামলায় সরকার 'কমিউনিস্ট' চক্রান্ত ও রাষ্ট্রদ্রোহিতার প্রধান দলিল বলে ওই মুক্তিসনদকে উল্লেখ করছিল। একই সময়ে এই আফ্রিকান জাতীয়তাবাদীরাও মুক্তিসনদের বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ করছিলেন। এই উগ্রভাষী জাতীয়তাবাদীরা 'আফ্রিকানিস্ট' বলে নিজেদের পরিচয় দিচ্ছিলেন। ১৯৫৮ সালে এ-এন-সি'র প্রাদেশিক সম্মেলনগুলোয় আলবার্ট লুটুলি মতভেদ দূর ক'রে ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা করলেন। এ প্রচেষ্টা সফল হল না। নভেম্বরে ট্রান্সভালের প্রাদেশিক সম্মেলনে কলহ তুঙ্গে উঠল। 'আফ্রিকানিস্ট'রা লুটুলি এবং তামবোর বিরুদ্ধে অপমানসূচক কথাবার্তা বললেন। মারামারি হবার উপক্রম। মারামারি ঠেকানো গেল, কিন্তু পট্‌লাকো লেবাল্লো'র নেতৃত্বে 'আফ্রিকানিস্ট'রা সম্মেলন বর্জন করে বেরিয়ে গেলেন। তাঁরা খানিকটা দূরে আরেকটা সভা করলেন, সেখান থেকে ঘোষণা করলেন, "১৯১২ সালে এ-এন-সি'র যে নীতি ছিল, সেই নীতি আমরা রক্ষা করব, আমরা স্বতন্ত্রভাবে চলব।"

সবুকোয়ে এই সম্মেলনে ছিলেন না। ১৯৫৯ সালের মার্চ মাসে আফ্রিকানিস্টদের সম্মেলনে অবশ্য সবুকোয়ে প্রধান নেতা। সেই

সম্মেলনে 'প্যান-আফ্রিকানিস্ট কংগ্রেস' প্রতিষ্ঠিত হল,—সবুকোয়ে প্রেসিডেণ্ট, লেবাল্লো সেক্রেটারী। প্যান-আফ্রিকানিস্ট কংগ্রেস সংক্ষেপে 'পি-এ-সি' বলে উল্লেখিত হয়।

এরপর এ-এন-সি'র সঙ্গে পি-এ-সি'র প্রতিদ্বন্দ্বিতা। দুই সংগঠনই এ সময়ে খুব সজীব হয়ে প্রভাব বৃদ্ধির প্রচেষ্টা করতে থাকে। ১৯৫৯ সালে এ-এন-সি'র শক্তি বাড়ছিল। কিন্তু পি-এ-সি'ও অনেক নবীন কর্মী ও জঙ্গী মেজাজের মানুষ পেয়েছিল। দুই সংগঠনই পরস্পারের বিরুদ্ধে কটূক্তি ও নিন্দাবাদ চালাচ্ছিল। 'আমাদের দিকে জনসমর্থন বেশি', 'ওরা একটা টুকরো মাত্র', 'ওটা কয়েকজন নেতাব্যক্তির আড্ডা, আসল কর্মীরা আমাদের দিকে'—ইত্যাদি যেসব কথা এরকম অবস্থায় শোনা যায় সেগুলো এখানেও শোনা যাচ্ছিল।

১৯৫৯ সালের ১৬ই ডিসেম্বর এ-এন-সি'র বার্ষিক সম্মেলনে প্রতিনিধিরা সংগ্রামের কার্যসূচী চাইলেন। দেশ থম্‌থম্ করছে; বৎসরাধিক কাল ধরে বহু মিছিল বহু গ্রেপ্তার বহু বিক্ষোভ প্রদর্শন হয়েছে; সরকারের নীতি আরো কঠোর হয়েছে, আরো দুর্বিষহ হয়েছে। পাস্-আইনে দণ্ডপ্রাপ্ত মানুষের সংখ্যা বছরে ৪ লক্ষ ছাড়িয়ে গেছে।

সিদ্ধান্ত হল, সাড়ে তিন মাস পরে ৩১শে মার্চ তারিখে দেশব্যাপী 'পাস্'-বিরোধী দিবস পালন করা হবে, এবং তারপর মে-জুন মাসে ব্যাপক 'পাস্'-বিরোধী গণবিক্ষোভ প্রদর্শন হবে।

এ-এন-সি সম্মেলনের এক সপ্তাহ পরে পি-এ-সি'র প্রথম বার্ষিক সম্মেলন হল। পাস্-আইনের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে হবে—সেই সিদ্ধান্ত হল। এ-এন-সি'র সিদ্ধান্তের চেয়ে একটু বেশি বলা হল: পি-এ-সি'র সদস্য ও সমর্থকরা পাস্-আইন অমান্য করে কারাবরণ করবে, জামিন নেবে না, জরিমানা দেবে না, ছাড়া পেলে আবার তখনই কারাবরণ করবে, জেলগুলো ঠাসাঠাসি ভরিয়ে দিয়ে

অচল করে দেবে, শ্রমিকের অভাবে কলকারখানাও বিপর্যস্ত হয়ে যাবে।[৮]

উভয় সংগঠনই শান্তিপূর্ণ পদ্ধতির ওপর জোর দিয়েছিল।

॥ তিন ॥

১৯৬০ সাল বৃটেনে এবং অন্যান্য দেশেও 'আফ্রিকা বর্ষ' বলে পরিচিত। ঘানা ১৯৫৭ সালে স্বাধীন হয়েছিল ; ১৯৬০ সালে নাই-জিরিয়া, বেলজিয়ান কঙ্গো এবং আরো কয়েকটি দেশ স্বাধীন হবার কথা। টাঙ্গানিকার স্বাধীনতা আসন্ন। কেনিয়ায় ১৯৫২ সালে বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল, ভীষণ অত্যাচার ও সন্ত্রাস চালিয়েও সে বিদ্রোহের সমাধান হয়নি, ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য ১৯৬০ সালে আলোচনা শুরু হয়েছিল। আলজিরিয়ার সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ ১৯৫৪ সালে শুরু হয়েছিল, সেখানে আরো ভয়াবহ সন্ত্রাস ও অত্যাচার চালিয়েও ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ ক্রমাগত পিছু হঠছিল ; ১৯৫৯ সালের সেপ্টেম্বরে সেখানেও ক্ষমতা হস্তান্তরের আলোচনা চলছিল খুব সন্তর্পণে।

পৃথিবীর আরেক দিকে মার্কিন দেশের ৯০ মাইল দক্ষিণে ক্যারিবিয়ান সাগরের মাঝে কিউবা। ১৯৫৯ সালের ১লা জানুয়ারী ফিদেল কাস্ত্রো ও চে গ্যেভারার নেতৃত্বে সশস্ত্র বিপ্লবী বাহিনী সেখানে ক্ষমতা দখল করেছিল। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে আলজিরিয়া এবং কিউবা দুটি দেশেই বিপ্লবী সংগ্রামে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বকে দেখা যায়নি—দুই দেশেই কমিউনিস্ট পার্টি তার কর্তব্য পালন করতে পারেনি।

আফ্রিকা মহাদেশে ও বিশ্বে এই পরিস্থিতির সঙ্গে ১৯৬০ সালের দক্ষিণ আফ্রিকার ঘটনাবলীর কিছু যোগাযোগ ছিল।

জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারী মাসে এ-এন-সি ও পি-এ-সি আসন্ন আন্দোলনের জন্য নিজ নিজ সংগঠন বিস্তারের প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল।

এ-এন-সি আরো ১৩টি সংগঠনের সঙ্গে একত্রে জোহানেসবার্গে 'পাস্'-আইনের অবসান দাবী করে জমায়েত, মিছিল, ডেপুটেশন ইত্যাদি সংগঠিত করেছিল। এই সংগঠনগুলির মধ্যে ভারতীয় ও শ্বেতাঙ্গদের বিভিন্ন সংগঠনও ছিল। পি-এ-সি'র প্রধান সাংগঠনিক ভিত্ ছিল ট্রান্সভালের দক্ষিণ অঞ্চলে এবং কেপ প্রদেশের পশ্চিম অঞ্চলে।

১৮ই মার্চ তারিখে সবুকোয়ে পি-এ-সি'র আহ্বান প্রচার করলেন, ২১শে মার্চ পি-এ-সি'র অভিযান শুরু হবে। ওইদিন পি-এ-সি'র নেতৃত্বে আফ্রিকানরা পাস্-বুক বাড়িতে রেখে দলে দলে নিকটস্থ থানায় যাবে, বলবে 'আমরা পাস্ আনিনি, গ্রেপ্তার কর'। এই সঙ্গে দাবী করা হবে ন্যূনতম মাসিক মজুরী ৩৫ পাউণ্ড হতে হবে।

এ-এন-সি'র বিঘোষিত তারিখ ছিল ৩১শে মার্চ। পি-এ-সি ২১শে মার্চ অভিযানের তারিখ ঘোষণা করে এ-এন-সি'কে বেকায়দায় ফেলে দলীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এক কিস্তি জয়লাভ করতে চেয়েছিল। একই উদ্দেশ্যে এ-এন-সি'র ঘোষিত দাবী ন্যূনতম দৈনিক মজুরী ১ পাউণ্ডের জায়গায় একটু বাড়িয়ে মাসিক ৩৫ পাউণ্ড দাবী করা হয়েছিল। এইরকম ক্ষুদ্র দলবাজী সর্বত্র দেখা যায়, এখানে ব্যতিক্রম হয়নি। কিন্তু এসময়ে পি-এ-সি'তে শুধু দলবাজী করার লোকই ছিল না, আদর্শানুরাগী তেজী সাহসী মানুষও কিছু ছিল। পরবর্তী ঘটনায় তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল।

সবুকোয়ে এ-এন-সি'কে ২১শে মার্চের অভিযানে যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। সহজবোধ্য কারণে এ-এন-সি অস্বীকার করেছিল। কিন্তু এ-এন-সি'র নেতারা আন্দাজ করতে পারেননি যে দুর্বিষহ অবস্থার বিরুদ্ধে মানুষের মেজাজ কিরকম অতিষ্ঠ হয়ে আছে ; তাঁরা আরো আন্দাজ করতে পারেননি যে সরকার ও পুলিস দেশব্যাপী সন্ত্রাস সৃষ্টির একটা উপলক্ষ্য খুঁজছে, এবং সেইভাবে তৈরী হয়েছে। পি-এ-সি'র নেতারা সরকারের মেজাজ ও পুলিসের আয়োজন কতটা আন্দাজ করেছিলেন, তা বলা শক্ত।

২১শে মার্চ সকাল সাতটায় জোহানেসবার্গের কাছে অর্লাণ্ডো পুলিস-থানায় ৬০ জন কর্মীর সঙ্গে সবুকোয়ে এবং লেবাল্লো উপস্থিত হলেন—'পাস্ নেই, গ্রেপ্তার কর।' তাঁদের গ্রেপ্তার করে থানা-হাজতে রাখা হল। অর্লাণ্ডো-পর্ব এখানেই শেষ।

জোহানেসবার্গ থেকে ত্রিশ মাইল দক্ষিণে শার্পভিল্ বস্তি শহরে এবং হাজার মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে কেপ টাউনের কাছে লাঙ্গা ও নায়াঙ্গা বস্তি-শহরে ঘটনা অন্যরকম হল। ভেরীনিগিং শিল্প-শহর, সেখানে ইস্পাত কারখানা ও অন্যান্য কারখানা, এবং আশপাশে কয়লাখনি। এই শহরের কল-কারখানায় যারা খাটে, পথঘাট বাড়ি-ঘর পরিষ্কার রাখে, জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য খাটে, সেই আফ্রিকান শ্রমিকদের অধিকাংশের বাসস্থান দুই মাইল দূরের বস্তি-শহর শার্পভিল্,—সেখানে ১৫ হাজার নরনারীর বাস। ১৮ মার্চ তারিখে সন্ধ্যায় ভেরীনিগিং থানা থেকে পুলিসের ক্যাপ্টেন কাউড্ শার্পভিল্ পুলিস-থানায় গিয়ে ১৬-১৭ খানা ছেঁড়াখোঁড়া আফ্রিকান পাস্ দেখল। সে নাকি তখনই বুঝল, আফ্রিকানরা পাস্ ছিঁড়ে ফেলে দিচ্ছে—লক্ষণ ভাল নয়।[৯] পরের দিন কাউড্ আবার এল, সঙ্গে ৩৭ জন পুলিস। তারপর দুইদিন কাউড্ ও তাঁর পুলিস রাস্তায় রাস্তায় আফ্রিকান ছেলেছোকরাদের তাড়া করল।

২১শে মার্চ ভোর ৫টায় বাস-স্ট্যাণ্ডের কাছে একটা কাজে যাবার জন্য যারা বাসে উঠতে এসেছিল, এই দঙ্গল তাদের ফিরিয়ে দিল, 'আজ কাজ বন্ধ'। সকাল সাতটা নাগাদ এক রাস্তার মোড়ে প্রায় হাজার সাতেক লোকের ভীড়। কাউড্ ভেরীনিগিংয়ে লোক পাঠাল—১০টা কাঁদুনে গ্যাসের বোমা চাই।

বোমা এল। পাঁচটা বোমা ফাটানো হল। জনতা খানিকটা পিছিয়ে গেল। কিন্তু আবার এগিয়ে এল। গান হচ্ছিল, সেই সঙ্গে পুলিসের প্রতি টিট্‌কারা। 'সারাসেন আর্মার্ড কার' এল; জেলার

নিরাপত্তা পুলিসের বড়কর্তা এলেন। জনতাও রাস্তা ছেড়ে হঠাৎ চলতে আরম্ভ করল, পুলিস-থানায় গিয়ে জড়ো হল।

১১টা ৪০ মিনিট। প্রিটোরিয়া থেকে সেবর্ জেট্ এরোপ্লেন উড়ে এল। বিকট তীক্ষ্ণ কর্কশ আওয়াজ ক'রে জনতার ওপর ছোঁ মারার মতো নেমে এল কয়েকবার। ভেরীনিগিং-এর আরেকদিকে এই ক'রে ২০ হাজার মানুষকে সেদিন খানিকটা আগে ছত্রভঙ্গ করা হয়েছিল। এখানে জনতা ছত্রভঙ্গ হল না। এরোপ্লেনগুলোর দিকে ঘুষি দেখাল, টুপী উড়িয়ে বিদ্রূপ করল।

বেলা ১২টা নাগাদ থানার সামনে জনতার সংখ্যা কেউ বলে ৩০০০ থেকে ৫০০০, কেউ বলে ২০০০০; পুলিস বলে ১৫০০০, সরকার বলে ২০০০০; এক্ষেত্রে সংখ্যা বাড়িয়ে বলার দিকে সরকারের ঝোঁক ছিল।[১০]

থানার সামনে একটা পাঁচ ফুট উঁচু তারের বেড়া, তার এ পাশে জনতার ভীড়। বেড়ার ওধারে বন্দুক উঁচিয়ে পুলিস। মাঝে মাঝে দু-একটা ছেলে বেড়া ডিঙিয়ে বা বেড়ার ফাঁক দিয়ে ঢুকে পড়েছিল, তারা গ্রেপ্তার হল।

পুলিসের বিবরণ অনুসারে এর পর ওই রকম আরেকজনকে ধরতে গিয়ে ধস্তাধস্তি হয়, জনতা ইঁটপাটকেল ছুঁড়তে থাকে, এবং বেড়ার ওপর প্রচণ্ড চাপ দিয়ে ঠেলতে থাকে। জন সেল্‌বি দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারের বক্তব্য অনুসারে ইতিহাস লিখেছেন; তাঁর বইয়ে রয়েছে, একজন পুলিসম্যান এসময় স্মরণ করল যে 'কেটো ম্যানর'-এ জনতা থানার মধ্যে ঢুকে ৯ জন পুলিস-কনস্টেবলকে মেরে ফেলেছিল। অফিসারের হুকুম ছাড়াই এই পুলিসম্যানটি গুলী চালাল তিনবার। সঙ্গে সঙ্গে আরো পঞ্চাশজন পুলিস গুলী চালাতে শুরু করে দিল, এবং কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে ৪৭৬টা বুলেট জনতাকে বিদ্ধ করল।[১১]

নর্মান ফিলিপস প্রত্যক্ষদর্শী সাংবাদিকদের বিবরণ উল্লেখ

করেছেন। তাতে দেখা যায়, জনতার মেজাজ ছিল শান্ত, হাসি-তামাশাই বেশি হচ্ছিল। প্রথম গুলীর আওয়াজ শুনে মানুষগুলো ফাঁকা আওয়াজ মনে করেছিল। ফোটোগ্রাফে দেখা যায়, হাসতে হাসতেই তারা উল্টোদিকে ঘুরে দৌড়ে সরে যাচ্ছিল; পেছন থেকে গুলী লেগে এক এক জন পড়ে যাবার পর, এবং রক্ত বইতে দেখার পর জনতা বুঝতে পারে কি হচ্ছে। ততক্ষণে ৬৯ জনের প্রাণ গেছে এবং ১৮০ জন জখম হয়ে রাস্তায় পড়ে আছে। বেশির ভাগ মানুষকেই পেছন থেকে গুলী করা হয়েছিল।

বেলা ছুটোর মধ্যে ঘটনা শেষ। চারটে নাগাদ ঝড় বিদ্যুৎ, তারপর এক পশলা বৃষ্টি। রাস্তায় রক্তের দাগ ধুয়ে গেল।

কেপ টাউনের পাশে ৮ মাইল দূরে লাঙ্গা এবং নায়াঙ্গা থেকে ২১শে মার্চ কেউ কাজে যায়নি। নায়াঙ্গা পুলিস-থানার সামনে ১৫০০ মানুষ কারাবরণ করতে জমা হয়েছিল। লাঙ্গা থানার দিকে ৫০০০ মানুষের মিছিল চলছিল। এই মিছিলের নেতা ছিলেন ২১ বছর বয়সী ছাত্র ফিলিপ ক্গোসানা, তাঁর পরনে হাফ্প্যাণ্ট, রঙ-উঠে-যাওয়া নীল সোয়েটার, একটা ঢিলে কোট।

লাঙ্গা'র যন্ত্রণা ছিল। কেপ প্রদেশের পশ্চিমভাগ শ্বেতাঙ্গ ও মিশ্রবর্ণদের এলাকা বলে ঘোষিত হবার পর এ অঞ্চল থেকে হাজার হাজার আফ্রিকান পরিবারকে জবরদস্তি সরিয়ে দেওয়া হয়। আফ্রিকান শ্রমিক-কর্মচারীদের এখানে থাকতে দেওয়া হয়, কিন্তু তাদের বৌ-ছেলেমেয়েকে সরিয়ে দেওয়া হয়। লাঙ্গায় ৫০০০ লোকের থাকার কথা, অন্যত্র জায়গা না পেয়ে এখানে ২৫০০০ লোক গাদা-গাদি করে বাস করত, তার মধ্যে মেয়েদের সংখ্যা প্রায় ২০০০। ১৮০০০ পুরুষকে রাখা হয়েছিল সরকারের বানানো গুদামঘরে, আফ্রিকানরা এগুলোকে কটু ব্যঙ্গ করে বলে 'ব্যাচেলর-কোয়ার্টার'—ব্রহ্মচারীনিবাস।

পুলিস-থানার কাছাকাছি মিছিলের সামনে পুলিসবাহিনী এল।

ফিলিপ মিছিল থামিয়ে নিজে এগিয়ে গেলেন, বললেন, 'আমাদের গ্রেপ্তার কর।' পুলিস গ্রেপ্তার করল না, শুধু বলল, থানার কাছে গেলে গুলী চালানো হবে। ফিলিপ শান্তিপূর্ণভাবে মিছিল ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন। কিন্তু পুলিস লাঙ্গার ভেতরে ঢুকল, লোকের ভীড় হঠাতে ব্যাটন চালাল। জনতাকে শান্ত করার কেউ ছিল না—পুলিসের ওপর ইঁট-পাটকেল পড়ল। গুলী চলল,—দুইজন নিহত, ৪৯ জন জখম।

এবার লাঙ্গা ক্ষেপে গেল। সারারাত ধরে আগুন জ্বলল—'বান্টু'-স্কুল পুড়ল; গীর্জা, লাইব্রেরী, সরকারী অফিস সব জ্বলতে থাকল।

ততক্ষণে দক্ষিণ আফ্রিকার সান্ধ্য সংবাদপত্রে খবর ছড়িয়ে পড়েছে। 'শার্পভিল্', 'লাঙ্গা'—পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত শব্দ দুটো ছুটছে রেডিও, টেলিগ্রাম, টেলিফোন, টেলেক্স মারফৎ। সংবাদ-এজেন্সীগুলোর দপ্তরে দপ্তরে জিজ্ঞাসা—আলজিরিয়া, কিউবা, এবার কি দক্ষিণ আফ্রিকায় শুরু হল?

আফ্রিকানদের ঘরে ঘরে ৭১টা মৃত্যুর অসহ্য মোচ্ড়ানি, অক্ষম ক্রোধের যন্ত্রণা।

এ-এন-সি দলবাজী ঝেড়ে ফেলে দাঁড়াল। লুটুলি ডাক দিলেন, পরের সোমবার ২৮শে মার্চ জাতীয় শোকদিবস, কর্মবিরতি।

কিন্তু সবুকোয়ে আরো বেশি আগে বাড়বেনই। হাজত থেকে তিনি বার্তা পাঠালেন,—একদিন নয়, গোটা সপ্তাহ কর্মবিরতি।

লাঙ্গা-নায়াঙ্গায় ২২শে মার্চও কেউ কাজে যায়নি। ২৪শে মার্চ পুলিস লাঙ্গায় আবার ঢুকল, যাকে সামনে পেল মেরেপিটে টেনে-হিঁচড়ে বাসে বোঝাই করে কেপ টাউনে খাটাতে নিয়ে গেল। ২৫শে মার্চ ফিলিপ কৃগোসানা ১৫০০ মানুষের মিছিল নিয়ে কেপ টাউনে ক্যালেডন স্কোয়ার পুলিস-থানার সামনে এলেন, "পাস্ নেই, আমাদের গ্রেপ্তার কর।"

পুলিস বলল, "পাস্ দেখার সময় নেই, হাজতে এত লোকের

জায়গা নেই।” ফিলিপ আবার শান্তিপূর্ণ মিছিল ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন।

২৬শে মার্চ অকস্মাৎ পুলিসের বড়কর্তা ঘোষণা করলেন, পুলিস পাস্ দেখতে চাইবে না এবং পাস্-আইন ভঙ্গ করার দায়ে কোন 'বাণ্টু'কে গ্রেপ্তার করা হবে না।

পাস্-আইনের অবসান নয়, পুলিসের প্রতি একটা সাময়িক নির্দেশ। তবু জনতার প্রচণ্ড উল্লাস। সরকার বুঝি হাঁটু ভেঙে পড়ল।

২৭শে মার্চ আলবার্ট লুটুলি প্রিটোরিয়ার রাজপথে বিপুল জনতার মাঝে দাঁড়িয়ে নিজের 'পাস্' পোড়ালেন। সরকারের কৌশলবাজীর পাল্টা জবাব। হাজার হাজার মানুষ 'পাস্' পোড়াতে শুরু করে দিল। জোহানেসবার্গের 'সান্‌ডে টাইম্‌স্' পত্রিকায় লুটুলি'র পাস্-পোড়ানোর ছবি ছাপা হল।

২৮শে মার্চ দেশজোড়া হরতাল। শহীদদের স্মরণে সর্বত্র বিশাল শোকমিছিল। নানা দেশে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের বিরুদ্ধে নিন্দাবাদ। বিশ্বরাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা-পরিষদে ক্ষোভ ও নিন্দাসূচক প্রস্তাব।

৩০শে মার্চ সরকার 'জরুরী অবস্থা' ঘোষণা করল। দেশজোড়া ধরপাকড় আবার শুরু হয়ে গেল। পাস্-আইনে গ্রেপ্তার বাড়তে থাকল।

৩০শে মার্চ ফিলিপ ক্‌গোসানা ৩০ হাজার মানুষের মিছিল নিয়ে কেপ টাউনের দিকে রওনা হলেন। শহরে তখন বিপদসূচক ঘণ্টা বাজানো হচ্ছে, হেলিকপ্টার উড়ছে, সৈন্যবাহিনী তলব হয়েছে, আর্মার্ড-কার ছুটছে। শহরে ঢুকে ফিলিপ আবার শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ জানিয়ে মিছিল নিয়ে ফিরে গেলেন—পরের দিন বিচারমন্ত্রী তাঁদের এক ডেপুটেশনের বক্তব্য শুনবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল।

রাত্রিবেলা কয়েক হাজার সৈন্য ও নৌসৈন্য পাঠিয়ে লাঙ্গা-নায়াঙ্গা ঘেরা হল। ভোরবেলা হেলিকপ্টার থেকে লাউডস্পীকারে হুকুম জারা হল, সকাল সাড়ে সাতটার মধ্যে কেপ টাউনে কাজ করতে যেতে হবে, তারপর আর কাউকে যেতে বা আসতে দেওয়া হবে না। জোহানেসবার্গ থেকে দুটো বিমান এসেছিল, বাছাই-করা ঠ্যাঙাড়ে পুলিস নিয়ে।

ফিলিপ বিচারমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। তাঁকে সেখানে গ্রেপ্তার করা হল। লাঙ্গা-নায়াঙ্গার কেউ কাজে গেল না।

লাঙ্গা-নায়াঙ্গায় খুচরো গ্রেপ্তার, প্রহার ও গুলীবর্ষণ চলছিল। ৪ঠা এপ্রিল পাইকারী সন্ত্রাস শুরু হল—একই দিনে কেপ টাউনে, লাঙ্গায়, নায়াঙ্গায়। 'আফ্রিকান দেখলেই মার'—পুলিসের তাই নির্দেশ ছিল। চাবুক, ব্যাটন, মাঝে মাঝে রিভলভারের গুলী, মাঝে মাঝে রাইফেল, স্টেনগান্। নায়াঙ্গা থেকে ১৫২৫ জনকে মারতে মারতে কেপ টাউন পর্যন্ত দু'মাইল রাস্তা হাঁটিয়ে নিয়ে আসা হল। হাসপাতালগুলোয় ব্যাণ্ডেজ ফুরিয়ে গেল।

প্যাট্রিক ডানকান এবং নর্মান ফিলিপস এই দিনের কেপ টাউনের ঘটনাবলীর প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে বিবরণ দিয়েছেন।[১২] ৯ই এপ্রিল নাগাদ নিহতের সংখ্যা ৮৩ জন, আহতের সংখ্যা ৩৬৫ জন; কৃষ্ণকায় পুলিস ৩ জন নিহত হয়েছিল, আহত ২৬ জন; শ্বেতাঙ্গ পুলিস একজনও নিহত হয়নি, আহত হয়েছিল ৬০ জন।[১৩]

॥ চার ॥

৮ই এপ্রিল তারিখে সরকার এ-এন-সি ও পি-এ-সি উভয় সংগঠনকেই বে-আইনী ঘোষণা করল। কয়েক হাজার মানুষকে গ্রেপ্তার করা হল।

এ-এন-সি ইতিমধ্যে অলিভার তাম্বো-কে বিদেশে পাঠিয়ে দিয়েছিল। ভারতীয় কংগ্রেসও ডাঃ দাদুকে বিদেশে পাঠিয়ে

দিয়েছিল। তাছাড়া কয়েকশত কর্মী বেচুয়ানাল্যাণ্ডে, বাসুটোল্যাণ্ডে, কেউ কেউ আরো দূরে, সরে গিয়েছিলেন। আলবার্ট লুটুলি এবং এ-এন-সি'র, পি-এ-সি'র, ভারতীয় কংগ্রেসের বহু নেতা ও কর্মীরা তো বটেই, শ্বেতাঙ্গ লিবারাল পার্টির চেয়ারম্যান পিটার ব্রাউন ও অন্যান্য নেতারা প্রায় সকলেই গ্রেপ্তার। বিনাবিচারে আটক বন্দীর সংখ্যা হল ১৯০৮ জন, তার মধ্যে ৯৫ জন শ্বেতাঙ্গ; তাছাড়া, জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ও মামলা-বাবদে গ্রেপ্তারের সংখ্যা, ৬ই মে পর্যন্ত, আরো ১৮ হাজার।[১৪] পুলিসের তাণ্ডব সারা দেশ জুড়ে।

৪ঠা মে তারিখে রবার্ট সবুকোয়েকে তিন বৎসরের কারাদণ্ড দেওয়া হল। লেবাল্লো ও আরো ৩ জনের দুই বৎসরের সাজা হল। ফিলিপ ক্‌গোসানা সবুকোয়ে-লেবাল্লোর নির্দেশ অমান্য করে জামীন নিয়েছিলেন, তিনি গোপনে দেশ থেকে চলে গেলেন।[১৫]

৩১শে মে 'সাউথ আফ্রিকা ইউনিয়ন' রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর পঞ্চাশ বৎসর পূর্তি-দিবস। নাটালে আলবার্ট লুটুলির স্ত্রী, মণিলাল গান্ধীর বিধবা (১৯৫৬ সালে মণিলালের জীবনাবসান হয়েছিল), ইসমাইল মীরের স্ত্রী ফতিমা এবং আরো কয়েকশো মানুষ সারারাত জেগে উপবাস ও প্রার্থনা সভা করলেন—হাজার হাজার বন্দীর স্মরণে। তাঁদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন লিবারাল পার্টির নেতা, খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ্ অ্যালান প্যাটন।[১৬]

জুন মাসের ৬ তারিখে ট্রান্সকেইয়ের আফ্রিকান গ্রামাঞ্চলে আরেক বিদ্রোহ ফেটে পড়ল। এই অঞ্চলে শ্বেতাঙ্গ সরকার শাসন চালাচ্ছিল বেতনভোগী আফ্রিকান গোষ্ঠীপ্রধানদের মারফতে। ১৯৫৮ সালে একজন অত্যন্ত নিন্দিতচরিত্র ও নিষ্ঠুরস্বভাব ব্যক্তিকে গোষ্ঠী-প্রধান-অধিপতির ক্ষমতার সঙ্গে চীফ ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতাও দেওয়া হয়। এ লোকটা ভয়ঙ্কর অত্যাচার চালাচ্ছিল। ১৯৬০ সালের মার্চে পাহাড়ে পাহাড়ে কৃষকদের জমায়েতে এসব বিষয় আলোচনা হচ্ছিল। গোষ্ঠীপ্রধানরা ও তাদের অনুচররা এসব বেআইনী

জমায়েতের খবর পুলিসের কাছে পৌঁছে দিচ্ছিল। কৃষকরা এরপর এইসব গুপ্তচরদের ঘর জ্বালিয়ে দিয়ে এদের গ্রাম থেকে তাড়িয়ে দিতে শুরু করে। বিজানা জেলায় জুন মাসে ২৭টা ঘর জ্বালানো হয়।

৬ই জুন তারিখে দুই পাহাড়ের মাঝে এক উপত্যকায় একটা জমায়েতের ওপর পুলিসী আক্রমণ শুরু হয়। আকাশে দুটো এরোপ্লেন ও একটা হেলিকপ্টার উড়ছিল, সেগুলো থেকে কাঁদানে-গ্যাসের বোমা আর ধোঁয়ার বোমা ফেলা হয়; মাটির ওপর দুইদিক থেকে আর্মার্ড কার দিয়ে আক্রমণ করা হয়। হতাহতের সংখ্যা জানা গেল না। কিন্তু দুইদিন পরে ১১ জন মানুষের মৃতদেহ পাওয়া গেল, কুকুরে-শেয়ালে ছিঁড়ে-খাওয়া অবস্থায়। ১৮ জনকে দেড় বছর থেকে দু'বছর পর্যন্ত সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়, সেই সঙ্গে ছয় ঘা করে চাবুক।[১৭] ১৯৬০-৬১ সালে এসব এলাকায় কার্যতঃ একটা অভ্যুত্থান ঘটেছিল, বিকল্প রাষ্ট্রব্যবস্থার ভ্রূণ দেখা গিয়েছিল। কিন্তু সশস্ত্র সংগ্রামের ব্যাপক প্রস্তুতি ছিল না। খুচরো সংঘর্ষের বেশি বড় আক্রমণের মোকাবিলা করার মতো পরিকল্পনা বা সংগঠন ছিল না। ১৯৬০ সালের শেষে নেতৃস্থানীয় সমস্ত কর্মীই গ্রেপ্তার হয়ে গিয়েছিল। তারপর প্রতিহিংসার বশে ৮ জন গোষ্ঠীপ্রধানকে হত্যা করা হয়। এরপর ফাঁসীর মিছিল। ১৯৬১ সালের অগস্ট থেকে অক্টোবর মাসের মধ্যে ৩০ জন সংগ্রামীর ফাঁসী হল। গ্রামগুলো ঘিরে, হেলিকপ্টার নামিয়ে, প্রত্যেকটি ঘরে পুলিস ঢোকে। হাজার হাজার মানুষকে গ্রেপ্তার করা হয়, অবর্ণনীয় অত্যাচার চালানো হয়।[১৮]

১৯৬০ সালের ৩০শে মার্চ যে 'জরুরী অবস্থা' ঘোষণা করা হয়েছিল, ৩১শে অগস্ট তারিখে তার অবসান ঘোষণা করা হয়। ট্রান্সকেই অঞ্চলে কিন্তু ১৯৬০ সালের নভেম্বরে আবার 'জরুরী অবস্থা' ঘোষণা করা হয়েছিল। ১৯৬৩ সালে 'জরুরী অবস্থা' বহাল; দশজনের বেশি লোকের জড়ো হওয়া নিষিদ্ধ; গোষ্ঠীপ্রধানদের বিরুদ্ধে 'অসম্মানসূচক কথা' বললে কঠোর কারাদণ্ড; এবং বিনাবিচারে

অনির্দিষ্টকাল আটক রাখার বন্দোবস্ত বহাল ; সেই অবস্থাতেই এক তথাকথিত 'নির্বাচন' করানো হয়, 'বান্টু স্বায়ত্ত-শাসন' আইনে। 'স্বায়ত্ত-শাসন' ব্যবস্থা হল, ৪৫ জন ওইভাবে 'নির্বাচিত' এবং ৬৪ জন সরকার কর্তৃক মনোনীত গোষ্ঠীপ্রধান দিয়ে।[১৯]

দক্ষিণ আফ্রিকার বাকী অংশে ১৯৬০ সালের ৩১শে অগস্ট 'জরুরী অবস্থা অবসান' ঘোষণা করাও একটা ফাঁকি। যেসব আইন সরকার বানিয়েছিল তাতে আলাদা ক'রে 'জরুরী অবস্থা' রাখা অনাবশ্যক হয়ে গিয়েছিল।

॥ পাঁচ ॥

১৯৬০ সালের ৩০শে জুন বেলজিয়ান কঙ্গোয় বেলজিয়ানরাজ ক্ষমতা হস্তান্তর করল। পাট্রিস্ লুমুম্বা প্রধানমন্ত্রী হলেন। পাঁচদিন পরে গোলযোগ শুরু হল। তামাখনির মালিক 'য়ুনিয়ঁ মিনিয়্যার' কোম্পানী, মার্কিন সি-আই-এ, এবং শ্বেতাঙ্গ সামরিক অফিসারকুল কঙ্গোয় বীভৎস গৃহযুদ্ধ চালাল—চম্বে, মোবুটু প্রভৃতি দেশী দালালদের শিখণ্ডী রেখে। লুমুম্বাকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়।

দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ সরকার এরপর থেকে বারবার বলতো —'কঙ্গো'। উদারনীতিক মহলে আতঙ্ক এবং আফ্রিকানদের মধ্যে হতাশা সৃষ্টি করার একটা মন্ত্র হয়ে উঠেছিল ওই শব্দটা।

১৯৬০ সালের সেপ্টেম্বরে ভেরওর্ট ইংরেজীভাষী শ্বেতাঙ্গদের প্রতি আবেদন জানালেন, দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গদের পূর্ণ ঐক্য সাধনের জন্য এবং কঙ্গোর মতো বীভৎস কাণ্ড এড়াবার জন্য দক্ষিণ আফ্রিকাকে 'সাধারণতন্ত্র' করার প্রস্তাবে সম্মতি দাও ; বোয়ারযুদ্ধের তিক্ত স্মৃতি তাহলে মুছে যাবে। অক্টোবরে এই প্রশ্নের ওপর গণভোট ('রেফারেণ্ডাম') করা হল। 'গণ' মানে অবশ্য শ্বেতাঙ্গ 'গণ'। এক বিচিত্র অবস্থা ; উদারনীতিক ইংরেজীভাষীরা বৃটিশরাজ-ভক্ত, তাঁরা অনেকে 'সাধারণতন্ত্র' করার বিরুদ্ধে। আবার, প্রগতিবাদী যথার্থ

সাধারণতন্ত্রী বহু মানুষ দেখছিলেন এই 'সাধারণতন্ত্র' ফাসিস্ট-শাসনকে পাকাপোক্ত করার ব্যবস্থা ; তাঁরাও এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ; অবশ্য বৃটিশরাজ থেকেই বা যে কি ভাল হচ্ছিল তা তাঁরাও বলতে পারতেন না। গণভোটে ভেরওর্টের প্রস্তাব সামান্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেল ; পক্ষে ৮,৫০,৪৫৮ ভোট, বিপক্ষে ৭,৭৫,৮৭৮ ভোট।

'সাধারণতন্ত্র' হবার পর বৃটিশ কমনওয়েলথের সদস্য থাকতে হলে একটা বিশেষ সিদ্ধান্ত প্রয়োজন। ১৯৫১ সালে ভারতে সাধারণতন্ত্র ঘোষিত হবার পর এই ব্যবস্থা হয়েছিল, আইনতঃ সেটা একটা নজীর। ওই নজীর অনুসারে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার কমনওয়েলথের সদস্য থাকার জন্য আবেদন করল। ১৯৬১ সালের মে মাসে লণ্ডনে কমনওয়েলথ-প্রধানমন্ত্রী-সম্মেলনে বিষয়টি বিচার হল।

দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণ বৈষম্য ও জাতিবৈষম্য ব্যবস্থা সম্বন্ধে তীব্র প্রতিবাদ ক'রে এই আবেদনের বিরোধিতা করেন টাঙ্গানিকার জুলিয়াস নীয়েরেরে, ঘানার নক্রুমা, এবং ভারতের নেহরু। এই প্রতিবাদের মুখে ভেরওর্ট আবেদন প্রত্যাহার করে বৃটিশ কমনওয়েলথের সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকার সম্পর্কচ্ছেদ করেন। কিন্তু বৃটেনের সঙ্গে বিশেষ অর্থনৈতিক সম্পর্কের তাতে কোন হানি হয়নি, এবং বৃটিশ সরকার রাজনৈতিক ভাবেও দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারকে নানাবিধ সাহায্য-সমর্থন করে চলেছে।

১৯৬১ সালের গোড়ায় দক্ষিণ আফ্রিকায় কয়েকজন নেতার ওপর নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ শেষ হয়েছিল। এ-এন-সি ও পি-এ-সি নিষিদ্ধ, হয়তো সেই কারণে অবস্থাটা দেখবার জন্যই সরকার এঁদের ওপর নতুন নিষেধাজ্ঞা জারী করেনি। আলবার্ট লুটুলি'র ওপর ১৯৫৯ সালে পাঁচ বছরের নিষেধাজ্ঞা জারী হয়েছিল, সেটার মেয়াদ তখনো ফুরোয়নি।

নেলসন মাণ্ডেলার ওপর নিষেধাজ্ঞার মেয়াদ শেষ হয়েছিল। নয়

বৎসর পরে নেলসন জনসভায় হাজির থাকার ও বক্তৃতা করার স্বাধীনতা পেলেন। কয়েকমাসের স্বাধীনতা। নেপথ্যে আয়োজন করে পিটারমারিৎসবার্গ শহরের উপকণ্ঠে মার্চ মাসে এক গণসম্মেলন ডাকা হল। পুলিস তল্লাসী-হামলা চালিয়ে ১৩ জন উদ্যোক্তাকে গ্রেপ্তার করল। তার মাঝেই সম্মেলন হল। এক 'ন্যাশনাল অ্যাকসন কাউন্সিল' গঠিত হল, নেলসন তার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হলেন। সম্মেলনে নেলসনের ভাষণ খুব সময়োপযোগী হয়েছিল। নেলসন সামনে এলেন, অন্য নেতারা আড়ালে থাকলেন।

নেলসন ঘোষণা করলেন, দক্ষিণ আফ্রিকায় বর্ণ বৈষম্য অবসান করে নতুন রাষ্ট্রবিধান প্রণয়নের জন্য এক জাতীয় সম্মেলন করতে হবে। সরকার 'সাধারণতন্ত্র' ঘোষণার তারিখ ধার্য করেছিল ৩১শে মে; তার আগে এই দাবী না মানলে লাগাতার তিনদিন হরতাল-ধর্মঘট করা হবে।

নেতাদের ধরার জন্য পুলিস ব্যাপক তল্লাসী চালিয়েও ধরতে পারল না। ওআলটার সিসুলু ও নেলসন মাণ্ডেলা গোপনে ছদ্মবেশে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরলেন মার্চ থেকে মে পর্যন্ত, হরতাল-ধর্মঘট সংগঠিত করার প্রচেষ্টা চালালেন। পি-এ-সি'র নেতারা হরতাল-ধর্মঘটের বিরুদ্ধে তীব্রভাবে প্রচার করছিলেন—এ-এন-সি'র নেতাদের হঠকারী ব'লে।

২৯শে মে হরতাল-ধর্মঘট শুরু হবার কথা। পুলিস-মিলিটারীর ব্যাপক আয়োজন। রাত্রিবেলায় আফ্রিকান বস্তি-শহরগুলোর ওপর হেলিকপ্টার ওড়ে খুব নীচু দিয়ে, সার্চলাইটের তীব্র আলোর ঝলক ফেলে।

তথাপি বেশির ভাগ জায়গায় শতকরা ৭৫ ভাগ হরতাল-ধর্মঘট হল। কিন্তু দ্বিতীয় দিনেই নেতারা টের পেলেন, এই সামরিক যন্ত্রের সামনে দাঁড়িয়ে তিনদিন ধর্মঘট চালানো যাবে না। দ্বিতীয় দিনে নেলসন হরতাল-ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নিলেন।

তিনদিন লাগাতার হরতাল-ধর্মঘটের পরিকল্পনা অন্যদিক থেকেও ভুল। মানুষ তিনদিন কাজকর্ম দোকান বাজার বন্ধ করে বসে থাকবে, তা হয় না। এ রকম লাগাতার ধর্মঘট-হরতাল যদি প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ক্ষমতা দখল ক'রে বিকল্প রাষ্ট্র ও সরকার প্রতিষ্ঠা না করে, তাহলে এতে জনশক্তিই বেশি বিপন্ন হয়। জীবনযাত্রা অচল রেখে গণসংগ্রাম বেশিদিন চলে না, বিকল্প জীবনযাত্রার বন্দোবস্ত করতে হয়। দীর্ঘ মুক্তিযুদ্ধের সময় মুক্ত অঞ্চলে কৃষি, শিল্প, স্কুল, হাসপাতাল সবই চালাতে হয়।

১৯৬১ সালের জুন মাসে নেতাদের গোপন বৈঠক বসল। এ-এন-সি'র সুদীর্ঘ শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের ফলে জন-জাগরণ ব্যাপক হয়েছে, কিন্তু সরকারের কাছ থেকে এসেছে ক্রমবর্ধমান অত্যাচার অবিচার শোষণ সন্ত্রাস। এখন শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের পথও বন্ধ। অজস্র আইনের নাগপাশে সব বাঁধা। তার ওপর সামান্য চাঞ্চল্য দেখলেই পুলিস, মিলিটারী, হেলিকপ্টার, আর্মার্ড কার, মেশিন-গানের সমারোহ। শান্তিপূর্ণ পদ্ধতি ছাড়া আরো কিছু পদ্ধতি চাই।

সিদ্ধান্ত হল, শক্তিপ্রয়োগের জন্য এক বিশেষ সংগঠন গড়া হোক, 'উম্‌কন্‌টো ওএ সিজ্‌ওএ'—'জাতির বর্শা'। শক্তিপ্রয়োগ মানে হত্যা নয়, ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ।

১৯৬১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর উম্‌কন্‌টো প্রথম আঘাত হানল। পোর্ট এলিজাবেথে এবং জোহানেসবার্গে কয়েকটা বিদ্যুৎসরবরাহকেন্দ্র ও সরকারী অফিস ধ্বংস হল। নিজের বোমার আঘাতে সংগ্রামীদের একজন প্রাণ হারালেন।

১৯৬২ সালের গোড়ায় নেলসন গোপনে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে বেরুলেন আফ্রিকা মহাদেশের বিভিন্ন রাজধানীতে যোগাযোগ করতে। ইথিওপিয়ায় আডিস আবাবা শহরে নিখিল আফ্রিকা সম্মেলনে তিনি ভাষণ দিলেন। আলজিরিয়ায় সামরিক শিক্ষা গ্রহণ করলেন।[২০] টাঙ্গানিকা, সুদান, মিশর, লিবিয়া, টিউনিশিয়া, মরক্কো,

মালি, সেনেগাল, গিনি, সিয়েরা লেওন, লাইবেরিয়া, ঘানা, নাইজিরিয়া গিয়ে আফ্রিকান রাষ্ট্রনায়কদের সঙ্গে ও নেতাদের সঙ্গে কথা বললেন। লণ্ডনে গিয়ে লেবার পার্টি ও লিবারাল পার্টির নেতাদের সঙ্গে কথা বললেন।[২১] আবার গোপনে দেশে ফিরলেন।

১৯৬২ সালের অগস্ট মাসে নেলসন অকস্মাৎ ধরা পড়ে গেলেন। বিচার হল। অভিযোগ ছিল—আগের বৎসর মে মাসে হরতাল-ধর্মঘটের ডাক দেওয়া এবং বেআইনীভাবে দেশের বাইরে যাওয়া। উম্‌কন্‌টোর খবর পুলিস তখনো পায়নি। বিচারে নেলসনের পাঁচ বছর কারাদণ্ড হল। বিচারশেষে আদালত থেকে যাবার সময় নেলসন বিচারককে বলে গেলেন 'মেয়াদ-শেষে জাতিবৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আবার চালিয়ে যাব, আমার বিবেকের তাই নির্দেশ।'[২২] তাঁকে রবেন দ্বীপের বন্দীশালায় দ্বীপান্তরিত করা হল।

নেলসন বন্দী হলেন, কিন্তু ১৯৬২-৬৩ সাল জুড়ে অজস্র ধ্বংসাত্মক কাণ্ড ঘটল। ইলেকট্রিক পাইলন, টেলিফোন এক্‌স্‌চেঞ্জ, রেলওয়ে লাইন ও সিগ্‌নাল বোমায় ধ্বংস হল।

পি-এ-সি'র লোকেরা আলাদা সংগঠন করেছিল 'পকো' ('শুধু আমরাই') নাম দিয়ে নিজেদের আফ্রিকান স্বাতন্ত্র্য জাহির ক'রে।

উম্‌কন্‌টো প্রাণনাশের বিরুদ্ধে ছিল। কিন্তু পকো'র সেরকম নিষেধ ছিল না। তাছাড়া ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের পর পুলিসী সন্ত্রাস যখন চলে, তখন সাধারণ মানুষের মনেও প্রতিহিংসার ঝোঁক জাগে। হত্যাকাণ্ড ঘটছিল।

কেপ প্রদেশের পশ্চিমাঞ্চলে 'পার্ল' নামে বস্তি-শহরে পুলিসের চর সন্দেহে আটজন অ-শ্বেতাঙ্গকে হত্যা করা হয়েছিল। পুলিস 'পার্ল'-এ ঢুকে অত্যাচার চালাবার পর এক ক্ষিপ্ত জনতা থানা আক্রমণ করে এবং শ্বেতাঙ্গ এলাকায় ঢুকে দাঙ্গা শুরু করে। তুইজন শ্বেতাঙ্গ নিহত হয়, গুলিবিদ্ধ হয়ে পাঁচজন আফ্রিকান প্রাণ হারায়। হাজার খানেক মানুষ গ্রেপ্তার হয়েছিল।

১৯৬২ সালে পি-এ-সি নেতা পট্‌লাকো লেবাল্লো দুই বৎসর কারাদণ্ড ভোগের পর মুক্তি পেয়ে বাসুটোল্যাণ্ডে চলে যান। সেখান থেকে তিনি ১৯৬৩ সালের ৮ই এপ্রিল সশস্ত্র অভ্যুত্থান করতে হবে বলে নির্দেশ দেন। ২রা এপ্রিল বাসুটোল্যাণ্ড পুলিস লেবাল্লোর অফিসে হানা দিয়ে প্রায় ১০ হাজার নামের তালিকা নিয়ে যায়। লেবাল্লো আত্মগোপন করেন। ৮ই এপ্রিলের আগেই দক্ষিণ আফ্রিকায় কয়েক হাজার মানুষ গ্রেপ্তার হয়ে যায়। অভ্যুত্থানের ডাক শোনার মতো আর কেউ ছিল না। লেবাল্লো এরপর থেকে বহুনিন্দিত।

২৪শে এপ্রিল ৯০-দিন আটক আইন এবং অন্যান্য আইন জারী হল। ১লা মে একটা আইন হল, কারাদণ্ড ভোগের পরও সরকার ইচ্ছা করলে আটক রাখতে পারবেন। রবার্ট সবুকোয়ের ছাড়া পাবার কথা ৩রা মে। তাঁকে ছাড়া হল না। সবুকোয়েকেও রবেন দ্বীপে নিয়ে যাওয়া হল।

জুন মাস নাগাদ 'পকো'র কার্যকলাপের সম্পর্কে গ্রেপ্তারের সংখ্যা হল ৩২৪৬ জন। এদের মধ্যে ১২৪ জন হত্যাপরাধে দণ্ডিত হয়। মে মাস নাগাদ উম্‌কন্‌টো'র ধ্বংসাত্মক কাজের সংখ্যা প্রায় ২০০।

২০শে জুন ওআলটার সিসুলু'র স্ত্রী আলবার্টিনা এবং তাঁর ১৭ বছরের ছেলে ম্যাক্স বন্দী হলেন। আলবার্টিনাকে ৯০ দিন আটক করা হল, ওই আইনের প্রথম মহিলা বন্দী। ২৬শে জুন রেডিওতে ওআলটারের কণ্ঠস্বর শোনা গেল গোপন বেতারকেন্দ্র থেকে।

৯০-দিন আইনে আটকের সংখ্যা বাড়ছিল। সেইসঙ্গে পুলিসের গুপ্তচর বানানো এবং রাজসাক্ষী বানানো হচ্ছিল, নৃশংস অত্যাচার ক'রে। ১৯৬৩ সালে ৩,৩৫৫ জনকে আটক করা হয়, তার মধ্যে ১১৮৬ জন ৯০-দিন আইনে।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

‘রিভোনিয়া ফার্ম’

॥ এক ॥

১৯৬৩ সালের ১২ই জুলাই। জোহানেসবার্গের উপকণ্ঠে রিভোনিয়া গ্রাম—সেখানে ‘লিলিস্‌লীফ্‌ ফার্ম’ নামে এক খামার-বাড়ি। খামার বাড়ির মালিক আর্থার গোল্ডরাইথ্‌, সম্পত্তিটি আরেকজনের কাছ থেকে ইজারা নিয়েছেন। ইজারা নেওয়ার আইনগত বন্দোবস্ত করে দিয়েছেন হ্যারল্ড ওল্‌পে,—জেম্‌স্‌ ক্যাণ্টর-এর অ্যাটর্নী-ব্যবসায়ের পার্টনার এবং জেম্‌সের ভগ্নীপতি।

খামারবাড়িটি কার্যতঃ কমিউনিস্ট পার্টির গুপ্ত হেডকোয়ার্টার। উম্‌কনটো’র নেতাদের গুপ্ত আশ্রয় ও পরামর্শস্থলও এখানে। ১২ই জুলাই সকালে এখানে ছিলেন গোভান ম্‌বেকি ও রেমণ্ড মাহ্লাবা। দুইজনেই কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন—দুইজনই নিষিদ্ধ ব্যক্তি। ১৯৬২ সালে গোভান বিস্ফোরক দ্রব্য আইনে গ্রেপ্তার হয়ে পাঁচমাস আটক ছিলেন, তার মধ্যে তিন মাস ৯০-দিন আইনে নির্জনকক্ষে আটক। তারপর থেকে গোপন জীবন। গোভান ট্রান্সকেই অঞ্চলের কৃষকদের সংগঠক নেতা, রেমণ্ড পোর্ট এলিজাবেথ-এর ট্রেড ইউনিয়ন নেতা।

বিকেল তিনটে নাগাদ একটা মোটরগাড়ি চালিয়ে এলেন ডেনিস গোল্ডবার্গ। তাঁর সঙ্গে দু’জন। ওআলটার সিস্থুলু ও আহম্মদ কাথরাডা। তিনজনেরই ছদ্মবেশ। একটু পরে আরো দুটো গাড়ি এল—লায়নেল বার্ণস্টিন এবং বব্‌ হেপ্‌ল্‌ এসে পৌঁছলেন।

এঁরা কেউ জানতেন না, একটু দূরে গোপনে পুলিস অপেক্ষা করছিল। কয়েক মাস ধরে পুলিস ওআলটারকে তন্নতন্ন করে খুঁজছিল—তাঁর নামে হুলিয়া জারী হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ৯০ দিন আইনে আটক এক বন্দীকে নির্যাতন ক’রে, মুক্তির লোভ ও ৩০০০

পাউণ্ড পুরস্কারের লোভ দেখিয়ে, তার কাছ থেকে কথা বার করে রিভোনিয়া ফার্ম-এর হদিশ জোগাড় হয়েছিল।

একটু পরেই পুলিসের গাড়ি এল। লায়নেল জানালা দিয়ে দেখলেন সমস্ত জায়গাটা ঘেরা হয়েছে সশস্ত্র পুলিস দিয়ে, তার সঙ্গে অ্যালসেশিয়ান কুকুর।

সবাই ধরা পড়ে গেলেন। সেইসঙ্গে একগাদা কাগজপত্র, নেলসনের ডায়েরী, ধ্বংসাত্মক কাজের পরিকল্পনা, অনেক কিছুই পুলিসের হস্তগত হল।

আরো অনেককে ধরা হল—আর্থার গোল্ডরাইখ, হ্যারল্ড ওল্‌পে, জেম্‌স ক্যাণ্টর ; জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আর্থারের স্ত্রী হ্যাজেল, হ্যারল্ডের স্ত্রী অ্যান মারিয়া এবং আরো অনেককে আটক করা হল। ১২ অগস্ট আর্থার এবং হ্যারল্ড জেলখানা থেকে পালালেন, দেশ ছেড়ে চলে গেলেন। বব্‌ হেপ্‌ল্‌ রাজসাক্ষী হবার কথা দিয়ে জামীনে ছাড়া পেয়েই বিদেশে পালালেন।[১]

রবেন দ্বীপের বন্দিশালা থেকে নেলসন মাণ্ডেলাকে নিয়ে এসে ১ নম্বর আসামী করে অন্যদের সঙ্গে কাঠগড়ায় তোলা হল। অক্টোবরের শেষে মামলা শুরু হল। অভিযোগ—ধ্বংসাত্মক কার্য-কলাপ। সরকার-তরফ ২২২টা ধ্বংসাত্মক ঘটনার জন্য এঁদের দায়ী করেছিল, শেষ পর্যন্ত ২০টার সঙ্গে এঁদের যোগাযোগ প্রমাণ হয়েছিল। জেমস ক্যাণ্টরকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, তিনিও সপরিবারে দেশ ছেড়ে চলে গেলেন। আসামীর কাঠগড়ায় শেষ পর্যন্ত ছিলেন নয়জন। নেলসন, ওআলটার, গোভান, রেমণ্ড, এলিয়াস মৎসোয়ালেদি, অ্যান্‌ড্‌রু ম্‌লাঙ্গেনি—ছয়জন আফ্রিকান ; ডেনিস গোল্ডবার্গ, লায়নেল বার্ণস্টিন—দুইজন শ্বেতাঙ্গ ; আহম্মদ কাথরাডা—একজন ভারতীয়। আসামীপক্ষের ব্যারিস্টার, ব্র্যাম ফিশার। এঁরা দক্ষিণ আফ্রিকার কালো-শাদা-বাদামী মানুষদের সংগ্রামী ঐক্যের প্রায় আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব করছিলেন

বলা চলে। দক্ষিণ আফ্রিকার যা কিছু সৎ ও মহৎ এঁদের মধ্যে সেদিন মূর্ত হয়েছিল।

এঁদের বিচার যখন চলছিল সেই সময়ে আরেক জায়গায় আরেকটা বিচার শুরু হয়েছিল। পোর্ট এলিজাবেথে একজন পুলিসের চর নিহত হয়েছিল। সেই হত্যার সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে এবং ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের অভিযোগে ট্রেড ইউনিয়ন নেতা ভুই-সিলে মিনি এবং আরো দুইজনকে গ্রেপ্তার করে কাঠগড়ায় তোলা হয়েছিল। ১৯৬৪ সালের মার্চ মাসে মিনি ও তাঁর বন্ধুদের প্রাণদণ্ডের আদেশ হয়। ওই হত্যার অভিযোগে পরে আরো তিনজনের প্রাণদণ্ড হয়।

১৯৬৩ সালের ১১ই অক্টোবর বিশ্বরাষ্ট্রসংঘের সাধারণ অধিবেশনে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারকে আহ্বান জানানো হয়, সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের বিনাশর্তে মুক্তি দাও ; সমস্ত রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহার কর, ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের মামলাগুলিও তুলে নাও—কারণ, তোমাদের অন্যায় আইনের প্রতিবাদেই এসব ঘটনা ঘটেছে। ১০৬-১ ভোটে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। বিরুদ্ধে একটি ভোট দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের। ১৯৬৪ সালের জুন মাসে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ আবার দুটো প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল—রিভোনিয়া মামলা প্রত্যাহার করা হোক, সমস্ত বন্দীদের মুক্তি দেওয়া হোক। বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্স ভোটদানে বিরত থাকল।

ভুইসিলে মিনি ও তাঁর সঙ্গীদের ওপর প্রাণদণ্ডাজ্ঞা ঘোষণা হবার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন দেশ থেকে এই প্রাণদণ্ড মকুব করার অনুরোধ জানিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের কাছে বার্তা পাঠানো হয়। প্রায় ২০০০ চিঠি ও টেলিগ্রাম এসেছিল—রাষ্ট্রপ্রধান ও প্রধানমন্ত্রীদের কাছ থেকে ; রাষ্ট্রসংঘের সেক্রেটারী জেনারেল উ থাণ্ট-এর কাছ থেকে ; নিরপেক্ষ রাষ্ট্রসমূহের সম্মেলনের পক্ষে মিশরের প্রেসিডেণ্ট গামাল আবদেল নাসের-এর কাছ থেকে। সমস্ত অগ্রাহ্য করে ১৯৬৪

সালের ৬ই নভেম্বর ভুইসিলে মিনি, উইলসন খাঙ্গিঙ্গা ও জিনাকিলে ম্‌কাবা-কে ফাঁসী দেওয়া হল।

মিনি শ্রমিক ছিলেন, ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠক ছিলেন। সেইসঙ্গে তিনি ছিলেন গীতিকার, কবি এবং গায়ক। ১৯৫২ সাল থেকে তাঁর গম্ভীর খাদের গলায় বহু গান শোনা গিয়েছিল জমায়েতে, মিছিলে, জেলখানায়। অনেক রকম গান। দৃপ্ত তেজী ক্রুদ্ধ গান, আলোড়নে উল্লসিত গান, আবার গভীর দুঃখবেদনায় মন্থর গান। ১৯৫৬ সালে রাষ্ট্রদ্রোহ-মামলায় ১৫৬ জনের মধ্যে মিনি একজন, বন্দীদের কোরাস্ গানের রচয়িতা পরিচালক। সেসময় একটা গান লিখেছিলেন—

'থাথ্ উম্‌থোয়ালো বুটি সিগোড়ুকে
বালিন্‌দিলে উমামা নু বাব্ এখায়া।'

—"জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে চল রে ভাই, বাড়িতে মা বাবা পথ চেয়ে বসে আছে।" দেশান্তরিত ছেলেমেয়েরাও এ গান গাইত।

মিনি ও তাঁর দুই সঙ্গী ফাঁসীমঞ্চে গিয়েছিলেন গান গাইতে গাইতে। প্রিটোরিয়া জেলে সেসময় তিন বছরের কারাদণ্ড ভোগ করছিলেন শ্বেতাঙ্গ কমিউনিস্ট বেন্ টুরক্। তিনি এঁদের জীবনের শেষ রাত্রির কথা লিখেছেন: "শেষ সন্ধ্যাটা অসহ বেদনা,...ধীর মৃদু গলায় গান শোনা যাচ্ছিল...ভোরবেলায় আবার সেই গান, এত সুন্দর যে সহ্য করা যায় না...তারপরে মিনির বিশাল গম্ভীর কণ্ঠস্বরে খোশা ভাষায় বিদায় চাওয়া, নিশ্চিত বিজয়ের আশ্বাস ঘোষণা... তারপর দরজা খোলার শব্দ, তিনটি কণ্ঠস্বরের মিলিত গান একটু একটু করে দূরে মিলিয়ে গেল।"[২]

। দুই ।

নেলসন মাণ্ডেলা কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে অভিযোগের উত্তর দিচ্ছিলেন:

"মাননীয় বিচারপতি, আমি প্রথমেই স্বীকার করে নিচ্ছি যে উম্‌কন্‌টো ওএ সিজ্‌ওএ গঠন করতে যারা উদ্যোগী হয়েছিল, আমি

তাদের একজন, এবং ১৯৬২ সালের অগস্ট মাসে গ্রেপ্তার হওয়ার আগে পর্যন্ত আমি উম্‌কন্‌টো'র কার্যকলাপে এক বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করেছি।...

"ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের পরিকল্পনা আমি করেছিলাম, সেকথা আমি অস্বীকার করি না। অপরিণামদর্শী হঠকারিতার ঝোঁকে আমি এ কাজ করিনি, বলপ্রয়োগমূলক হিংসাত্মক কার্যকলাপ আমার ভালো লাগে বলেও এ কাজ করিনি। শ্বেতকায়তন্ত্র বহু বৎসর ধরে আমাদের জনসাধারণের ওপর স্বৈরাচার শোষণ ও নিপাড়ন চালিয়েছে, তার ফলে যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে সেই পরিস্থিতিকে ধীরস্থিরভাবে বিচার-বিবেচনা করে আমি এ কাজ করেছি।...

"১৯৬০ সালে কর্মবিরতি হবার কথা ছিল শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ। কোনরকম হিংসাত্মক কার্যকলাপ যাতে না হয় সেজন্য আমরা সবাইকে নির্দেশ দিয়েছিলাম, খুব সতর্কভাবে, অনেক যত্ন করে। সরকারের উত্তর এল, নতুন নতুন আরো কঠোর আইন; সৈন্যবাহিনী তলব: সারাসেন ট্যাঙ্ক, সাঁজোয়া গাড়ি, বস্তিতে বস্তিতে সৈন্য পাঠিয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টির জন্য বিপুল শক্তিপ্রদর্শন।...

"এই শক্তিপ্রদর্শনের সামনে আমাদের কি নত হওয়া উচিত ছিল? সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে, তা নিয়ে আমাদের কোন সন্দেহের অবকাশ ছিল না। মাননীয় বিচারপতি, সংগ্রাম চালাতে হবে কিনা আমাদের সামনে প্রশ্ন সেটা ছিল না, প্রশ্ন ছিল—কী ভাবে? আমাদের সামনে অনস্বীকার্য কঠিন সত্য কথা একটা ছিল—পঞ্চাশ বছরেরও বেশিকাল অহিংস আন্দোলন চালিয়ে আফ্রিকান জনসাধারণ পেয়েছে শুধু আরো কঠোর দমনমূলক আইন ও আরো অধিকার-হরণ।...১৯৬১ সালের জুন মাসে আমরা কয়েকজন যখন এই বিষয়ে আলোচনা করি, তখন একথা মানতে হয়েছিল যে অহিংস উপায়ে আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছে, আমাদের সমর্থক-সহযোগীরা আস্থা হারাতে শুরু করেছে, এবং সন্ত্রাসবাদের বিপজ্জনক ঝোঁক সৃষ্টি হচ্ছে।...

"আমরা সিদ্ধান্ত করলাম, উম্‌কন্‌টো ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ করবে। উম্‌কন্‌টোর সদস্যদের কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল—কোন কারণেই মানুষের ওপর আঘাত করবে না, খুন-জখম করবে না। ১৯৬১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর উম্‌কন্‌টোর প্রথম 'অপারেশন' হল; জোহানেসবার্গ, পোর্ট এলিজাবেথ ও ডারবানে সরকারী বাড়ী আক্রমণ করা হয়েছিল। লক্ষ্যগুলোর বাছাই আমাদের নীতির প্রমাণ। প্রাণনাশ যদি উদ্দেশ্য হত, তাহলে আমরা যেখানে মানুষের ভীড় সেসব জায়গা বেছে নিতাম, এরকম ফাঁকা বাড়ী আর বিদ্যুৎ-স্টেশন বাছতাম না।...

"সরকার আরো কড়া ব্যবস্থার ভয় দেখাল।...শ্বেতাঙ্গরা কোন রকম পরিবর্তনের প্রস্তাব করতে পারল না, নিজেদের তোলা প্রাচীরের ভেতরে গুটিয়ে গেল। কিন্তু আফ্রিকানদের কাছ থেকে উৎসাহের সাড়া এল। হঠাৎ আবার আশা এল।..."

শ্বেত-শাসনের স্বরূপ সংক্ষেপে বর্ণনা করে নেলসন বললেন:

"আমরা আফ্রিকানরা বেঁচে থাকার উপযুক্ত মজুরী চাই। আমরা যেসব কাজ করবার মতো যোগ্যতা রাখি সেসব কাজ করতে চাই। আমরা যেখানে কাজ পাব সেখানে বসবাস করার অধিকার চাই। পৃথকভাবে নির্দিষ্ট করা 'ঘেটো'য় আমরা থাকতে চাই না। আফ্রিকান পুরুষ যেখানে কাজ করে সেখানে তার স্ত্রী পুত্র পরিবার নিয়েই সে থাকতে চায়, পুরুষদের হস্‌টেলে অস্বাভাবিক জীবন যাপন করতে বাধ্য হতে চায় না। আমাদের মেয়েরা তাদের পুরুষদের সঙ্গে থাকতে চায়, 'আফ্রিকান রিজার্ভ' এলাকার গ্রামাঞ্চলে স্বামী-থাকতেও-বিধবা হয়ে জীবন কাটাতে চায় না। রাত এগারোটার পরে প্রয়োজন হলে রাস্তায় বেরুবার অধিকার আমরা চাই, শিশুদের মতো ঘরে আটক থাকতে চাই না। আমাদের দেশের যে কোন জায়গায় যাতায়াতের এবং কাজ খোঁজার অধিকার আমরা চাই; লেবার ব্যুরো যেখানে যেতে বলবে সেখানেই যেতে হবে, এ ব্যবস্থা আমরা চাই না।...

"সবার ওপরে, মাননীয় বিচারপতি, আমরা সমান রাজনৈতিক অধিকার চাই, কারণ তা না হলে অন্য সব অবিচার স্থায়ী হয়ে থাকবে।...

"এই আমাদের সংগ্রাম। এ সংগ্রামে আমি নিজেকে সমর্পণ করেছি। শ্বেতকায়-স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে আমি লড়েছি, আমি কৃষ্ণকায় স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধেও লড়েছি। যে সমাজে সব মানুষ পরস্পরের প্রতি সম্প্রীতি নিয়ে এবং সমান সুযোগ ও অধিকার নিয়ে বাস করতে পারবে, তেমন এক গণতান্ত্রিক মুক্ত সমাজের আদর্শকে আমি ভালো-বেসেছি, আমার হৃদয়ে লালন করেছি। এই আদর্শের জন্য বেঁচে থাকার আশা আমি রাখি। কিন্তু, মাননীয় বিচারপতি, এই আদর্শের জন্য প্রয়োজন হলে আমি মরতে প্রস্তুত।"[৩]

নেলসনের ভাষণের শেষে আদালত-ঘরে দর্শক-শ্রোতাদের গ্যালারি থেকে একসঙ্গে অনেকগুলো বুকের ভেতর থেকে চাপা দীর্ঘশ্বাস ধ্বনিত হয়েছিল। তারপর নিঃশব্দ।

এই ভাষণ পৃথিবীর বহু জায়গায় পড়া হয়েছিল।

।। তিন ।।

১২ই জুন, ১৯৬৪। রিভোনিয়া-মামলার রায় দিলেন বিচারক। রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগ ('হাই ট্রিজ্‌ন্') সরকার-তরফ আনেনি ; সে অভিযোগ থাকলে বিচারক ডি ভেট্ প্রাণদণ্ড দিতেন। রায়ে সেকথা উল্লেখ করে দণ্ডাজ্ঞা দেওয়া হল—আটজনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ; লায়নেল বার্ণস্টিন ছাড়া পেলেন। সাতজনকে রবেন দ্বীপের বন্দি-শালায় নিয়ে যাওয়া হল ; ডেনিস গোল্ডবার্গ শ্বেতাঙ্গ, আপার্টহেইট আইনে তাঁকে কালোমানুষদের সঙ্গে একত্র রাখা নিষেধ ; অতএব, ডেনিসকে প্রিটোরিয়া জেলে নিয়ে যাওয়া হল।

রায় ঘোষণা হওয়ার পরের দিন থেকে পরপর কয়েকটা বড় বড় বিস্ফোরণ হল। পোস্ট অফিস, ইলেকট্রিক পাইলন ইত্যাদি আবার

কতকগুলো ধ্বংস হল। জোহানেসবার্গের জেলের প্রাচীর ভাঙার একটা চেষ্টা হল। আবার হাজার খানেক লোক গ্রেপ্তার। এবার শ্বেতাঙ্গ অধ্যাপক, সাংবাদিক, ছাত্রদের গ্রেপ্তারের সংখ্যা কিছু বাড়ল।

৯ই জুলাই ব্যারিস্টার ব্র্যাম ফিশার গ্রেপ্তার হলেন। কয়েকদিন পরে ছাড়া পেলেন। আবার সেপ্টেম্বর মাসে গ্রেপ্তার হলেন। আরো ১২ জন শ্বেতাঙ্গ নরনারীর সঙ্গে তাঁকে কাঠগড়ায় তোলা হল। অভিযোগ—বেআইনী কমিউনিস্ট পার্টির এঁরা সদস্য, ওই পার্টির কাজকর্ম করছেন। লণ্ডনে প্রিভি কাউন্সিলের একটা বড় মামলায় ব্র্যাম তখন বাদীপক্ষের ব্যারিস্টার ; ওই মামলার শুনানীর জন্য তাঁকে পাঁচ হাজার পাউণ্ড জামীনে ছাড়া হলো। ১৯৬৫ সালের জানুয়ারী মাসে জামীনদারের কাছে জামীনের পুরো টাকাটা পাঠিয়ে দিয়ে ব্র্যাম উধাও হলেন। আদালতের কাছে এক চিঠিতে ব্র্যাম জানিয়েছিলেন, গোপন সশস্ত্র সংগ্রামে যোগ দেবার জন্য তিনি উধাও হচ্ছেন। তিনি লিখেছিলেন, "গত ত্রিশ বৎসর ধরে আদালতের মধ্য দিয়ে আমি ন্যায়বিচারের আদর্শের সেবা করার চেষ্টা করেছি ; এখন আর ওভাবে ন্যায়বিচারের আদর্শকে সেবা করা যায় না ; ন্যায়বিচারের আদর্শ এখন যে একমাত্র পথ দেখায়, আমি সেই পথটাই গ্রহণ করলাম।"[৪]

ব্র্যাম দশ মাস ধরে ছদ্মবেশে গোপনে সশস্ত্র সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ১৯৬৫ সালের নভেম্বর মাসে গুপ্ত আশ্রয় থেকে পুলিস তাঁকে গ্রেপ্তার করে। বিচারে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হয়। প্রিটোরিয়া জেলে বন্দিদশায় তাঁর ক্যানসার রোগ হয়েছিল। মরণাপন্ন অবস্থায় ১৯৭৫ সালের ১০ই মার্চ তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়। দু'মাস পরে ৮ই মে তারিখে ৬৭ বছর বয়সে ব্র্যাম ফিশার-এর জীবনাবসান হয়।[৫]

১৯৬৩ থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত উম্‌কন্‌টো এবং অন্যান্য গুপ্ত সংগঠন অনেকগুলো ঘটনা ঘটায়। সবগুলোর খবর এখনও জানার তো সময় আসেনি। অন্যদিকে ১৯৬৩ থেকে ১৯৬৭ পর্যন্ত পাঁচ

বছরে বিনাবিচারে আটক বন্দীর সংখ্যা দাঁড়াল ২,৪০০ তারপর 'টেররিজ্‌ম্ অ্যাক্ট' জারী হলো, বন্দীদের সংখ্যা প্রকাশ নিষিদ্ধ হয়ে গেল। আর লেখাজোখা রইল না। ১৯৬৮ সালে লিবারাল পার্টিকে পর্যন্ত আত্মবিলোপ করতে হলো।

দেশের ভেতরে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের সঙ্গে বাইরে থেকে মুক্তি-সংগ্রামীদের একটা স্রোত বইতে শুরু করেছিল। অনেক মুক্তিসংগ্রামী বিদেশে চলে গিয়ে সেখানে অস্ত্রশিক্ষা ও গ্যেরিলা-পদ্ধতির কৌশল শিক্ষা করে আবার গোপনপথে দেশে ঢুকে সরকারের বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ চালিয়েছেন। অনেকেই ধরা পড়েছেন বা সংঘর্ষে প্রাণ দিয়েছেন। সমুদ্রপথে নৌকায় করে কয়েকটি ছোট ছোট বাহিনী এসেছে। সরকার 'সমুদ্রপথে আগত সন্ত্রাসবাদী'দের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের কয়েকটি মহলা দিয়েছে।[৬]

দেশের ভেতরে এসব ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ কিন্তু সরকারের পতন ঘটাতে পারেনি। ক্রমেই একথা প্রতিপন্ন হয়েছে যে প্রতিবাদ হিসেবে এসব কার্যকলাপের মূল্য অসীম হলেও শুধু এর দ্বারাই অবস্থার পরিবর্তন ঘটানো যাবে না।

স্বাভাবিকভাবেই আরেকটি উপায় ভাবতে হয়েছে। দেশের বাইরে থেকে সামরিক অভিযান চালিয়ে এই সরকারের পতন ঘটানোর প্রচেষ্টার কথা ভাবতে হয়েছে। বিশ্বরাষ্ট্রসংঘকে দিয়ে নিন্দাসূচক প্রস্তাব গ্রহণের অতিরিক্ত কিছু করানো যায়নি—নিরাপত্তা পরিষদে সে পথ রুদ্ধ করেছে বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্স। বিশ্বরাষ্ট্রসংঘের আওতার বাইরে স্বাধীন আফ্রিকান রাষ্ট্রগুলিও দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার জন্য প্রস্তুত নয়, সবাই ইচ্ছুকও নয়। অবশ্য তানজানিয়া বরাবর দক্ষিণ আফ্রিকার মুক্তিসংগ্রামীদের আশ্রয় দিয়েছে, সাহায্য করেছে। আশ্রয় ও সাহায্য আরো কয়েকটি দেশও দিয়েছে।

দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার আরেকদিক থেকে রণক্ষেত্রকে বিস্তার

করেছে গোটা আফ্রিকা-দক্ষিণ জুড়ে। তার প্রধান অনুচর রোডেশিয়ার শ্বেততন্ত্র। সেদিন পর্যন্ত আঙ্গোলা-মোসাম্বিকে পর্তুগীজ সাম্রাজ্যতন্ত্র দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের কাছ থেকে প্রভূত সাহায্য পেয়েছে।

মুক্তিসংগ্রামীদেরও সংগ্রামের ঘাঁটি নির্মাণ করতে হয়েছে আফ্রিকা-দক্ষিণ জুড়ে, রোডেশিয়া-সীমান্তে, নামিবিয়া-সীমান্তে, জাম্বিয়ায়, তানজানিয়ায়; বর্তমানে আঙ্গোলায়, মোসাম্বিকে। ১৯৬৬ সালে রোডেশিয়ার মুক্তি-আন্দোলনের অন্যতম সংগঠন জিম্বাবোয়ে আফ্রিকান পিপ্‌ল্‌স ইউনিয়নের (ZAPU 'জাপু') সঙ্গে এ-এন-সি'র চুক্তি হয়েছিল। সেই চুক্তি অনুসারে জাম্বিয়া-রোডেশিয়া সীমান্তে ওয়াঙ্কি এলাকায় এ-এন-সি'র সশস্ত্র বাহিনীর 'লুটুলি ডিট্যাচমেণ্ট' ১৯৬৭ সালের ১৩ই অগস্ট রোডেশিয়ার শ্বেত বাহিনীর ওপর আক্রমণ চালিয়ে মুক্তিযুদ্ধের আরেক পর্বের সূচনা করেছিল।

সশস্ত্র সংগ্রামের এই পর্বেও গতি দ্রুত হতে পারেনি। অন্যান্য অসুবিধে ছাড়াও জিম্বাবোয়ে মুক্তি-আন্দোলনের মধ্যে বিভেদ একটা বড় অসুবিধে। জাপু'র নেতা জশুয়া ঙ্‌কমো'র সঙ্গে অন্য মুক্তি-সংগ্রামীদের বিভেদ ১৯৬৩ সালে চূড়ান্ত আকার ধারণ করে, ন্‌দাবানিঙ্গি সিথোলে'র নেতৃত্বে পৃথক সংগঠন 'জিম্বাবোয়ে আফ্রিকান ন্যাশনাল ইউনিয়ন' (ZANU 'জানু') গঠিত হয়। 'জানু' প্রধানতঃ জাম্বিয়ায় ঘাঁটি করে। 'জানু'র প্রধান ঘাঁটি তানজানিয়ায়। 'জানু' প্রথম থেকেই সশস্ত্র গেরিলা যুদ্ধের ওপর জোর দেয়।

এসব সাংগঠনিক বিভেদ ও মতভেদের মধ্যে আবার রুশ-চীন মতান্তর ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা জড়িয়ে পরিস্থিতি খুবই জটিল হয়ে ওঠে। পি-এ-সি অকস্মাৎ চীনভক্ত হয়ে ওঠে। চীন অবশ্য এ-এন-সি ও পি-এ-সি উভয় সংগঠনকেই সাধ্যমতো সাহায্য দিয়েছে। আফ্রিকান রাষ্ট্রগুলির ঐক্য সংগঠন ও-এ-ইউ দুটি সংগঠনকেই স্বীকৃতি দিয়েছে। কিন্তু তার ফলে সমস্যা সমাধান হয়নি।

১৯৭৫ সালে ২৫শে জুন তারিখে মোসাম্বিকে পর্তুগীজ শাসনের

অবসান হল, সামোরা মাশেল-এর নেতৃত্বে মুক্তিযোদ্ধাদের বিপ্লবী সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করল। আফ্রিকা-দক্ষিণে জনসাধারণের উল্লাস এবং দক্ষিণ আফ্রিকা ও রোডেশিয়ার মুক্তিসংগ্রামে নতুন উদ্দীপ্ত উৎসাহ সৃষ্টি হল। ১১ই নভেম্বর তারিখে আঙ্গোলাতেও পর্তুগীজ সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর করল মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠন এম-পি-এল-এ'র হাতে। আঙ্গোলায় স্বাধীনতার আনন্দোচ্ছ্বাস ছাপিয়ে কিন্তু গৃহযুদ্ধের গর্জন উঠল। এই গৃহযুদ্ধের একপক্ষকে সমর্থন করে পুতুল-সরকার বানাবার উদ্দেশ্যে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার ভাড়াটে সৈন্য ছাড়াও সরাসরি নিজের সেনাবাহিনী পাঠাল। এম-পি-এল-এ সরকারের সাহায্যার্থে কিউবা থেকে সৈন্য এল। দক্ষিণ আফ্রিকার সৈন্যবাহিনী পরাজিত হয়ে আঙ্গোলা থেকে সরে আসতে বাধ্য হয়। এটাও আফ্রিকা-দক্ষিণে প্রচণ্ড উল্লাসের কারণ হতে পারত।

কিন্তু অবিমিশ্র আনন্দ করা যায়নি। চীন সরকার আঙ্গোলার নতুন সরকারকে স্বীকার করেনি, এবং সেই সরকারের প্রতি সোভিয়েট রুশের সমর্থন ও কিউবার সৈন্যপ্রেরণ নিয়ে তীব্র নিন্দাবাদ করেছে। জাম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট কাউণ্ডা আঙ্গোলা-সরকারকে স্বাগত জানাননি, বরঞ্চ আফ্রিকায় সোভিয়েট রুশের 'অনুপ্রবেশ' সম্বন্ধে আপত্তি ও আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। প্রায় একই সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারের সঙ্গে জাম্বিয়ার সরকারের নেপথ্য আলোচনা হয়েছে।

রোডেশিয়াতে আপোস-মীমাংসার জন্য নতুন কৌশলপূর্ণ প্রচেষ্টা চালিয়ে জিম্বাবোয়ে মুক্তিসংগ্রামীদের মধ্যে আবার প্রচণ্ড বিভেদ সৃষ্টি করা হয়েছে—'জাপু'র সঙ্গে 'জানু'র সশস্ত্র সংঘর্ষ পর্যন্ত ঘটেছে। জাম্বিয়া এ-এন-সি'র রেডিও স্টেশন বন্ধ করে দিয়েছে, জাম্বিয়া-সীমান্তে জিম্বাবোয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের ঘাঁটিও বন্ধ করে দিয়েছে।

অপরদিকে মোসাম্বিকের মুক্তি রোডেশিয়ার পতন আসন্ন করেছে, দক্ষিণ আফ্রিকার সীমান্তেও মুক্তিযোদ্ধাদের পৌঁছে দিয়েছে।

আঙ্গোলার মুক্তি প্রতিবেশী নামিবিয়ার মুক্তিযোদ্ধাদের প্রভূত সাহায্য করতে পারে।

॥ চার ॥

১৯৭০-এর দশকে দক্ষিণ আফ্রিকার ভেতরে আবার ব্যাপক বিক্ষোভ দেখা দিল প্রধানতঃ দুটি ক্ষেত্রে—ছাত্রদের মধ্যে এবং শ্রমিকদের মধ্যে। ১৯৫০-৬০'-এর দুই দশকের নেতা ও কর্মীরা কারারুদ্ধ, দেশান্তরিত, নিষিদ্ধ অথবা গতায়ু হবার পর এক নতুন উত্তরপুরুষের আবির্ভাব ঘটেছে, তা বোঝা যায়।

১৯৫৯ সালে কৃষ্ণকায় ছাত্রদের জন্য পাঁচটা পৃথক তথাকথিত বিশ্ববিদ্যালয় বানানো হয়। ১৯৭৩ সালে ইকনমিস্ট পত্রিকা লিখেছিল—"ওই পাঁচটি বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বদা গোলযোগ। গত দুই বছরে এমন একটি সপ্তাহ যায়নি যখন কোন না কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে গোলমাল ছিল না—দাঙ্গাহাঙ্গামা, বয়কট, ছাত্র-বহিষ্কার, এমন কি বিশ্ববিদ্যালয়-বন্ধ, লেগেই ছিল।...১৯৭৩ সালের অগস্ট মাসে ফোর্ট হেয়ার কলেজে পুলিস ব্যাটন আর কুকুর নিয়ে ছাত্রদের তাড়া করে; ছাত্ররা ইট পাথর ছোঁড়ে। ৭০০ ছাত্রকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়, আরো ২০০ জন ছেড়ে চলে যায়, ১৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়।"[৭] ১৯৭৩ সালের ফেব্রুয়ারীর শেষে 'ন্যাশনাল ইউনিয়ন অব্ স্টুডেন্টস অব্ সাউথ আফ্রিকা' (NUSAS—শাদা-কালো ছাত্রদের মিলিত প্রতিষ্ঠান) সংগঠনের ৮ জন শ্বেতাঙ্গ নেতাকে 'নিষিদ্ধ ব্যক্তি' ঘোষণা করা হয়, তার কয়েকদিন পরে কৃষ্ণকায় ছাত্রদের প্রতিষ্ঠান 'সাউথ আফ্রিকান স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন' (SASO)-এর ৮ জন নেতাকেও 'নিষিদ্ধ ব্যক্তি' ঘোষণা করা হয়।[৮]

ছাত্রছাত্রীদের নতুন আলোড়নের সূত্রপাত হয়েছিল ১৯৭২ সালের মে মাসে। 'ইউনিভার্সিটি অব্ দি নর্থ'-এর সমাবর্তনে ছাত্রদের নির্বাচিত মুখপাত্র-প্রতিনিধি আব্রাহাম টাইরো তাঁর প্রতিভাষণে

বর্ণবৈষম্য-ব্যবস্থার তীব্র নিন্দা করেন। পরের দিন তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হয়। এর প্রতিবাদে তার পরের দিন বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ছাত্র অবস্থান-ধর্মঘট করে। পুলিস আসে। সমস্ত ছাত্রছাত্রীকে, ১১৪৬ জনকেই, বহিষ্কার করে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়া হয়।[৯]

তার প্রতিবাদে সবকয়টা বিশ্ববিদ্যালয়ে, স্কুল-কলেজে ছাত্রবিক্ষোভ ফেটে পড়ে। কেপ টাউন বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের প্রতিবাদ-মিছিলের ওপর পুলিস ব্যাটন চালায়, কুকুর লেলিয়ে দেয়।[১০]

ছাত্রদের ওপর আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষামূলক সংস্কৃতিমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির ওপরেও নতুন করে আক্রমণ শুরু হয়। খেলাধুলার সংগঠন, সন্তরণ সমিতি, নাট্য সমিতি ও নাট্যকার কেউ আক্রমণের বাইরে নেই। সংবাদপত্র নিষিদ্ধ হয়েছে অগুণতি। এই আক্রমণ-গুলোই ক্রমবর্ধমান বিক্ষোভ ও শাসকদের ক্রমবর্ধমান আতঙ্কের তাপমানযন্ত্রের নির্দেশকের মতো।

১৯৭১ সালের ডিসেম্বরে নামিবিয়ায় ২০ হাজার শ্রমিকের ধর্মঘট শুরু হয়। এ ধর্মঘট সর্বত্র দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। নামি-বিয়ার উত্তরপ্রান্তে জনবহুল ওভাম্বোল্যাণ্ডের জায়গায় জায়গায় ধর্মঘট সশস্ত্র সংগ্রামের রূপ নিয়েছিল। নামিবিয়ার মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠন 'সোআপো' (SWAPO) এই ধর্মঘটে নেতৃত্ব করে। এরপর দক্ষিণ আফ্রিকার শ্রমিকরা সচল হয়ে ওঠে। ১৯৭২ সালের অক্টোবরে দক্ষিণ আফ্রিকার শিল্পকেন্দ্রগুলোয় শ্রমিক-ধর্মঘটের বিপুল তরঙ্গ জেগে ওঠে। ১৯৭৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কোন কোন দিন ৩০ হাজার শ্রমিকের ধর্মঘট চলছিল। সেসময় ডারবান ও নাটাল প্রদেশ এই তরঙ্গের প্রধান কেন্দ্র; সেখানে একটা সময় ১০০টা প্রতিষ্ঠানে ৬০ হাজার শ্রমিকের ধর্মঘট হয়েছিল।[১১] এসব ধর্মঘট বেআইনী। কিন্তু, ইকনমিস্ট পত্রিকা ঠিক কথাই লিখেছিল—"নাটালে যখন ৬০০০০ জুলু ধর্মঘট করে রাস্তায় নেমেছিল, তখন

তারা জানত যে সরকার তাদের সবাইকে জেলে পুরতে পারবে না।"[১২] শ্রমিকরা ধর্মঘট করেই ধর্মঘটের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছিল। সরকার কার্যতঃ আইন মুলতুবী করতে বাধ্য হয়েছিল।

এই ধর্মঘটের তরঙ্গের সামনে বৃহৎ একচেটিয়া ধনিকরাও মাথা নোয়াতে বাধ্য হয়। ১৯৭৩ সালের ৭ই ডিসেম্বর দক্ষিণ আফ্রিকার বৃহত্তম কোম্পানী 'অ্যাংলো-আমেরিকান মাইনিং কর্পোরেশন' ১ লক্ষ ১০ হাজার আফ্রিকান শ্রমিকের মাসিক মজুরী ২·৬০ রান্‌ড্‌ বাড়ায়, ১৮ মাস আগের তুলনায় শতকরা ৭০ ভাগ বৃদ্ধি।[১৩] ইতিপূর্বে কখনো দক্ষিণ আফ্রিকায় মালিকদের এরকম মাথা নোয়ানো দেখা যায়নি।

।। পাঁচ ।।

'৭০-এর দশকে আরেকদিক থেকে নতুন বিদ্রোহের সম্ভাবনা সৃষ্টি হচ্ছে। সরকারের একটি অতি প্রিয় পরিকল্পনা 'বান্টুস্তান'। এই পরিকল্পনা অনুসারে আফ্রিকানদের জন্য নির্দিষ্ট বাসভূমিগুলিকে আটটি পৃথক প্রদেশে জড়ো করে সরকারের মনোনীত গোষ্ঠী-প্রধানদের দিয়ে তথাকথিত 'স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন' চালানোর কথা। 'প্রদেশ' শব্দটা ব্যবহার করতে হচ্ছে, অন্য উপযোগী শব্দ পাওয়া যায় না—কিন্তু এগুলো যথার্থ প্রদেশ নয়, পরস্পর-বিচ্ছিন্ন টুকরো, এবং এক একটা টুকরোর মধ্যে আবার অনেক পরস্পর-বিচ্ছিন্ন টুকরো। যথা 'কোআজুলু' নামক এক 'বান্টুস্তান' জুলুদের বাসভূমি বলে নির্দিষ্ট; তার মধ্যে ১৭৯টা আলাদা আলাদা টুকরো এলাকা; অনেক অদলবদল করার পরেও সেটায় ১০টা আলাদা টুকরো থাকবে।

এইসব 'বান্টুস্তান'-এর মধ্যে সরকার যেটা নিয়ে সবচেয়ে বেশি প্রচার করে, সেটার নাম 'ট্রান্সকেই', খোশা জাতির জন্য নির্দিষ্ট বাস-ভূমি। এখানে স্বায়ত্তশাসনের পদ্ধতি হল ৪৫ জন নির্বাচিত সদস্য এবং ৬৪ জন মনোনীত সদস্য নিয়ে এক তথাকথিত লেজিসলেটিভ অ্যাসেম্বলী মারফৎ শাসন। গোষ্ঠীপতি কাইজার মাতান্‌জিমা এখানে

মুখ্যমন্ত্রী হয়ে শাসন চালাচ্ছেন। দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের তিনি বিশেষ বিশ্বাসভাজন, মার্কিনদেশে এবং অন্যান্য দেশে তাঁকে নিয়ে গিয়ে দেখানো হয়েছে—কালোমানুষরা যে আসলে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারকে খুবই ভালোবাসে, তার প্রমাণ হিসেবে। আফ্রিকানরা মাতানৃজিমার নাম উল্লেখ করে জাতিশত্রু মীরজাফর বা কুইসলিঙ-এর আরেক সংস্করণ হিসেবে। মাতানৃজিমার কুকীর্তি অনেক।[১৪]

ট্রান্সকেই-কে নাকি সামনের অক্টোবরে 'স্বাধীনতা' দেওয়া হবে। তার আগেই মাতানৃজিমা মানুষের কাছে গ্রাহ্য হবার জন্য দু-একটা দাবীদাওয়া করে ফর্স্টারের কাছে দাবড়ানি খেয়েছেন। মাতানৃজিমা একটা কায়দা করতে গেলেন। অকস্মাৎ বিভিন্ন জায়গায় 'আমার কাকা নেলসন মাণ্ডেলা' সম্বন্ধে উদ্বেগ প্রকাশ করতে থাকলেন (নেলসন সত্যই সম্পর্কে মাতানৃজিমার কাকা)। এরপর শোনা গেল ট্রান্সকেই-এর জনসাধারণের মেজাজ খুশী করার জন্য নেলসনকে নাকি মুক্তি দেওয়া হবে।

দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারের বিচারমন্ত্রী জিমি ক্রুগার ঘোষণা করলেন, ট্রান্সকেই-এর তিনজন লোককে—নেলসন মাণ্ডেলা, ওআলটার সিস্থলু ও গোভান ম্বেকি—মুক্তি দেবার কথা তিনি বিবেচনা করছেন। কয়েকদিন খুব সোরগোল হলো। সাংবাদিকরা গেল নেলসনের স্ত্রী উইনির কাছে। উইনি ১১ বছর নিষিদ্ধ ব্যক্তি থাকার পর ও ১৭ মাস বন্দী থাকার পর অল্পদিন আগে অ-নিষিদ্ধ হয়েছেন। তিনি বললেন, 'নেলসন তো উপজাতীয় নেতা নয়, সে জাতীয় নেতা।' ইকনমিস্ট পত্রিকা লিখল, নেলসন হয়তো এরকম মুক্তি গ্রহণ করতে অস্বীকার করবেন।[১৫] এক সপ্তাহ পরে ক্রুগার বললেন, না, ওদের মুক্তি দেওয়া হবে না। ইকনমিস্ট লিখল, নেলসন এবং অন্য নেতারা ক্রুগারের শর্ত প্রত্যাখ্যান করেছেন বলেই মনে হচ্ছে।[১৬]

'কোআজুলু'তে সরকার আরেকটি কাইজার মাতানৃজিমা পেলেন

না। সেখানকার মুখ্যমন্ত্রী গাৎশা বুথেলেৎজি অন্য সুরে কথাবার্তা বলছেন। ১৯৭৩ সালেই বুথেলেৎজি অভিযোগ করেছিলেন যে দক্ষিণ আফ্রিকা পুলিসের সিকিউরিটি ব্র্যাঞ্চ কোআজুলুতে তাঁর বিরুদ্ধে একটা রাজনৈতিক দল বানিয়েছে।[১৭] সম্প্রতি বুথেলেৎজি ফর্স্টার-রাজের বিরুদ্ধে অনেক কড়া কথাবার্তা বলেছেন।

চতুর্দশ অধ্যায়

ইদানীং

॥ এক ॥

খুঁটির জোর

বাঙলা প্রবাদ অনুসারে মেষের বীরত্ব তার পশ্চাদস্থ খুঁটির জোরে। দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেত-স্বৈরতন্ত্র মেষ নয়, কোন জন্তুর সঙ্গে তার তুলনা করতে হলে ভীষণদর্শন হিংস্র রক্তলোলুপ জন্তুর কথা ভাবতে হয়। কিন্তু সেও নিজের জোরে টিকে নেই। এরকম কোন রাষ্ট্র এত বিক্ষোভের মুখে এতকাল টিকে থাকতে পারে না, যদি না তার পৃষ্ঠপোষক ও রক্ষক থাকে।

দক্ষিণ আফ্রিকার স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্র টিকে আছে তার পৃষ্ঠপোষকদের জোরে। প্রধান পৃষ্ঠপোষক—বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স। কিছুকাল আগে পর্যন্ত বৃটেনই পৃষ্ঠপোষকদের চূড়ামণি ছিল। সম্প্রতি সে স্থান নিচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিন শিবিরের অন্তর্গত জাপান, পশ্চিম জার্মানী, ইস্রায়েল, ইটালী, ইরান সম্প্রতিকালে দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে অর্থনৈতিক সহযোগ বাড়িয়েছে।

দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারকে রাজনৈতিক সাহায্য জুগিয়েছে প্রধানতঃ বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র—এবং তাদের সঙ্গে ফ্রান্স। রাষ্ট্রসংঘের দরবারে যখনই দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দাসূচক প্রস্তাব এসেছে, তখনই এরা তাতে আপত্তি করেছে, বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে ; সুবিধে বুঝলে এরা ভোটদানে বিরত থেকেছে ; কখনো বা আরো চতুরভাবে নিরপেক্ষ থাকার শর্ত হিসেবে প্রস্তাবটাকে অতি-মৃদু ও প্রায় নিরর্থক চেহারা দেবার চেষ্টা করেছে।

১৯৫২ থেকে ১৯৬৫ ; এই ১৪ বছরে বিশ্বরাষ্ট্রসংঘের সাধারণ অধিবেশনে দক্ষিণ আফ্রিকার আপার্টহেইট্-নীতি ও জাতিবৈষম্যমূলক শাসনব্যবস্থার নিন্দা করে অন্ততঃ ২৮টি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে।[১]

এসব প্রস্তাব অবশ্য নিন্দাবাদই, তার বেশি কিছু নয়; বেশি কিছু করার ক্ষমতা নিরাপত্তা পরিষদের; সেখানে বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্স 'ভিটো'-ক্ষমতার অধিকারী, তাদের সম্মতি ছাড়া কোন প্রস্তাবই গ্রাহ্য নয়। আগেকার দীর্ঘ ইতিহাস উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। সম্প্রতি ১৯৭৪ সালের ৩০শে অক্টোবর নিরাপত্তা-পরিষদে প্রস্তাব উঠেছিল, দক্ষিণ আফ্রিকাকে বিশ্বরাষ্ট্রসংঘ থেকে বহিষ্কার করা হোক। বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্স একযোগে তিন 'ভিটো' প্রয়োগ করে এ প্রস্তাবকে ব্যর্থ করেছে। আবার, ১৯৭৫ সালের ৬ই জুন নামিবিয়া থেকে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারকে হঠিয়ে বিশ্বরাষ্ট্রসংঘের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব উঠল; আবার ওই তিনটি 'ভিটো' পড়ল।

১৯৬৫ সালের ডিসেম্বরে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ অধিবেশনে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে সার্বিক অর্থনৈতিক নিবারণ (ইকনমিক স্যাংশন) প্রয়োগের সিদ্ধান্ত হয়। এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে বৃহৎ ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে ব্যবসাবাণিজ্য চালাচ্ছে। ভারত ১৯৪৬ সাল থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে বাণিজ্য বর্জন করে চলছে; কিন্তু অন্য রাষ্ট্রগুলি অনুরূপ ব্যবস্থা না করলে ভারতের এ কাজের বিশেষ কোন মূল্য থাকে না; কারণ ভারত অন্য দেশে যে সামগ্রী রপ্তানী করে তার খানিকটা সেই দেশ থেকে দক্ষিণ আফ্রিকায় যায়।[২]

১৯৬৫ সালের অর্থনৈতিক নিবারণ প্রস্তাব শুধু যে অগ্রাহ্য করা হয়েছে তাই নয়। দক্ষিণ আফ্রিকার সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য বাড়ানো হয়েছে, দক্ষিণ আফ্রিকায় মূলধন নিয়োগের পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে।

এ বিষয়ে কিছু তথ্য এ গ্রন্থের প্রস্তাবনায়, প্রথম অধ্যায়ে, উল্লেখ করা হয়েছে। তথ্য অনেক। আরো কয়েকটি তাৎপর্যপূর্ণ তথ্য দেখা যাক।

দক্ষিণ আফ্রিকায় মার্কিন মূলধন লগ্নী ১৯৬০ সাল থেকে দ্রুতবেগে

বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৬০ সালে শার্পভিল্-এর ঘটনার পর, এবং সাধারণ ভাবে আফ্রিকা মহাদেশে আফ্রিকান স্বাধীনতা-আন্দোলনের অগ্রগতির পর, দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে বৈদেশিক মূলধন সরিয়ে নেবার হিড়িক উঠেছিল। সেই সময়েই মার্কিন মূলধন লগ্নী বাড়ানো হয়, দক্ষিণ আফ্রিকার অর্থনৈতিক সঙ্কট লাঘব হয়। লগ্নীকৃত মার্কিন বেসরকারী মূলধনের মোট পরিমাণের বৃদ্ধির ছক নিম্নরূপ[৩] :—

বৎসর	...	মার্কিন বেসরকারী মূলধনের (প্রত্যক্ষ) মোট পরিমাণ (মিলিয়ন ডলার)
১৯৪৩	...	৫০
১৯৫০	...	১৪০
১৯৬১	...	৩৫৩
১৯৬৬	...	৬০১
১৯৭০	...	৭৫০

১৯৬০-৬১ সালে দুটি মার্কিন ব্যাঙ্ক—চেজ্ মানহাটান এবং ফার্স্ট ন্যাশনাল সিটি—দক্ষিণ আফ্রিকা সরকারকে ১৫ মিলিয়ন ডলার ঋণ দিয়েছিল। তার ওপর আবার মার্কিন-নিয়ন্ত্রিত দুটি আন্তর্জাতিক অর্থসংস্থা ঋণ দিয়েছিল ৬৬ মিলিয়ন ডলার: ইণ্টারন্যাশনাল মানিটারি ফাণ্ড ৩৮ মিলিয়ন ডলার, এবং ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক ২৮ মিলিয়ন ডলার।[৪] ১৯৬০ সাল পর্যন্ত আই-বি-আর-ডি (ইণ্টারন্যাশনাল ব্যাঙ্ক ফর রিকন্‌স্ট্রাক্‌শন অ্যাণ্ড ডেভেলপমেণ্ট) দক্ষিণ আফ্রিকাকে ২২০ মিলিয়ন ডলার ঋণ দিয়েছিল।[৫] দক্ষিণ আফ্রিকায় লগ্নী মূলধন থেকে বৃটিশ ধনিকদের উপার্জন ১৯৬০ সালে ছিল ৮১ মিলিয়ন ডলার, ১৯৬৮ সালে ১৮১ মিলিয়ন ডলার ; মার্কিন উপার্জন ১৯৬০ সালে ছিল ৫০ মিলিয়ন ডলার, ১৯৬৭ সালে ১২৮ মিলিয়ন ডলার।[৬]

দক্ষিণ আফ্রিকা সস্তা মজুরের দেশ। আইন আর পুলিস-মিলিটারী এখানে আছে অধিকাংশ শ্রমিকের মজুরী নামিয়ে রাখার জন্য। এখানে

মুনাফা অঢেল। প্রায় ৩০০টি অতিকায় মালটিন্যাশনাল কর্পোরেশন এখানে মুনাফা-শিকারে ব্যস্ত।

বৃহৎ ধনিক দেশগুলির যেসব কোম্পানী দক্ষিণ আফ্রিকায় শিল্প-বাণিজ্য ও অর্থলগ্নী ব্যবসায় চালাচ্ছে, তাদের কয়েকটি হল :—

(১) বৃটিশ : লেল্যাণ্ড, ডানলপ, মেটাল-বক্স, এভ্‌রেডী, ক্যাড্‌বেরি-শ্বোয়েপ্‌স্‌, আই-সি-আই, স্লেটার ওয়াকার, পোর্টল্যাণ্ড সিমেণ্ট, টেট্‌ অ্যাণ্ড লায়াল, রিও টিণ্টো জিঙ্ক, বার্কলে ব্যাঙ্ক, ···

(২) মার্কিন : জেনারেল মোটর, জেনারেল ইলেকট্রিক, ফোর্ড, আই-বি-এম, আই-টি-টি, ইউনিয়ন কার্বাইড, কলগেট-পামলিভ, জিলেট্‌, ক্রাইস্‌লার, ক্যালটেক্স, এস্‌সো, মোবিল, ফায়ারস্টোন, গুড্‌-ইয়ার, চেজ্‌ মান্‌হাটান ব্যাঙ্ক, সিটি ব্যাঙ্ক, ···

(৩) পশ্চিম জার্মান : আই-জি-ফার্বেন, সীমেন্‌স্‌, ক্রুপ্‌, ডয়েট্‌শ্‌ ব্যাঙ্ক,···

এসব কোম্পানী আফ্রিকান শ্রমিকদের কিরকম মজুরী দেয়, এবং কিরকম ফাঁকি দেয় তা সম্প্রতি কয়েকটি ঘটনায় নগ্নভাবে প্রকাশ হয়েছে। ১৯৭৩ সালের ১২ই মার্চ বৃটেনের গার্ডিয়ান পত্রিকায় সাংবাদিক অ্যাডাম র‍্যাফায়েল কয়েকটি বৃটিশ কোম্পানীর নাম উল্লেখ করে তথ্যসহ অভিযোগ করেন—এসব কোম্পানী তাদের আফ্রিকান শ্রমিক-কর্মচারীদের নির্মমভাবে ঠকিয়ে অত্যন্ত কম মজুরী দিচ্ছে। বৃটেনে এই নিয়ে তুমুল আলোড়ন হয়। বৃটিশ পার্লামেণ্ট একটি তদন্ত কমিটি নিয়োগ করেন। ১৯৭৪ সালের ৬ই মার্চ ওই কমিটির রিপোর্টে ৬৩টি ব্রিটিশ কোম্পানী সম্বন্ধে বলা হয়, এরা আফ্রিকান শ্রমিকদের যে মজুরী দেয় তা 'পভার্টি-ডেটাম-লাইন'-এর নীচে; অর্থাৎ দক্ষিণ আফ্রিকায় যে মজুরী পেলে শুধুমাত্র অস্তিত্ব বজায় রাখা চলে, তার চেয়েও কম। এই রিপোর্ট দাখিল হবার আগেই আফ্রিকান

শ্রমিকদের ধর্মঘটের জোয়ার শুরু হয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া শ্রমিক-ঘাটতি দেখা দিয়েছিল, প্রতিবেশী দেশগুলো থেকে শ্রমিক আমদানী কমে গিয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে কোম্পানীগুলো মজুরী বাড়াতে বাধ্য হয়। মজুরী বৃদ্ধির পরিমাণের কয়েকটি নমুনা—স্লেটার ওয়াকার (১০০%), ইংলিশ ক্যালিকো (১৪৭%), রিও টিন্টো জিঙ্ক (৫৪%), পোর্টল্যাণ্ড সিমেন্ট (৪১%), টেট্ অ্যাণ্ড লায়াল (৪০%), মেটাল বক্স (৪৬%)।[৭] দক্ষিণ আফ্রিকার বৃহত্তম শিল্প-কর্পোরেশন 'অ্যাংলো-আমেরিকান' এসময়ে ৭০% মজুরী বাড়িয়েছিল, সেকথা আমরা আগে উল্লেখ করেছি।

এই হারে মজুরী বৃদ্ধি যারা করল, তারা এত বৎসর ধরে কি করছিল?

পশ্চিম জার্মানীর সরকারের ও ধনিকদের সাহায্যে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার পেলিন্দাবা নামক জায়গায় ইউরেনিয়ম ধাতুর 'উৎকর্ষসাধন কারখানা' (ইউরেনিয়ম এনরিচ্‌মেন্ট প্ল্যান্ট) বসাচ্ছে এবং কোয়েবার্গ-এ আণবিক শক্তির 'পাওয়ার স্টেশন' বসাচ্ছে। এই দুটোতে যে মূলধন ঢালা হবে তার মোট মূল্য প্রায় ২৪০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। তাছাড়া পশ্চিম ইউরোপের টাকার বাজারে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার দেদার ঋণ করছে। এই ঋণ সংগ্রহের ব্যাপারে পশ্চিম জার্মান ডয়েট্‌শ্‌ ব্যাঙ্ক খুব তৎপর। ১৯৭৬ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত সংগৃহীত কয়েকটি ঋণের মোট পরিমাণ ১০৮৮ মিলিয়ন ডলার।[৮]

দক্ষিণ আফ্রিকার অর্থনীতির কাঠামোর প্রধান স্তম্ভ স্বর্ণখনি ও অন্যান্য খনি। খনিশিল্পে মালিকানার বিন্যাস দেখলে দক্ষিণ আফ্রিকার অর্থনীতি এক-পলকে দেখার কাজ হয়।

সোনার খনির মালিকানা অতিমাত্রায় কেন্দ্রীভূত একচেটিয়া মালিকানা। গোটা শিল্পটার মাথায় বসে আছে সাতটি কোম্পানী-

গ্রুপ। তাদের নাম এবং স্বর্ণ উৎপাদনে তাদের শতকরা অংশ ১৯৭৪ সালে নিম্নরূপ ছিল :—

	কোম্পানীর নাম		মোট স্বর্ণ উৎপাদনের শতকরা অংশ
১।	অ্যাংলো-আমেরিকান কর্পোরেশন	...	৪০
২।	গোল্ড ফিল্ডস্ অব্ সাউথ আফ্রিকা	...	২১
৩।	রান্ড্ মাইন্স্	..	১২
৪।	ইউনিয়ন কর্পোরেশন	...	৯
৫।	জেনারেল মাইনিং অ্যাণ্ড ফিনান্স	...	৭
৬।	অ্যাংলো ট্রান্সভাল	...	৬
৭।	জোহানেসবার্গ কনসলিডেটেড	...	৪
			৯৯

এই সাতটি কোম্পানী-গ্রুপ সোনার শতকরা ৯৯ ভাগ উৎপাদন করে শুধু তাই নয়; দক্ষিণ আফ্রিকার সমস্ত ইউরেনিয়ম, শতকরা ৮০ ভাগ কয়লা, এবং প্রায় সমস্ত হীরে প্লাটিনম ও অ্যান্টিমনি উৎপাদন এদের হাতে। অ্যাংলো-আমেরিকান শতকরা ৪০ ভাগ সোনা-উৎপাদন ছাড়াও কয়লা-উৎপাদনের শতকরা ৩৩ ভাগের এবং ইউরেনিয়ম-উৎপাদনের শতকরা ২৫ ভাগের মালিক। তাছাড়া এই কোম্পানী অন্যান্য কলকারখানা, সওদাগরী-বাণিজ্য, ব্যাঙ্ক, জমিজমার ব্যবসা চালায় এবং বিদেশেও মূলধন খাটায়।[৯]

॥ দুই ॥

সামরিক সরবরাহ

রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষণ, অর্থনৈতিক সহযোগ-সমর্থন। তার ওপর বৃহৎ ধনিক রাষ্ট্রগুলি দক্ষিণ আফ্রিকার সরকারকে যুদ্ধাস্ত্র ও সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহ করে বিপুলভাবে। বৃটেন কিছুদিন আগে পর্যন্ত এই অপকর্মের অজুহাত দেখাত এই বলে যে এসব অস্ত্রশস্ত্র বা সরঞ্জাম

দেশের ভেতরে জাতিবৈষম্য-ব্যবস্থার কাজে লাগবে না, বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিরোধের কাজে লাগবে। সারাসেন ট্যাঙ্ক, সেব্র্ জেট্ এরোপ্লেন, হেলিকপ্টার, আর্মার্ড কার, স্টেনগান দক্ষিণ আফ্রিকায় কি কাজে লাগে তা আমরা দেখেছি।

আফ্রিকা মহাদেশে দক্ষিণ আফ্রিকা সামরিক শক্তিতে সবচেয়ে জবরদস্ত। তার সামরিক উপকরণের পরিমাণ এত বেশি যে মিশরকে বাদ দিয়ে বাকী মহাদেশটার সবকটা রাষ্ট্রের সামরিক উপকরণ একত্র করলেও তা দক্ষিণ আফ্রিকার ধারে-কাছে আসবে না। দক্ষিণ আফ্রিকার মোতায়েন সৈন্যের সংখ্যা ১৯৭০ সালে ছিল ৪৪,২৫০ ; ১৯৭৩ সালে বেড়ে হয়েছিল ১,০৯,৩০০। ১৯৭০ থেকে ১৯৭৩ সালের মধ্যে ট্যাঙ্কের সংখ্যা ৩০০ থেকে ৮০০ হয়েছিল ; জেট্ ফাইটার প্লেনের সংখ্যা ১১৬ —১৯৭০-এর তিনগুণ ; তুটো সাবমেরিন এবং তিনটে যুদ্ধজাহাজও এই সময়ের মধ্যে যোগ হয়।[১০]

বৃটিশ সরকার কিছুদিন আগে বলেছেন যে দক্ষিণ আফ্রিকাকে অস্ত্রশস্ত্র বিক্রী করার নতুন চুক্তি তাঁরা করবেন না। বহু বিলম্বে এই সাধুতাও একটা ছলনা, কারণ এতদিনে দক্ষিণ আফ্রিকায় অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধোপকরণের অনেক কারখানা বসানো হয়ে গেছে। রাইফেল, মেশিনগান, ট্যাঙ্ক, হেলিকপ্টার, ফাইটার-এরোপ্লেন ইত্যাদি এখন দক্ষিণ আফ্রিকাতেই তৈরী করা যায়।

প্রোজেক্ট আড্ভোকাট্

দক্ষিণ আফ্রিকা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক ব্যবস্থার সঙ্গে নিবিড়ভাবে যুক্ত। ১৯৭০-এর দশকে ভিয়েৎনামে মার্কিন বাহিনীর পরাজয় আসন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ ভারত-মহাসাগর এলাকায় নতুন ঘাঁটি নির্মাণ ও সামরিক যোগাযোগ-ব্যবস্থা নির্মাণের দিকে বিশেষ নজর দিতে শুরু করে। ভারত-মহাসাগরে দিয়েগো গার্থিয়া দ্বীপে মার্কিন যুদ্ধজাহাজ ও বিমান-ঘাঁটি

নির্মাণ এ আয়োজনের একটা অংশ। আরেকটা অংশ দক্ষিণ আফ্রিকায়।

১৯৭৩ সালের জুন মাসে উত্তর আটলান্টিক সামরিক চুক্তি সংগঠনের প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা কমিটি আটলান্টিক মহাসাগরে তাঁদের অধিনায়কদের এক গোপন নির্দেশ দেন,—'ভারত-মহাসাগর এবং আফ্রিকা-দক্ষিণ উত্তর-আটলান্টিক চুক্তির এলাকার বাইরে হলেও এই অঞ্চলে সামরিক আয়োজনের বিশেষ পরিকল্পনা প্রস্তুত কর।' এই অনুসারে যে গোপন পরিকল্পনা প্রস্তুত হয় তার মধ্যমণি দক্ষিণ আফ্রিকার অন্তরীপ-অঞ্চলে একটি নৌ-বিমান-তথ্যসংগ্রহ ঘাঁটি। ১৯৭৫ সালের জুন মাসে বৃটেনের আপার্টহেইট-বিরোধী আন্দোলনের সংগঠন এই 'প্রোজেক্ট-আড্‌ভোকাট্' সম্বন্ধে তথ্য ফাঁস করে দিয়েছে। তাতে দেখা যায়, দক্ষিণ আফ্রিকার সিলভার-মাইন নামে একটি জায়গায় নৌবহর ও বিমানবহরসহ এমন এক তথ্যসংগ্রহের ঘাঁটি করা হচ্ছে, যেটা সংবাদ আদান-প্রদানের আধুনিকতম যন্ত্রপাতি দিয়ে দক্ষিণ আমেরিকা থেকে বাঙলাদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত পৃথিবীর প্রায় এক-চতুর্থাংশ এলাকার ওপর খবরদারী করতে পারবে। এই 'প্রোজেক্ট আড্‌ভোকাট্' তৈরী হচ্ছে বৃটিশ, মার্কিন, ফরাসী, পশ্চিম জার্মান যৌথ উদ্যোগে, এবং এই ঘাঁটির সঙ্গে ক্ষণমাত্রেই বৃটিশ নৌবহরের সদরদপ্তর ও মার্কিন নৌবহরের সদরদপ্তরের প্রত্যক্ষ সংযোগের ব্যবস্থা থাকবে।[১১] ভারতের দাক্ষিণাত্য দিয়েগো গার্থিয়ার সন্ধানী বিমানের পাল্লার মধ্যে পড়েছে, দক্ষিণ আফ্রিকার 'প্রোজেক্ট'-এর পাল্লার মধ্যে ভারতের আরো অনেকখানি ঢুকে যাবে।

॥ তিন ॥

কূটকৌশল

দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেত স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পতন যে অবশ্যম্ভাবী সেকথা সবাই জানে। ১৯৬৯ সালে কলিন লেগুম লিখেছিলেন—

'আফ্রিকার মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকা সবচেয়ে জবরদস্ত সামরিক শক্তি, তার কাছাকাছি কেউ নেই। তথাপি এটাই একমাত্র স্বাধীন রাষ্ট্র যেটার সম্বন্ধে ধ্রুব নিশ্চয়তা নিয়ে বলা চলে যে এ অবস্থায় এটা আর বেশিদিন টিকবে না।'[১২]

১৯৭৬ সালের ২৪শে এপ্রিল ইকনমিস্ট পত্রিকা লিখেছে—'দক্ষিণ আফ্রিকার হাতে রয়েছে এক সামরিক ও পুলিসী ব্যবস্থা যায় শক্তি ত্রাসজনক ; তার সাহায্যে এ রাষ্ট্র টিকে থাকতে পারে, রক্তাক্ত ভাবে, ১০।১৫ বছর বা ওইরকম।'[১৩] ১০।১৫ বছর !

দক্ষিণ আফ্রিকার শাসকগোষ্ঠীও একথা মনে মনে জানে। তাদের মনের গোপন লক্ষ্য হল 'রক্তাক্তভাবে' টিকে থাকার মেয়াদ কতটা বাড়ানো যায়। সাধারণ শ্বেতাঙ্গ অধিবাসীদের সেকথা বলা হয় না.—শোষণপীড়ন চালাবার ক্ষমতা অনন্তকাল বহাল থাকবে, সেই আশ্বাসই দেওয়া হয়। তবু তারাও কিছুটা আন্দাজ করে, তাদের আতঙ্ক বাড়ে, আক্রোশ বাড়ে, আস্ফালন বাড়ে। আর, শাসকরা মনে মনে জানে, মেয়াদ দ্রুত ফুরিয়ে আসছে।

এই অবস্থায় পশুশক্তির আস্ফালন ও রক্তচক্ষুর সঙ্গে সঙ্গে চতুর কুটনীতির কৌশল সামনে আসে। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রধানমন্ত্রী ফর্স্টার ১৯৭৪ সালের শেষাশেষি আফ্রিকা-দক্ষিণে 'বিরোধ-নিরোধ কৌশল' প্রয়োগ শুরু করেন। একই কৌশল বৃহত্তর আন্তর্জাতিক মঞ্চে ওই সময় চালু হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে একদিকে সোভিয়েট রুশের, এবং আরেক দিকে চীনের ভদ্রালাপ নতুন হাওয়া বইয়ে দিয়েছিল।

ফর্স্টার প্রথমতঃ একাধিক আফ্রিকান রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে বাক্যালাপ শুরু করেন। মার্কিন রাষ্ট্রসচিব কিসিঞ্জার যেমন অকস্মাৎ একদিন বিমানে উড়ে চীনের রাজধানী পিকিঙে গিয়ে নেমেছিলেন, ফর্স্টারও তেমনি গোপনে বিমানপথে একাধিক আফ্রিকান রাজধানীতে গেলেন। লাইবেরিয়া, সেনেগাল, আইভরি কোস্ট, অনেক জায়গায়

ফর্স্টারের পদধূলি পড়ল। ১৯৭৫-এর ফেব্রুয়ারীতে জানা গেল, জাম্বিয়ার উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীদের সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকার উচ্চ-পদস্থ সরকারী কর্মচারীদের বৈঠক হয়েছে,—১৯৭৪-এর অক্টোবর থেকে সে পর্যন্ত ১৫ বার।[১৪] বিরোধ-নিরোধ 'ডিটেন্ট্'-এর সন্ধান।

এই পর্যায়ে আঙ্গোলায় সৈন্য পাঠিয়ে ফর্স্টার দেখলেন তাঁকে কেউ সাহায্য করল না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাঁর সমর্থনে সৈন্য পাঠাল না, কিউবা থেকে সৈন্য আসা সত্বেও। জেয়ার থেকে প্রেসিডেন্ট মোবুটু বা জাম্বিয়া থেকে প্রেসিডেন্ট কাউণ্ডা আঙ্গোলায় সোভিয়েট 'অনুপ্রবেশ' এবং কিউবান সৈন্যের উপস্থিতি নিয়ে কটু ভাষণ করলেও ঘটনার গতি রোধ করা গেল না।

ওদিকে রোডেশিয়ায় গ্যেরিলা যুদ্ধ তীব্র হয়ে উঠছিল। জাম্বিয়া রোডেশিয়ার মুক্তিযোদ্ধাদের সংযত করতে চেষ্টা করলেও মোসাম্বিক থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের অভিযান ফুঁসে উঠছিল। ফর্স্টার ইতিপূর্বে রোডেশিয়া সরকারের রক্ষার্থে সৈন্য ও আধা-মিলিটারী পুলিসবাহিনী পাঠিয়েছিলেন; ১৯৭৫-এর ৯ই ফেব্রুয়ারী জাম্বিয়ার রাজধানী লুসাকায় দক্ষিণ আফ্রিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিল্‌গার্ড মুলার রোডেশিয়ার আফ্রিকান ন্যাশনাল কাউন্সিলের নেতাদের সঙ্গে কথাবার্তা বললেন; তারপর রোডেশিয়া থেকে দক্ষিণ আফ্রিকার সৈন্য ও পুলিস সরিয়ে নেওয়া হল।[১৫] সে জায়গায় অবশ্য অন্য সৈন্য এল—ইউরোপ-আমেরিকা থেকে ভাড়াটে যোদ্ধা সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে সংগ্রহ করা হল; তাদের মধ্যে ভিয়েৎনাম-ফেরত মার্কিন বীর পুরুষরাও আছেন।[১৬]

রোডেশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ইয়ান স্মিথকে ফর্স্টার উপদেশ দিলেন —'তোমার দেশের কালোমানুষগুলোর সঙ্গে একটা মিটমাটের রাস্তা দেখ; অন্ততঃ ওদের ঐক্য যাতে ভেঙে যায় এবং তোমার সঙ্গে আপস-রফা করার মতো একটা দল পাওয়া যায়, সেই চেষ্টা কর।' স্মিথ প্রথমটায় ক্রুদ্ধ হলেন, গাছে তুলে দিয়ে মই কেড়ে নেওয়ার

অভিযোগ করলেন, তারপর তিনিও 'ডিটেন্‌ট্‌'-এর রঙ দেখাতে শুরু করলেন। 'রোডেশিয়া বিসর্জন দিয়ে দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেত স্বার্থ রক্ষা করতে হবে'—স্মিথের পক্ষে আতঙ্ককর এই রকম কথা শোনা যাচ্ছিল। ইকনমিস্ট পত্রিকা লিখল—"পাশ্চাত্য রাষ্ট্রগুলির অর্থ-নৈতিক স্বার্থরক্ষার জন্য প্রতিরক্ষার লাইন বাঁধতে হবে দক্ষিণ আফ্রিকার সীমান্তে—রোডেশিয়ায় নয়।"[১৭]

॥ চার ॥

১৯৭৬ সালের এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহে মার্কিন রাষ্ট্রসচিব ডাঃ কিসিঞ্জার ব্যস্তসমস্ত হয়ে জাম্বিয়া-তানজানিয়া-জেয়ার-কেনিয়ায় ঘোরাঘুরি করছিলেন।

২৬শে এপ্রিল কিসিঞ্জার তানজানিয়ার রাজধানী দর্‌-অস্‌-সালাম শহরে গিয়ে প্রেসিডেন্ট জুলিয়াস নীয়রেরে'র সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। সাক্ষাৎকারের পর প্রেসিডেন্ট নীয়রেরে সাংবাদিকদের বললেন,—'রোডেশিয়ার সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষ্ণকায় মানুষদের জাতীয় স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আফ্রিকানদের জাতীয় মুক্তিসংগ্রামকে কোনোরকমেই অস্ত্র-শস্ত্র দিয়ে সাহায্য করবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে; যুদ্ধ চলবে, যুদ্ধ ছাড়া উপায় নেই।' ২৬শে এপ্রিল জাম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট কেনেথ্‌ কাউণ্ডাও বললেন,—'রোডেশিয়ায় যুদ্ধ ছাড়া আর কোন পথ নেই।'[১৮]

প্রেসিডেন্ট কাউণ্ডা শান্তিবাদী বলে পরিচিত। এদেশে তিনি গান্ধীবাদী বলেও বিখ্যাত, এবং ভারত সরকার সম্প্রতি তাঁকে নেহরু পুরস্কারে ভূষিত করেছেন।

২৭শে এপ্রিল কিসিঞ্জার লুসাকায়। প্রেসিডেন্ট কাউণ্ডার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পর কিসিঞ্জার সাংবাদিকদের বললেন—"আফ্রিকার দক্ষিণভাগে রোডেশিয়া খুব জরুরী সমস্যা হয়ে উঠেছে বটে, তবে এটাকে কোনক্রমেই একটা সঙ্কটজনক পরিস্থিতি বলা

চলে না। রোডেশিয়ার স্মিথ সরকারকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বোঝাবার চেষ্টা করবে।”

২৮শে এপ্রিল রোডেশিয়ায় এক অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটল। স্মিথ সরকার হঠাৎ অস্পৃশ্যতাবর্জন করে সাতজন অনুগত কৃষ্ণকায়কে মন্ত্রিসভার সদস্য করে নিল। লণ্ডনে বৃটিশ সরকারের এক মুখপাত্র মন্তব্য করলেন—‘এই কৃষ্ণকায় মন্ত্রীরা কেউই কৃষ্ণকায় জনসাধারণের প্রতিনিধি নয়।’ আফ্রিকানদের মন্তব্য সহজেই অনুমেয়। বোধহয় অট্টহাস্যের তোড়ে কিলিমাঞ্জারো পাহাড়ের মাথা থেকে বরফের চাঙড় ভেঙে পড়েছিল, আর কালাহারি-নামিব-সাহারা মরুভূমিতে বালির ঝড় উঠেছিল।

মন্ত্রিসভায় অস্পৃশ্যতাবর্জনের সঙ্গে সঙ্গে স্মিথ সরকার ঘোষণা করলেন—‘সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের’ দণ্ডবিধানের জন্য নতুন বিশেষ আদালত তৈরী করা হলো, এবং সংবাদের ওপর সেন্‌সরশিপ বন্দোবস্ত আরো কড়া করা হলো। স্মিথ বললেন, “সরকারের সমালোচনা বন্ধ করার জন্য সেন্‌সরশিপ চাপানো হচ্ছে না, রোডেশিয়ার পক্ষে ক্ষতি-কারক তথ্য প্রকাশ রোধ করার জন্যই এই ব্যবস্থা।” দুনিয়ার সর্বত্র স্মিথেরা এই এক কথাই বলে।

২৯শে এপ্রিল কিসিঞ্জার জেয়ার-এর রাজধানী কিন্‌শাশায় গেলেন। এখানে মার্কিন-আশীর্বাদপুষ্ট জেনারেল মোবুটু রাজত্ব করেছেন। কিসিঞ্জার ঘোষণা করলেন,—রোডেশিয়া সরকারের সঙ্গে আফ্রিকান জাতীয়তাবাদীদের আপস-রফা করানোর জন্য তিনি স্বয়ং মধ্যস্থতা করতে প্রস্তুত। পিঠে ভাগ করার মধ্যস্থ কথামালার কাল থেকেই প্রস্তুত আছে, কিসিঞ্জার নতুন কি বললেন ?

ওইদিনই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেণ্ট ফোর্ড খুব উচ্চকণ্ঠে বললেন—আফ্রিকা-দক্ষিণে কৃষ্ণকায় মানুষদের মুক্তিসংগ্রামকে কোন মতেই অস্ত্রশস্ত্র দেওয়া হবে না। শ্বেতকায় সরকারকে কি দেওয়া হবে, এবং এ পর্যন্ত কি দেওয়া হয়েছে, তা অবশ্য তিনি বলেননি।

১৫ই মে তারিখে রাষ্ট্রসংঘের সদরদপ্তরে তানজানিয়ার প্রতিনিধি ও 'ঔপনিবেশিক শাসন অবসান' বিষয়ে রাষ্ট্রসংঘের কমিটির ('ডি-কলোনাইজেশন কমিটি') চেয়ারম্যান সলিম এ সলিম এক সাংবাদিক সম্মেলনে বললেন—'রোডেশিয়ার স্মিথ সরকারের বিরুদ্ধে যে সব ব্যবস্থা অবলম্বন করার সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রসংঘ ইতিপূর্বে গ্রহণ করেছে, সেগুলি আরো পরিবর্ধিত করা দরকার। স্মিথ সরকার বাইরে থেকে নানাভাবে সাহায্য পাচ্ছে। দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার তাদের সাহায্য করছে। তাছাড়াও বিভিন্ন কোম্পানী নানা অজুহাত দেখিয়ে রাষ্ট্র-সংঘের নিষেধ অমান্য করে স্মিথ সরকারকে সাহায্য পাঠাচ্ছে। যদি বাইরে থেকে স্মিথ সরকারকে সাহায্য পাঠানো বন্ধ হয়, তাহলে রোডেশিয়ায় যুদ্ধ অল্পদিনের মধ্যেই থেমে যাবে।'

বাইরে থেকে স্মিথ সরকারকে সাহায্য পাঠানো বন্ধ হয়নি। সামরিক অর্থনীতিক বাণিজ্যিক সাহায্য ছাড়াও নতুন সাহায্য এসেছে। জাম্বিয়ার ভেতরে ঢুকে রোডেশিয়ার হত্যাবাহিনী জিম্বাবোয়ে মুক্তিযোদ্ধাদের শিবির আক্রমণ করে হত্যাকাণ্ড চালিয়েছে। জিম্বাবোয়ে জাতীয় মুক্তি-আন্দোলনের মধ্যে বিভেদের সঙ্কট সংঘর্ষে পরিণত হয়েছে। জশুয়া ঙ্‌কোমো ইয়ান স্মিথের সঙ্গে সহযোগিতার পথ খুঁজছেন; অপরদিকে আবেল মুজোরেওয়া এবং ন্দাবানিঙ্গি সিথোলে সংগ্রামকে তীব্রতর করছেন; ঙ্‌কোমোকে আফ্রিকান ন্যাশনাল কাউন্সিল থেকে বহিষ্কৃত করা হয়েছে। জিম্বাবোয়ের মুক্তিযোদ্ধারা কিন্তু যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছেন। রোডেশিয়ার সীমান্ত এলাকাতেই শুধু নয়, অভ্যন্তরেও মুক্তিযোদ্ধারা তৎপর। ৭ই অগস্ট তারিখে ইকনমিস্ট পত্রিকার সংবাদে দেখা যায় রোডেশিয়ায় চারটি বৃহৎ ও পৃথক অঞ্চলে যুদ্ধ চলছে—রোডেশিয়ার সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকার সীমান্ত অঞ্চলও তার মধ্যে একটি। ১২ই অগস্টের সংবাদ, মোসাম্বিক-সীমান্তে উম্‌টালি শহরের শ্বেতাঙ্গ উপকণ্ঠে যুদ্ধ চলছে। ১৪ই অগস্টের সংবাদ, রোডেশিয়ার সেনাবাহিনী মোসাম্বিকের

অভ্যন্তরে আক্রমণ চালিয়ে ৬১৮ জনকে হত্যা করেছে। ওইদিনই বৎসোআনার প্রেসিডেন্ট সেরেৎসে খামা জানান যে গত সপ্তাহে রোডেশিয়ার সেনাবাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের সন্ধান করার অজুহাতে তিনবার সীমান্ত অতিক্রম করে বৎসোআনায় ঢুকেছিল।[১৯]

নামিবিয়ায় সোআপো'র মুক্তিযোদ্ধারা লড়ছেন। মুক্তিসংগ্রামী অ্যারন মুশিকিম্বা এবং হেন্‌ড্রিক শিকঙ্গো'র প্রাণদণ্ড হয়েছে জুন মাসের গোড়ায়। ৪ঠা জুন নয়াদিল্লীতে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে ভারত সরকার বলেছেন, এই দণ্ডাজ্ঞার সংবাদে তাঁরা মর্মাহত।

মুক্তিযোদ্ধাদের ছোট ছোট বাহিনী সীমান্ত পার হয়ে রোডেশিয়ায়, নামিবিয়ায়, দক্ষিণ আফ্রিকায় ঢুকছে, জঙ্গলে প্রান্তরে আর বস্তি-শহরগুলোর জনারণ্যে মিলিয়ে যাচ্ছে।

॥ পাঁচ ॥

১৬ই জুন তারিখে জোহানেসবার্গের কাছে 'সাওয়েটো' বস্তি শহরে ছাত্রদের বিক্ষোভ ফেটে পড়ল। সরকার হুকুম জারী করেছিল যে আফ্রিকান স্কুলগুলোয় শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে ইংরেজী ভাষা ব্যবহার করলেই চলবে না, শাসকগোষ্ঠীর ভাষা 'আফ্রিকান্‌স্‌'-ও ব্যবহার করতে হবে ; অর্ধেক সময় ইংরেজীতে লেখাপড়া চলতে পারে, কিন্তু অন্ততঃ অর্ধেক সময় 'আফ্রিকান্‌স্‌' ভাষা চালাতে হবে। অনেক বছরের জমে-ওঠা নিরুদ্ধ প্রতিবাদ এই উপলক্ষে ফেটে পড়ল। একদল হাইস্কুল-ছাত্র সাওয়েটোর পথে বেরুল মিছিল ক'রে। দলে দলে মানুষ এসে তাদের মিছিলে যোগ দিতে থাকল। পুলিস এল, গুলী চালাল। তিন-চারদিন ধরে ব্যাপক হাঙ্গামা, আর ক্রমাগত গুলী বর্ষণ। ১৭৬ জন নিহত, আহতের সংখ্যা অগুণতি,এবং গ্রেপ্তারের সংখ্যা জানা গেল না। আট বছরের শিশুও গ্রেপ্তারের মধ্যে। ১৯৬০-এর শার্পভিল্‌কে ছাপিয়ে গেল ১৯৭৬-এর সাওয়েটো।[২০]

১৭৬ জনকে হত্যা করে সরকার ভাবল এই পর্ব বুঝি এখানেই

শেষ, আবার বেশ কয়েক বছর আফ্রিকানরা চুপচাপ পড়ে থাকবে সরকারের হিসেব ভুল।

৪ঠা অগস্ট সাওয়েটো আবার গর্জন করে উঠল। মারপিট করে, কুকুর লেলিয়ে দিয়ে, গ্রেপ্তার করে, গুলী চালিয়েও মানুষগুলোকে দমানো গেল না। পুলিসের বেড়া ভেঙে বিশ হাজার মানুষের মিছিল রওনা হল জোহানেসবার্গের দিকে। ট্যাঙ্ক, আর্মার্ড কার, এরোপ্লেন, হেলিকপ্টার এবং মেশিনগান দিয়ে সে মিছিলকে ঠেকানো হলো। তারপর সাতদিন ধরে সাওয়েটো, আলেকজানড্রা, অর্লাণ্ডোয় সরকারী অফিসবাড়ি, স্কুলবাড়ি, শুঁড়িখানা জ্বলতে থাকল।

সাওয়েটোর আগুন নিভবার আগেই আগুন জ্বলে উঠল কেপ টাউনের কাছে। লাঙ্গা বস্তি-শহরে আফ্রিকান ছাত্ররা সাওয়েটোর ছাত্রদের সমর্থনে মিছিল নিয়ে বেরুল। পুলিস এল, গুলী চালাল। সাওয়েটোর ঘটনার পুনরাবৃত্তি হল। সরকারী ভাষ্যে বলা হল, এখানে নিহতের সংখ্যা অন্ততঃ ২৩ জন ; বেসরকারী অনুমান ৫০ জন নিহত।[২১]

এরপর ডারবান। ডারবান ওয়েস্টভিল বিশ্ববিদ্যালয় ভারতীয় ছাত্রদের জন্য নির্দিষ্ট। এখানে ভারতীয় ছাত্ররা সাওয়েটোর ছাত্রদের সমর্থনে এক সপ্তাহ ধরে ধর্মঘট করছিল। ১২ই অগস্ট পুলিস বিশ্ববিদ্যালয়ে হানা দিল। নেতৃস্থানীয় তিনজন ছাত্রকে নতুন রাষ্ট্র-নিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তার করে বিনাবিচারে আটক করা হলো। ইসমাইল মীরের আঠারো বছর বয়সের ছেলে রশিদ এই তিন জনের মধ্যে একজন। রশিদের মা ফতিমা মীরকে একমাস আগেই 'নিষিদ্ধ ব্যক্তি' বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। রশিদ ও তার সঙ্গীদের গ্রেপ্তারের পর সেইদিনই বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৫০০ ছাত্রের প্রতিবাদ-সভা হলো।[২২]

১৩ই অগস্ট আবার কেপ টাউন। এবার নায়াঙ্গা বস্তিতে আগুন জ্বলল। ১৪ই অগস্ট বিভিন্ন জায়গায় পুলিস হানা দিয়ে একদিনে অন্ততঃ ৫০ জন নেতাকে গ্রেপ্তার করল। ছোট্ট সংবাদে

উল্লেখ করা হয়েছে যে এঁদের মধ্যে একজন উইনা মাণ্ডেলা।[২৩] ১৯শে অগস্ট পুলিস আবার ডারবানে হানা দিল—ছয়জন গ্রেপ্তার; তাদের মধ্যে একজন ববি মারি, ফতিমা মীরের জামাতা।[২৪]

১৯শে অগস্ট বিক্ষোভের নতুন কেন্দ্র দেখা দিল—পোর্ট এলিজাবেথ শহর। দুইদিন সংঘর্ষের পর পুলিস জানাল, পুলিসের গুলীতে ১৪ জন নিহত এবং ২৮ জন আহত![২৫]

গ্রেপ্তারের সংখ্যা সম্বন্ধে সরকার কোন তথ্য প্রকাশ করল না। ২২শে অগস্ট জোহানেসবার্গের ইংরেজী সংবাদপত্র 'ডেইলি মেল' আনুমানিক তথ্য প্রকাশ করল—জুন থেকে সে পর্যন্ত গ্রেপ্তারের সংখ্যা ২০০০, এবং ১৭১ জন বিনাবিচারে আটক। বিনাবিচারে আটক বন্দাদের মধ্যে ৭৬ জন সুপরিচিত নেতা। ডেইলি মেল-এর তালিকায় ফতিমা মীর-এর নামও দেখা গেল। ২২শে অগস্ট পর্যন্ত পোর্ট এলিজাবেথ এলাকায় পুলিসের গুলীতে নিহতের সংখ্যা ৩৩।[২৬]

২২শে অগস্ট আবার সাওয়েটো। নামঠিকানাবিহীন হাজার হাজার ছোট ছোট ইশতেহার বিলি করল স্কুলের ছেলেমেয়েরা—সরকারের চণ্ডনীতির প্রতিবাদে তিনদিন ব্যাপী ধর্মঘটের ডাক। ২৩শে অগস্ট ধর্মঘটের প্রথম দিনেই পুলিস গুলী চালাল—একজন নিহত। ২৪শে অগস্ট, কেপ টাউন এলাকায় আবার ব্যাপক হাঙ্গামা। ২৫শে অগস্ট সাওয়েটোতে আবার পুলিস গুলী চালাল, এবং ধর্মঘটের বিরুদ্ধে গুণ্ডাবাহিনী নিয়োগ করল। ২৬শে অগস্ট দাঙ্গা বাধানো হলো। পুলিসের গুলীতে এবং দাঙ্গাহাঙ্গামায় তিনদিনে নিহতের সংখ্যা দাঁড়াল ২১।[২৭] জুন মাস থেকে এ পর্যন্ত নিহতের সংখ্যা ২৫০ ছাড়িয়ে গেল।

রবেন দ্বীপের বন্দিশালায় সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত রাজনৈতিক বন্দীদের জন্য নির্ধারিত প্রতিদিনের বাঁধা খাটুনি হলো, কাপড়ের টুকরো সেলাই করে কয়েদীদের পোশাক বানানো। নেলসন মাণ্ডেলা, ওআলটার সিসুলু, গোভান ম্‌বেকি, আহম্মদ কাথরাডা, রেমণ্ড মাহ্লাবা, এলিয়াস মৎসোআলেদি, অ্যানড্‌রু ম্‌লাঙ্গেনি এবং তাঁদের সঙ্গীরা একটার পর একটা সূচের ফোঁড় দিয়ে চলেছেন—ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর।

ভ্রম সংশোধন

১১৯ পৃঃ ৪র্থ লাইন—"১৮৭২ সালে ইন্দোনেশিয়ার সুরিনাম দ্বীপে" ছাপা আছে; হবে—"১৮৭২ সালে ইন্দোনেশিয়ার বিভিন্ন দ্বীপে এবং দক্ষিণ আমেরিকার সুরিনামে (—ডাচ্ গায়না)"